ফেলে আসা দিনগুলি

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

ফেলে আসা দিনগুলি

কে. পি. কেশব মেনন

অনুবাদ

নীলিমা আব্রাহাম

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল © কে. পি. কেশব মেনন

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1990

মূল্য : 28·00 টাকা

Original Title : Kazhinja Kalam *(Malaylam)*

Bengali Translation : Phele Asa Dinguli

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, A-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, পি. 248 সি. আই. টি. স্কীম নং 6 এম. কলিকাতা 700054 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

সাহিত্যে আত্মজীবনী একটি বিশেষ লিখনভঙ্গী। কিন্তু এর সম্বন্ধে খুব বেশী সাহিত্যিক পঠন বা বিশ্লেষণ হয় নি। আত্মজীবনী কিন্তু এই রকম সমালোচকীয় অবহেলার পাত্র নয়। আন্দ্রে মরোয়া বলেছেন—'আত্মজীবনী সাহিত্য রচনার একটি অতি চিত্তাকর্ষক রূপ।' মরোয়ার এই মত হয়তো প্রচলিত সমালোচকেরা স্বীকার করবেন না। প্রচলিত পাণ্ডিত্যাভিমানী সমালোচকেরা আত্মজীবনীকে ইতিহাস লেখার মতো মনে করেন যেমন, রেনে ওয়েলেক। কিন্তু আত্মজীবনী যে ভাবে পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে, সেই মন্ত্রমুগ্ধতার সঙ্গে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের অতীত মোহিনী শক্তির সঙ্গে এক করে দেখার মধ্যে কোনো যুক্তিই নেই, যুক্তি নেই জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করেও। আত্মজীবনীর অপরিহার্য আবেগময় কেন্দ্র হচ্ছেন লেখক নিজে, যিনি এই লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্রও বটে। তাই আত্মজীবনী সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে লেখক অনিবার্য ভাবে একটির বেশী দুটি সৃষ্টি করতে পারেন না। যদি কোনো লেখক একটির বেশী আত্মজীবনী লেখেন তাহ'লে সে সৃষ্টির মূল্য আপনা থেকেই লোপ পেয়ে যায়, কেননা তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয় পরস্পর বিরোধী, নয় তো অভিন্ন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মজীবনীর মধ্যে যে সত্য আমরা খুঁজে পাই তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত আন্তরিক সত্য। এই সত্য নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক যা ইতিহাস বা জীবনী সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় না। এইজন্যেই ডাঃ জনসন বলেছেন যে, নিজে ছাড়া আর কেউ ভালো জীবনী লিখতে পারে না। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীবনী সাহিত্য শুধু আত্মজীবনীই হতে পারে। লেখকের নিজস্ব সত্তার মধ্যে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবণতা সাহিত্যের সব শাখার মধ্যেই স্পষ্ট দেখা যায়। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির কয়েকটি গভীর শব্দের অনুরণন আত্মজীবনীতেই পাওয়া যায়। মহৎ শিল্পসৃষ্টি আর কিছুই নয়—এ শুধু শিল্পীর নিজের সত্তার একটি অংশকে লেখার মধ্যে প্রকাশ করা।

কোলরিজ বলেছেন, যে কোনো জীবনের ইতিহাস ভালো, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে। সত্যিভাবে নিজের কথা বলতে গেলে লেখকের যেটা সবচেয়ে বড় দরকার তা হচ্ছে সাদাসিধে মহত্ত্ব নামক গুণের। শুধু জীবনের সত্যই নয়, জীবন ইতিহাসের সত্যও লেখকের মহত্ত্বের প্রকাশ। পৃথিবীর সাহিত্যে কোনগুলিকে মহৎ আত্মজীবনী বলে গণ্য করা যায়? বেশীর ভাগই আত্মজীবনী সর্বকালীন কয়েকটি মহৎ লোকের নামের ওপর ভিত্তি করে আছে, যেমন সেন্ট অগাস্টিন, গ্যেটে, রুশো, টলস্টয় এবং গান্ধিজী।

এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিচক্ষণ হচ্ছেন গ্যেটে। অনেক সমালোচকের মতে গ্যেটের আত্মজীবনী "কবিতা ও সত্য" আর সব আত্মজীবনীর চেয়ে সর্বাপেক্ষা মহৎ ও বিচক্ষণ। তাঁর এই আত্মজীবনীতে ব্যক্তির মহত্ত্ব ও সৃষ্টির মহত্ত্ব মিলেমিশে এক হ'য়ে গেছে। এমনটি সাহিত্যের আর অন্য কোনো শাখায় দেখা যায় না। ·

মালয়ালম সাহিত্যে সবচেয়ে মহৎ এবং সবচেয়ে জ্ঞানপূর্ণ জীবনী সাহিত্য কোনটি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার একটি মাত্রই উত্তর—কে. পি. কেশব মেননের "ফেলে আসা দিনগুলি"। কেন এই বইটি মালয়ালম সাহিত্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী এ প্রশ্নের অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ উত্তর হচ্ছে যে লেখক কেরালার অতি বিচক্ষণ ও মহৎ সন্তানদের একজন। গ্যেটের সৃষ্টির অনুকরণে কেশব মেননের আত্মজীবনীকে 'রাজনীতি ও সত্য' বলে নাম দেওয়া যেতে পারে। গ্যেটে যদি কবিতা বলতে কল্পনার মহৎ জীবনকে বোঝান, রাজনীতি বলতে এ ক্ষেত্রে সামাজিক আর রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে গড়া পার্থিব জীবনকে বোঝায়, যা নাকি সমকালীন ভারতবর্ষে দূষিত হয়ে গেছে। জীবনে রাজনীতি আর সত্যের মত দুটি পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে পাশাপাশি রেখে তার সমন্বয় সাধন করা কবিতা আর সত্যের সমন্বয়ের চেয়েও কঠিন। কেশব মেনন কিন্তু এটাকে অনেকটা সম্ভব করেছেন। কেশব মেননের আত্মচরিতের মহত্ত্ব আমার কাছে এইখানে যে, তাঁর এই আত্মচরিতে তাঁর বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব খুবই বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই আত্মচরিত অন্যান্য মহৎ জীবনী সাহিত্যের পরম্পরাকে ঠিক রেখেছে। কেশব মেনন তাঁর এই আত্মচরিতে আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা আত্মনিন্দা কোনোটাই করেন নি, কিন্তু এর মধ্যে যে স্বীকারোক্তি তা অত্যন্ত নম্রতা, সততা ও সরলতার সঙ্গে করা হয়েছে। আজকাল অনেক লেখায় আত্মহননের প্রচেষ্টা দেখা যায়। তার কারণ, লেখকরা এই মনস্তত্ত্বের ওপর কাজ করেন যে বাস্তব কাজের মধ্যে সত্য প্রতিফলিত হয় না। এ শুধু মনের ভেতরকার কাজ। তাঁরা এটা বোঝেন না যে এর বিপরীতটাও একই ভাবে একটা ভালো মনস্তত্ত্ব হতে পারে। কেশব মেননের জীবনকাহিনীতে যে সত্য তাঁর কাজে এবং অন্তরে প্রতিফলিত হয়েছে তার দর্শন পাই। তাই তাঁর লেখার ষ্টাইলে বর্ণনা এবং চিন্তাশীলতার একটা চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়, তাঁর লেখা ইচ্ছাকৃত কোনো বিকৃতিকরণ থেকে মুক্ত। রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মেননের লেখার ষ্টাইলকে মালয়ালম গদ্যের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে সমর্থন করবেন।

আত্মচরিত প্রণেতাকে যে কতকগুলি বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে দোষযুক্ত

স্মৃতি। এক ধরনের অহঙ্কার যাকে জীবনের লজ্জাকর এবং অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোকে যাচাই করার প্রবণতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিজেকে অশালীন ভাবে খুলে ধরা এবং মিথ্যা রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মনোভাব—রুশো, জর্জ স্যাণ্ড এবং আন্দ্রে জিদের মত বড় বড় লেখকেরা এগুলোকে এড়াতে পারেন নি। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁরা সামান্য মানুষ যাঁদের জীবন জয় পরাজয় দোষত্রুটিতে ভরা। তাই তাঁরা যেন তাঁদের আত্মচরিত লেখেন নি, তাঁরা যেন শব্দ দিয়ে এঁকেছেন। (তাই তাঁদের আত্মচরিত লেখা হয় নি, আঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে)। কিন্তু মেননের আত্মচরিত শুধু লেখা। কোথাও একে রঙীন চিত্র ভেবে ভুল করা যায় না। তিনি যা করেছেন, যতখানি সংগ্রাম করেছেন, সবকিছু প্রত্যয়ের সঙ্গে করেছেন। তিনি তাই তাঁর আত্মজীবনী সার্ত্রের মতো শেষ করেন নি—'আমি আবার আমার সাত বছর বয়সের বিনা টিকিটের ভ্রমণকারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।'

'ফেলে আসা দিনগুলি' বইটির শেষ হয়েছে খুবই সহজ ভাবে—'জীবন যে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমি জানি না, কিন্তু জীবনের মোহ আমার এখনো শেষ হয় নি।' তিনি মালয়ালীদের মধ্যে এক বিরাট ব্যক্তি। সার্ত্রের মতো সাত বছরের নামে শপথ না করে তিনি সতের বা সত্তর বছর সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলতে পারেন যে তিনি যেখানেই গেছেন, সে জায়গা যতই না অজানা হোক, তিনি সেখানকার টিকিট কিনতে কখনো ভোলেন নি। জীবন হয়তো অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা, কিন্তু কেশব মেননের কাছে যে জাহাজে করে তিনি পাড়ি দিচ্ছেন সেই জাহাজ তাঁর কাছে অজানা নয়। এর থেকেই কেশব মেননের জীবনের দর্শন বোঝা যায়। সার্ত্রের ভাষায় বলা যায়, টিকিটসহ ভ্রমণকারীর দর্শন।

কেশব মেননের জীবনের ইতিহাস আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার আগে নয়, স্বাধীনতার পরেও তিনি কেরলের জনজীবনকে উঁচু করে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর এই অম্লান প্রচেষ্টায় তিনি সব রকম শারীরিক দৌর্বল্য জয় করেছেন, তাই তাঁর দেহ ভেঙে গেলেও মনের দিক দিয়ে তিনি এক দীর্ঘায়ু অনন্ত যৌবনের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বিরাট অপরাজেয় জীবনীশক্তি তাঁকে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত প্রাধান্যকে না বাড়িয়ে অথবা না কমিয়ে পক্ষপাতহীন ভাবে ও কৌতুকভরে দেখতে সাহায্য করেছে। তিনি 1957 সালে তাঁর আত্মজীবনী লিখে তাঁর নাম দিয়েছেন 'ফেলে আসা দিনগুলি'। এই নাম থেকে যেন এটা না ধরা হয় যে তাঁর সমস্ত জীবন শেষ হয়ে গেছে। তাঁর জীবনের বর্তমানও রয়েছে, ভবিষ্যৎও রয়েছে। এক

সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণতায় ও একটি শিশুর সরলতায় তিনি তাঁর মহত্বের একটা স্পষ্ট রূপ নানা ভাবে আমাদের দিয়েছেন। যখন তিনি তাঁর লেখাপড়ার জীবনে উজ্জ্বল সাফল্য লাভ না করার কথা বলেন, যখন তিনি তাঁর কাজকর্মের ক্ষেত্রে অসাফল্যের কথা বলেন, যখন তিনি জানান কী কী কারণে তিনি দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, যখন তিনি জাপানীদের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেন অথবা যখন তিনি অতি শক্তিশালী সরকারী প্রভাবের কাছে—নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ান তখন সব কিছুর মধ্যে তাঁর বিরাটত্বের একটা স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই।

আধুনিক মালয়ালীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র আত্মচরিত লেখার যোগ্য। তিনি বড় ঘরে জন্মেছেন বলে নয়, তিনি একজন প্রশস্ত জীবনী লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরী করেছেন। বড় বড় লোকদের জীবন তাঁকে সর্বদা আকৃষ্ট করতো। তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই জীবনচরিত। জীবনীলেখক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা লাজপত রায়, গোখেল, তিলক প্রভৃতির জীবনের অমূল্য সম্পদ সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর "নবভারতের স্রষ্টাকর্তা" নামে বিরাট গ্রন্থে আমাদের জাতীয় নেতাদের জীবনের কাহিনী তুলে ধরেন, এই সব নেতাদের জীবনী লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের কাহিনীও পূর্ণোদ্যমে চলছিল। আগে যেমন বলেছি, আত্মচরিতে একের অধিক সৃষ্টি অসম্ভব, মেনন কিন্তু এই নিয়মের প্রায় ব্যতিরেক। মালয়ালম সাহিত্যে লেখক হিসাবে তাঁর উদয় হয় 'বিলাতের খবর' বলে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনীকার হিসাবে। তিনি 1912 সালে ইউরোপ যান এবং 1916 সালে তাঁর এই যাত্রা বিবরণী প্রকাশ করেন। তাঁর পরবর্তী লেখাগুলিতে এর ছাপ পড়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে আত্মজীবনী লেখার যে ভঙ্গী দেখা যায় তা একইভাবে চলতে থাকে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি পূর্ব স্মৃতি বিষয়ক গ্রন্থ এই পক্ষপাতিত্বের ফল। 1924 সালে লেখা তাঁর 'বন্ধন থেকে' গ্রন্থে ভৈকম-সত্যাগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হয়েছিলো কেরলের হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্যতা পালনের বিরুদ্ধে। মেনন এই গ্রন্থের একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর 'অতীত আর ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে মালয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীদের হাতে তাকে যে অত্যাচার ও সহ্য করতে হয়েছিল সে সম্বন্ধেও লেখা হয়েছে। এই সব বইগুলি যেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ আত্মচরিত লেখার রিহার্সাল।

'ফেলে আসা দিনগুলি' তাই তাঁর নিরন্তর জীবনকাহিনী আর আত্মজীবনী লেখাগুলির পরিসমাপ্তি। এই বইয়ে পক্কতা আর পূর্ণতা লাভ করা তাঁর মত অক্লান্ত কর্মীর পক্ষেই সম্ভব। এই বই সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার লাভ করেছে তাতে

আশ্চর্যের কিছুই নেই। এই বইয়ের সমালোচকেরা আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে লেখকের মহৎ বিষয়বস্তুর তাৎপর্য এবং লেখার ষ্টাইলের দিক থেকে বিচার করে একে খুব উঁচুভাবে তুলে ধরেছেন।

কেশব মেননের আত্মজীবনী কলোসাসের মত মালয়ালম সাহিত্যের অন্যান্য আত্মজীবনীকে ঢেকে ফেলেছে। মালয়ালমে আত্মজীবনী বেশী নেইও। জীবনকাহিনী বেশ কিছু লেখা হ'লেও আত্মজীবনী খুব কমই লেখা হয়েছে। তার কারণ, কেরলে প্রকৃত বিরাট ব্যক্তিত্বের সংখ্যা খুবই কম। মালয়ালম সাহিত্যে যে ক'জন আত্মজীবনী লেখক আছেন তাঁরা সাহিত্য, রাজনীতি আর সমাজ সেবায় তাঁদের অনপনেয় ছাপ রেখে গেছেন। যে সব বড় বড় লোকেরা তাঁদের আত্মজীবনী লেখেন নি তাঁরা হচ্ছেন কুমারণ আসান, ভল্লতোল, উল্লর, পট্টম থানু পিল্লা, কে. কেলপ্পন, আর. শঙ্কর প্রভৃতি। আত্মজীবনী লেখকদের মধ্যে প্রবন্ধ লেখক ই. ভি. কৃষ্ণ পিল্লা এবং পণ্ডিত ও সমালোচক পি. কে. নারায়ণ পিল্লার লেখা তাঁদের হাস্যরস ও ব্যঙ্গোক্তির জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আধুনিককালে প্রফেসর জোসেফ মুণ্ডশেশরী এবং পি. কেশব দেব আত্মজীবনী রক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন। এ ছাড়াও কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি. কেশবন এবং রাজদূত সর্দার কে. এম. পাণিক্করের আত্মজীবনী উঁচু ধরনের লেখা। আরো আত্মজীবনী এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পূর্বস্মৃতি স্মরণ ধরনের বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। কেশব মেননের আত্মজীবনী যে এদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা সাধারণ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, একটা বিরাট জীবনযাপন করার চেয়ে একটা বিরাট জীবনের কথা লেখা বেশী কষ্টকর। কিন্তু যিনি করেই একটা মহৎ জীবনযাপন করেছেন তিনি সুনির্বাচিত বাকপটুতার সঙ্গে একটা মহৎ জীবনের কথা লিখতে পারেন। "ফেলে আসা দিনগুলি" পড়লে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মচরিত লেখার যেটা সবচেয়ে বড় দরকার তা হচ্ছে মহৎ জীবন। জীবন মহৎ হলেই লেখা মহৎ হয়।

—সুকুমার আঝিকোড

এক

বাল্যকালের স্মৃতি

পাঁচটা বাজে বাজে। স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজার জন্য স্লেট আর বই হাতে নিয়ে বাচ্চারা অধৈর্য হ'য়ে অপেক্ষা করছে। মেঝেতে বসে মাটিতে লেখা শেষ করে আজ তারা বেঞ্চিতে বসার অনুমতি লাভ করবে। তাই আজকের দিনটি মনে রাখার মত। মাটি থেকে বেঞ্চিতে বসার সেই দিনটি আমি কি খুশীর সঙ্গেই না অভ্যর্থনা করেছিলাম। মেঝেতে বসার বদলে বেঞ্চিতে বসা, মাটিতে হাত দিয়ে লেখার বদলে স্লেটে পেন্সিল দিয়ে লেখা আর সেই স্লেট আর পেন্সিল যদি নতুন হয় তা'হলে তো কথাই নেই।

শেষ ঘণ্টা বাজার আগেই ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি, হৈ হুল্লোড় করতে করতে বাইরে দৌড়লো। চেঁচামেচি করতে বারণ করলেও হেডমাস্টার গোবিন্দ মেননের কথা কে শোনে! বাড়ী যাবার পথে কেমন ভাবে বেঞ্চিতে উঠে বসলাম তার গল্প বন্ধুদের কাছে করতে করতে তাদের আমার নতুন স্লেট আর পেন্সিল দেখালাম। বাড়ী ফিরে আমার সেই উচ্চারোহণের গল্পটি কতবার যে মায়ের কাছে করলাম তা আর বলার নয়। মীনাক্ষী নেতগর আমার মায়ের নাম। মা আমার কথা খুব খুশী হ'য়েই শুনলেন। আমার সেই আধো আধো ছেলেমানুষী কথা শুনে আমার দাদুর ভুঁড়ি নাচানো হাসিটি এখনো আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

দাদুর সেই গোলগাল মুখ, টাকওয়ালা মাথা, মোটাসোটা লম্বা চেহারা এখনো যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবে দাদুর বিশাল হৃদয় তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এ সবের স্পর্শ পেলাম যখন একটু বড় হলাম। যারা দুঃখেকষ্টে পড়েছে তাদের সাহায্য করার জন্য দাদু যেন সবসময় তৈরী থাকতেন। কি করে যে 'না' বলতে হয় তা তিনি শেখেন নি। তাঁর সামর্থ্যের অতিরিক্ত তিনি দান করতেন। এর জন্য তাঁকে ধারদেনাও করতে হয়েছে। মৃত্যুর সময়ও এ দেনা তিনি শোধ করতে পারেন নি।

আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের তখনকার সমাজ যে কেমন ছিল সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। এই সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার শুধু বোঝাই নয় অনুমান করাও কঠিন। পালঘাট রাজপরিবারের ছোট রাজা ছিলেন আমার দাদু। দাদুর কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে এই রাজকীয় ভাবটা খুব ফুটে উঠতো। 'আমরা এমন

ভাবে চিন্তা করছি', 'আমাদের এইটাই ভালো লাগে' এমনি রাজকীয় ভাষায় তিনি কথা বলতেন। অন্যরা তাঁর সঙ্গে যেন সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলে সে বিষয়েও তিনি খুব লক্ষ্য রাখতেন। ভোরবেলা উঠে স্নান করে, কপালে তিলক কেটে, মন্দির থেকে আনা প্রসাদ নিয়ে, রোজকার দান দিয়ে তারপর তিনি প্রাতঃরাশ করতেন। যেদিন ক্ষৌরকর্ম করতেন, সেদিন পুকুরে গিয়ে স্নান করতেন। রাজ পরিবারের কেউ (তামপুরাণ) স্নান করতে আসছেন একথা জানতে পারলে পুকুরের সামনে আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতো না। হাতে তলোয়ার নিয়ে দাদুর দু'জন দেহরক্ষী আগে আগে এগোতো আর অনেক দূর অবধি শোনা যায় এমনি জোরে 'আ—হা' বলে মাঝে মাঝে চীৎকার করতো। একজন ভৃত্য লম্বা পাওয়ালা একটা তালপাতার ছাতা তামপুরাণের মাথার ওপর তুলে ধরে এগোতো। পুকুরে যাওয়ার আর ফেরার পথে লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে দাদুকে দেখতো।

ক্ষৌরকর্মের আগে নাপিতকে পান দেওয়াটা দাদুর একটা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষুর হাতে নেওয়া নাপিতের সামনে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে বলে তাকে খুশী রাখার জন্যই হয়তো আগের থেকে পানটান খাইয়ে রাখতেন।

বছরে একবার বা দু'বার, তাও খুব দরকার পড়লে, দাদু আলাত্তুর বা পালঘাটে যেতেন। পালঘাট থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তারুর নামে গ্রামে আমাদের বাড়ী। আমি সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম। দাদুর যাবার বহুদিন আগে থেকেই তাঁর যাত্রার উদ্যোগ শুরু হ'তো, অস্ত্রশস্ত্র ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করার জন্য লোক এসে জড়ো হ'তো। দাদুর নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তলোয়ার, ঢাল, বন্দুক, বর্শা, ছোরা, কুড়ুল সব অস্ত্রঘরে ঝুলানো থাকতো, বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে এগুলোকে বার করা হতো। বেহারারা এসে পাল্‌কী ঝেড়ে-মুছে সাফ করতো, জ্যোতিষীরা যাত্রার শুভ মুহূর্ত ঠিক করে দিত। তামপুরাণের এই বহির্গমন দেখার জন্য তাঁর প্রজারা এসে সব জড়ো হ'তো. সত্যিই দেখার মত এই যাত্রা। পরিচারকেরা সব তাদের কাপড়চোপড় পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাল্‌কীর সামনে আর পেছনে সার দিয়ে দাঁড়াতো। রূপো বাঁধানো লাঠি হাতে সিপাইরা পাল্‌কীর দু'পাশে দাঁড়াতো। পানের বাটা আর বদনা হাতে নিয়ে ভৃত্যেরা পাল্‌কীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। সব কিছু তৈরী হবার পর শুভ মুহূর্ত দেখে তামপুরাণ রওনা হ'তেন, পরনে মুণ্ডু (মলয়ালীদের জাতীয় পোশাক), পেটের ওপর অঙ্গবস্ত্র, পায়ে মোজা, গলায় সোনার হার এই ছিল তামপুরাণের বেশ। পাল্‌কী চড়ার আগে হাত দুটি পেছনে জড়ো করে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের একবার পর্যবেক্ষণ করতেন। তারপরযাত্রা শুরু করতেন। থেকে থেকে দেহরক্ষীদের চীৎকার, পাল্‌কীর

বেহারাদের হুম্‌হুম্‌ আওয়াজ, ভৃত্যদের কথাবার্তা অনেক দূর থেকেই জানিয়ে দিত যে তামপুরাণ যাত্রা শুরু করেছেন।

তামপুরাণের অতিথি সৎকারের ব্যাপারটাও রাজকীয় ছিল, যে আসতো তাকেই প্রচুর পানসুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হ'তো। তবে পানসুপারি দেবার মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। কারোর কারোর হাতে তিনি নিজে পানসুপারি দিতেন, কারোর সামনে পানের বাটা এগিয়ে দিতেন। কাউকে ভেতরে অভ্যর্থনা করে মাদুরে বসিয়ে পান দিতেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই তামপুরাণের সামনে পান চিবিয়ে খেতো না।

ব্রাহ্মণদের ভোজে নিমন্ত্রণ করতে, তাঁদের দান-দক্ষিণা দিতে তামপুরাণ খুব ভালবাসতেন। তামপুরাণের নামে ব্রাহ্মণদের একটা ভোজ দেবার প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের জন্য দু'বার ভোজনের ব্যবস্থা করা হ'তো। রাতে আহারের পর পান আর শোবার জন্য মাদুর আর বালিশ দেবার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার দিনে এমনিভাবে রাজাদের তরফ থেকে ব্রাহ্মণদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। শুধু ভোজ নয়, স্নান করবার পুকুরও এই সব ভোজনশালায় ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাঁদের কাছ থেকে পুরাণের কথা শোনা দাদুর নিত্যকর্ম ছিল।

দাদু অনেক গল্প জানতেন আর সেগুলো খুব মজা ক'রে বলতেন, প্রতিদিন রাতের আহারের পর আমি আর আমার দিদি দাদুর কাছে গিয়ে বসতাম। গল্প শেষ হবার আগেই আমি দাদুর গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। এমন দিন যেত না যেদিন আমি আমার দেহের ওপর দাদুর বাৎসল্যপূর্ণ হাত দু'টির ছোঁয়া পেতাম না।

মাষ্টারমশায় বেত মারলে, ক্লাশের ছেলেরা পেন্‌সিল নিয়ে পালিয়ে গেলে, বাবা আমার ওপর রাগ করলে সব অভিযোগ আমি দাদুর কাছে করতাম। কোনো গোলমালে পড়লে তার থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় দাদুর সম্মুখীন হওয়া। এ ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাকে কোন গুরুতর দোষ করতে দেখলে দাদু বলতেন—'দাঁড়া, একটা ভালো দিন দেখে তোকে মারবো'—কিন্তু সেই ভালো দিনটি আর কোনদিনই আসেনি। মৃত্যুর ভয়াবহতা আমি সেই প্রথম দেখলাম। আমার এত আদরের দাদুকে সিল্কের কাপড়ে মুড়ে, চিতায় শুইয়ে যখন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'লো তখন সে দৃশ্য সহ্য করার মত শক্তি আমার ছিল না। আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তখন যে হাত দিয়ে তিনি কতবার আমাকে কোলে টেনে নিয়েছেন, সেই আদরের হাত দু'টি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আমাকে সব সময় অভয় আর আশ্বাস দিয়ে কাছে টেনে নিত যে বুকটি তা পুড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই দৃশ্য আমার ছোট্ট

শিশু হৃদয়ে যে কি অসহ্য দুঃখ দিয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। আমার দাদুকে আর দেখতে পাবো না এ কথা ভেবে আমার দুঃখের সীমা ছিল না। সকলেই যত সান্ত্বনা দিক না কেন, দাদুর বসার জায়গাটা খালি দেখলেই আমার অজান্তে আমি হাউহাউ করে কেঁদে ফেলতাম।

কেউ কেউ যখন আমায় বলতো যে আমার দাদু এখন স্বর্গে, তাঁর পাপপুণ্য ভগবান এখন পরীক্ষা করে দেখছেন তখন 'আমার দাদু' কোনো পাপ করেন নি বলে তাদের সঙ্গে আমি তর্ক করতাম। রত্নমুকুট পরা, সোনার অলঙ্কার আর পীতবস্ত্র ধারণ করা একটা উঁচু সিংহাসনের ওপর বসা এক স্বর্গীয় রূপের সামনে শুদ্ধস্নাত, কপালে ফোঁটা দেওয়া আমার সৌম্য দাদু দাঁড়িয়ে আছেন এমন একটা ছবি প্রায়ই আমার মানসপটে ভেসে উঠতো।

সকালে নদী থেকে স্নান করে ফেরার সময় আমার দিদিমার সাদা চুল, কপালের ভস্ম আর কুমকুমের ফোঁটা সকলের চোখে পড়তো। স্নান করার সময় দিদিমা আমাকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। স্নান করার পর নদীর কাছে একটা বড় বটবৃক্ষের চারিদিকে 'কাশী বিশ্বনাথ' 'শ্রীরাম অনাথরক্ষক' বলে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে তিনি বাড়ী ফিরতেন। দিদিমার ভস্মরাখা কৌটোটা হাতে নিয়ে আমি তাঁর পেছন পেছন হাঁটতাম। পথে যেতে যেতে কোনো পুলায়া (অস্পৃশ্য জাতির লোক) তাঁর সামনে পড়লে দূর থেকে তাদের সরে যেতে বলে তিনি চেঁচাতেন। আবার এই পুলায়াদের গায়ে মাথার তেল, পরার কাপড়, পানসুপারি দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। দিদিমার একটা ওষুধের বাক্স ছিল। তাতে সাধারণ অসুখবিসুখের ওষুধ থাকতো। বৈদ্য ডাকতে তিনি খুব কম সময়ই লোক পাঠাতেন। শুধু বাড়ীর লোকজন নয়, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও তিনি তাঁর উপদেশ আর ওষুধ বিতরণ করতেন। কিন্তু দিদিমা রেগে গেলে ভীষণ চেঁচামেচি, গালাগালি করতেন। সেই সব গালাগালি সহ্য করা অসম্ভব ছিল।

আমার মা আর তাঁর বড় ভাই আপ্পুকুট্টি মেনন ছিলেন আমার দিদিমার দুই সন্তান। আমার মামা আপ্পুকুট্টি মেননের জন্মের পর দিদিমার এগারোটি সন্তান হয়েছিল। সব কটি সন্তানই ছোটবেলায় মারা যায়। আমার দিদিমার চল্লিশ বছর পার হবার পর আর কোন সন্তান হয়নি। দিদিমা এর জন্য কত মানত করেছিলেন। কত মন্দিরে ঘুরেছিলেন। কত প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তাঁর বেয়াল্লিশ বছর বয়সে আমার মায়ের জন্ম হয়। আমার মা তখনকার দিনের অবস্থানুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলেন, মা বেশ ভালো করেই লিখতে পড়তে জানতেন। মা যখন সুর করে রামায়ণ পড়তেন তখন শুনতে এত ভালো লাগতো! মা সুন্দর গান গাইতে আর বীণা বাজাতে পারতেন। চার পাঁচটি সন্তানের জন্মের পরও গান গাওয়া বা বীণা বাজানো ছাড়েন নি।

মাকে যিনি গান শিখিয়েছিলেন সেই পাড়ায়ান্নুর শামু ভাগবতরকে এখনো আমার মনে আছে। শামু ভাগবতর সে সময় মাকে নিয়মিত গান শেখাতে আসতেন না। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে তাঁর শিষ্যাকে ডেকে তাঁকে দিয়ে গান করাতেন। মার সঙ্গে তিনিও গান করতেন। সত্তর বছরেরও বেশী বয়স্ক শামু ভাগবতরের তখন চার পাঁচটা মাত্র দাঁত ছিল। কথা ভালো করে উচ্চারণ হ'তো না। তবুও তিনি যখন অষ্টপদী গাইতেন তখন তাঁর ভক্তি-নিষ্ঠা দেখার মত ছিল। আজকাল অনেকে খুব মার্জিত ভাবে অষ্টপদী গায় তা শুনতে অতটা ভালো লাগে না। পুরোনো ঢঙে গাওয়া অষ্টপদী গান শুনতে আমার ভালো লাগে। মা ভোর বেলায় উঠে প্রদীপ জ্বেলে বীণা নিয়ে যখন অষ্টপদী গাইতেন তখন তা শুনতে বাড়ীর লোকেরা সব তাঁর চারপাশে জড়ো হ'তো।

বাড়ীর কাজকর্ম সব দেখাশুনো করা, দাসীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাদের দিয়ে কাজ করানো, তাদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা ছিল মায়ের স্বভাব—গরম কালে বাগানের শাকসব্জীতে জল ঢালার সময় মা'ও ভৃত্যদের সঙ্গে যেতেন। সকালবেলায় দাসীদের ঘরদোর ধোওয়া-মোছার সময় মা'ও তাদের সঙ্গে থাকতেন। আমাদের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক অনেকদিন ধরে রান্নার কাজ করছিল। তাকে আমাদের পরিবারের এক অঙ্গ হিসেবেই আমরা দেখতাম। মা প্রায়ই রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করতেন। শিবরাত্রি, আবনি আবিত্তম্ (শ্রাবণ মাসে তামিল ব্রাহ্মণদের উৎসব) প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলিতে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা, চাল, শাকসব্জী দেওয়া আমাদের বাড়ীর একটা নিয়ম ছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে কি কি জিনিষপত্রের দরকার তা সব ঠিক করা থাকতো, তাতে একটুও ভুল হ'তো না।

আমার দিদি আর আমার মধ্যে যখন ঝগড়া হতো তখন মা সব সময় দিদির দোষ ধরতেন। 'ও ভালো ছেলে, ও তোর সঙ্গে খুনশুটি, ঝগড়া করে না। খুনশুটি তুইই করিস'—বলে মা আমাকে নিয়ে চলে যেতেন। আমি যে সব সময় নিরপরাধী ছিলাম তা মোটেই নয়, তবে মায়ের বিশ্বাস তাই ছিল।

আমার মামা আপ্পুকুট্টি মেনন পঞ্চাশ বছর বয়সে কাশী যান। সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি। তিনি যেমন চেয়েছিলেন, কাশীতেই তাঁর মৃত্যু হল।

আমাদের পৈতৃক ভিটে থেকে কিছু দূরে আমার বাবা একটা গোলা বাড়ী করেছিলেন। সেখানে আমরা বাস করতাম। আমাদের বাড়ীর নাম 'কীড়কেক পোট্টেভীড়ু'। বাড়ীর লোকেরা কষ্টেসৃষ্টে দিন গুজরান করতেন। এই বাড়ী তৈরী করার সময় বাড়ীর বেড়া দিতে, ছাদ ছাইতে, বাগান তৈরী করতে বাবা তাঁর ভাগনে-

ভাগনীদের বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। ভাগনে-ভাগনীরা সকলেই ছিলেন বেকার, তাই বাড়ীর কর্ত্তার হুকুম পালন করার জন্য তাঁরা তৈরী হয়ে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বাবাও কাজ করতেন। দুপুর অবধি কাজ করে, স্নান সেরে, পরনের কাপড় কেচে রোদে শুকোতে দিয়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে বাড়ীর কর্ত্তা একটা কানা-উঁচু থালার সামনে বসলে তাঁর ছোট বোন তাঁকে খাবার পরিবেশন করতেন। নিঃশব্দে একটার পর একটা ভাতের বড় বড় গোল্লা মুখে চালিয়ে বাবা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতেন। তারপর পান মুখে দিয়ে একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। এই ছিল তাঁর প্রতিদিনকার বাঁধাধরা কাজ।

বাবার ভাগনে-ভাগনীরা বংশের গৌরব আর মর্যাদা অক্ষুন্নই রেখেছিলেন। বছরের পর বছর একভাবে কেটে যাবার দিনগুলির মধ্যে বেলাপুরম * (মন্দিরের উৎসব) প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলি এক বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিত। এই বাড়ীতে সকলের থাকার অসুবিধা ছিল বলে বাবা আমাদের থাকার জন্য আর একটা বাড়ী করেছিলেন। আমার বয়সী বাচ্চাদের সঙ্গে খেলবার জন্য আমি কখনো কখনো পৈতৃক ভিটেতে যেতাম। আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো শিক্ষক-ছাত্র খেলা। বাড়ীর-কর্তা, ভাগনে-ভাগনী খেলাও খেলতাম। বাড়ীর বড় কেউ এদিকে এলে আমরা সব ছুটে লুকিয়ে পড়তাম। গুরুজনদের, কাকাদের খুব ভয় করতাম। শুধু এক কাকাকে মাত্র ভয় করতাম না। তাঁর নাম ছিল মিথ্যে কাকা। এই কাকাকে দেখলেই ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরতো। মিথ্যে কাকা এটা খুব ভালোবাসতেন। কেন যে এই কাকাকে এমনভাবে ডাকা হ'তো তা কারোর জানা ছিল না। শুধু বাচ্চারা নয়, বড়রাও তাঁকে অমনভাবে ডাকতেন। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। রোগা লম্বা দেহ, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। সর্বদা ডানদিকে দৃষ্টি, দাঁতে পানের ছোপ। হাঁটুর নীচে অবধি পাড়আলা ধুতি,—তাঁর এই চেহারাটাই আমার চোখের সামনে ভাসে। হাতে একটা পাখা নিয়ে মিথ্যে কাকাকে আসতে দেখলেই বাচ্চারা তাঁর কাছে ছুটে যেত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা জিজ্ঞেস করতাম—"কাকা, কোথায় গিয়েছিলে? তোমায় কতদিন দেখিনি।" কাকা তক্ষুনি সেখানে বসে গল্প শুরু করতেন। মিথ্যে কাকার একটা গল্প আজো আমি ভুলিনি। একদিন কাকা গল্প করছিলেন—

"আমি তৃষ্ণামালায় গিয়েছিলাম। তৃষ্ণামালা থেকে লাকিডিতে গেলাম। লাকিডিতে রেলগাড়ীতে করে অনেক চিচিঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। এক একটা চিচিঙ্গে ষোল হাত লম্বা আর এইসা মোটা। এত বড় চিচিঙ্গে আমার জীবনে আমি দেখিনি···"

"তা ওগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কাকা?"—একটা ছেলে জিজ্ঞেস করলো।

"ওগুলো কোচীন রাজার জন্মদিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একজন তামিল বামুন আমাকে একথা বলেছিল। এই বামুন রাজার জন্মদিনে যাচ্ছে শুনে আমিও তার সঙ্গী হলাম। তারপর রাজার বাড়ীতে সে যে কি এলাহি কাণ্ড!"

পানে চুন লাগিয়ে মিথ্যে কাকা এবার ভোজের গল্প শুরু করলেন—"খাবার কলাপাতা একটা টেবিলের তিনগুণ লম্বা—এই বিরাট বিরাট পাতা। ভাত ধবধবে সাদা যুঁইফুলের মত। চৌষট্টি রকমের তরকারী। পায়েস কেমন ভাবে পরিবেশন করছিল জানিস?" —বলতে গিয়ে কাকার চোখমুখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করতে লাগলো—

—"পায়েস নাতো, পায়েসের কূয়ো। রূপোর পাত দিয়ে সে কূয়ো ঢেকে রাখা হয়েছে। আর এই পায়েসের কূয়োয় রূপোর ছোট বালতি ডুবিয়ে পায়েস তুলে আনছিল নাম্বুদিরী বামুনেরা। পায়েসের দু'পাশে চিনির বাঁধ আর তার মধ্যে বালতি ডুবিয়ে পায়েস তুলে এক একটা পাতায় ঢালা হচ্ছিল। এ রকমটি এক মহারাজা ছাড়া আর কার করার সাধ্যি আছে বল্! তা আমাকে ওখানে আরো দু'দিন থাকতে বলেছিল। তাই তো আসতে একটু দেরী হলো।"

কাকা পান মুখে গুঁজলেন, আর আমরাও এই গল্প অন্যদের কাছে করার জন্য এক একদিকে দৌড়োলাম। মিথ্যে কাকা নামটা যে সার্থক সেটা বুঝতে পাঠকদের আশা করি দেরী হবে না।

হেড্মাস্টার গোবিন্দ মেনন আমাদের বাড়ীতে রোজ আসতেন, আমার দাদামশায়ের চিঠি লেখা, হিসেবপত্র রাখা, সব মাস্টারমশায় করতেন। কাপড়টা একটু উঁচু করে প'রে, কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে, হাতে একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আর চাবির গোছা নিয়ে মাস্টারমশায় এসেই দাদুর সঙ্গে গল্প করতে বসে যেতেন। মাস্টার মশায়কে দেখবামাত্র আমি আর দিদি বাড়ীর ভেতর দৌড়োতাম, মাঝে মাঝে দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখতাম মাস্টারমশায় চলে গেছেন কিনা। তারপর মাস্টারমশায় যখন তাঁর বাড়ী যেতেন আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতাম। উনি বেশ কিছুটা দূরে গেলে আমরা—"পুল্লাট্টু ভীডুর গোবিন্দ মাস্টার অস্তমিচাল দিনে দিনে," অর্থাৎ "পুল্লাট্টু বাড়ীর গোবিন্দ মাস্টার আপনি দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যান" বলে গান করে আমরা ছুটে ছুটে খেলা করতাম। এ গানটা কারোর লেখা কিনা জানতাম না। এই বিকৃত গানের কথা মাস্টারমশায় জানতেন কিনা তাও আমাদের জানা ছিল না।

প্রতি বছর বিদ্যাভ্যাস আরম্ভের দিনটিতে আমরা মাস্টারমশায়কে গুরুদক্ষিণা দিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতাম। কোথাও যাবার সময় তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করাটা আমাদের একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওনম্ (কেরলের জাতীয় উৎসব), বিষু (কেরলের নতুন বছর), তিরুবাতীরা (ক্ষত্রিয় আর নায়ার মেয়েদের শিবের মত বর পাবার জন্য ব্রত পালন), বেলা (মন্দিরের উৎসব) ইত্যাদি উৎসবের দিনগুলো আমরা খুবই আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতাম। তিরুওণমের বেশ কয়েকদিন আগের থেকেই তার প্রস্তুতি আরম্ভ হ'তো। ফুল সংগ্রহ করা, ত্রিককাকারা শিবকে উঠোনে বসানো, 'ভীল্লু কোট্টালুম' (ধনুতে শব্দ করে গান করা) ওনমের ভোজের পর হাডুডু খেলা ও আরো নানা রকমের খেলা উৎসবের অঙ্গ ছিল।

তিরুওণমের আগের দিনটিতে নতুন জামাকাপড় পরতাম আর তিরুওণমের দিনটিতে ধোয়া কাপড়জামা পরতে হতো। ওনম উৎসব উপলক্ষ্যে বাবার পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা যে 'কুট্টতাল্লা' খেলার আয়োজন করতেন, তা দেখতে বহু লোক জড়ো হতো। দুপুর দুটোয় একটা বিরাট মাঠে এই খেলা শুরু হতো। উত্তর আর দক্ষিণ এই দুইভাগে সার দিয়ে খেলোয়াড়রা দাঁড়াতো। পূর্ব আর পশ্চিম ভাগে থাকতো দর্শকরা। মাঠের মাঝে একটা চেয়ারে একটা কর্তা বসে থাকতেন। এই খেলায় কোনো পক্ষের লোক জুয়াচুরি করলে তাদের মাঠ থেকে বাইরে বের করে দেবার জন্য লাঠি হাতে দুটি লোক তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। দর্শকেরা জড়ো হলেই খেলা শুরু হ'তো। এক এক দিকের চার পাঁচজন লোক ধুতি ওপরে তুলে বেঁধে হাত ঝাকিয়ে ও-ও চীৎকার করে লাফ দিয়ে অন্য দিকে ছুটে যেত। তারা ফিরে এলে পর অপর ভাগের লোকেরাও ঠিক অমনি করে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষে লোকেদের দিকে ছুটে যেত। এমনি ভাবে কয়েকবার ছুটোছুটি করার পর দু'জন করে লোক পরস্পরের মধ্যে 'তাল্লা' আরম্ভ করতো। এই সময় কেউ যেন কোনোরকম জুয়াচুরি না করে তা দেখার জন্য রেফারির মত লোক মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতো। কেউ যদি কোনো রকম জুয়াচুরি করে তাহলে তাকে মাঠের বাইরে বের করে দেওয়া হতো। কোটি, কাট্টায়ী (বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক) প্রভৃতিরা "তাল্লা" খেলায় যোগ দিচ্ছে জানতে পারলে লোকের ভীড় ভীষণ বেড়ে যেত। কখনো কখনো দুই দলের মধ্যে গোলমালও শুরু হ'তো। সেই সময় কর্তা তাঁর লাঠিটি নিয়ে ভীড়ের মধ্যে ডানদিকে বাঁদিকে ঘোরাচ্ছেন দেখা যেত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব গোলমাল থামিয়ে দর্শকদের আবার নিজের নিজের জায়গায় বসিয়ে দিতেন। খেলার শেষের দিন সব খেলোয়াড়দের নতুন জামাকাপড় দেওয়া হ'তো। এই সব খেলা দেখতে যে কি ভালই লাগতো!

দুই

পালঘাট আর কালিকটের ছাত্রজীবন

পালঘাট রাজপরিবারের 'নাডুভিলেডত্তীলে'র (বংশের নাম) ভীমনচ্চন্ আমার বাবা। বাবার পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শ'। পরিবারের অবস্থা সে সময় খুব ভালো ছিল। বাবা তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে ছিলেন সেজো। কিন্তু পরিবারের সব দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। কথা দিয়ে কথা রাখা, অসীম কর্মক্ষমতা, হুকুম করার শক্তি এইসব গুণের জন্য শুধু পরিবারের লোকদের নয়, অন্যদেরও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন। বাড়ীতে সকলের জন্য দু'বার ভাত রাঁধা হতো। তরকারী যে যার রেঁধে নিত। ওনম্, বিষু, তিরুবাতীরা প্রভৃতি উৎসবের দিনগুলোতে খরচের জন্য টাকা, জিনিষপত্র প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দেওয়া থাকতো। যারা যুবক তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা ঠিক করা থাকতো। যারা বিবাহিত তাদের এই সংখ্যার বেশী টাকা দেওয়া হ'তো। তখনকার দিনে লোকের খরচ বেশী ছিল না, তাই এই ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধে হ'তো না। আমাদের ভাঁড়ারী এডুত্তাশন রোজ সকালে রাঁধার জিনিষ বের করে দিত। হাঁটুর নীচে অবধি কাপড় পরে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে হাতে তালপাতা আর খাগের কলম হাতে নিয়ে এডুত্তাশন রাঁধুনীকে কি কি জিনিষ রাঁধতে দিতে হবে এবং তার জন্যে কতখানি ভাঁড়ার বার করে দিতে হবে জানতে বাবার কাছে আসতো। বাড়ীতে নতুন কেউ অতিথি এসেছে কিনা জেনে নিয়ে বাবা কতখানি ভাঁড়ার বার করতে হবে তা তাকে বলে দিতেন। ভাঁড়ার বার করে দিয়ে এডুত্তাশন বাইরের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসে বাড়ীর ছেলেদের পড়াতে শুরু করতেন। দুপুরে বড় বড় ছেলেদের রামায়ণ পড়িয়ে শোনাতেন। এই সব কাজের জন্য তার পারিশ্রমিক ছিল নির্ধারিত কয়েক মন ধান। ধোপা, নাপিত, এদেরও মজুরি হিসেবে পরিবার থেকে বছরে দু'তিনবার ধান দেওয়া হতো। সকলেই এতে সন্তুষ্ট থাকতো। শান্তি আর সন্তুষ্টির সুবর্ণকাল ছিল তখন।

তিরূরে তখন একটা মাত্র প্রাইমারী স্কুল ছিল। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ ক'রে আমি আলাত্তুরে মিড্‌ল্ স্কুলে পড়তে গেলাম। দূর থেকে স্কুলটা দেখলেই আমার পেটে ব্যথা শুরু হ'তো। বাড়ীর থেকে অনেক দূরে বলে, না শিক্ষকদের ভয়ে, কে জানে! স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অনন্ত সুব্বা শাস্ত্রী মহাশয়। আমার ক্লাশের

শিক্ষকের নাম ছিল সুব্রহ্মণ্য আয়্যার। ছেলেরা তাঁকে খুব ভয় করতো। আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন ব্রহ্মানন্দ স্বামী। আমি এই স্কুলে ছ'মাস মাত্র পড়েছিলাম। তারপরে পালঘাটে পড়তে যাই। পালঘাটে আমি কল্পাতী বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে এক পুরুতের মঠে থাকতাম। স্কুল এই মঠের কাছেই ছিল। স্কুলের মালিক আর প্রধান শিক্ষক ছিলেন একই ব্যক্তি—গোপাল আয়্যার। বাচ্চাদের পড়ানোয় আর তাদের শাস্তি দেওয়ায় সমানভাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তিনি। হাতে বেত ছাড়া তিনি ক্লাসে ঢুকতেন না আর সেই বেতের সদ্ব্যবহার না ক'রে তিনি ক্লাশ থেকে বেরোতেন না।

আমার বয়স তখন দশ। 1886 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আমার জন্ম। আমার বয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলা করার যথেষ্ট সুযোগ আমার তখন মেলেনি। রোজ ভোর চারটের সময় একজন লোক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার 'হর হর মহাদেব' বলে চীৎকার করতো। সেই আওয়াজ শুনে পুরুত মশায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে কেরোসিনের আলো জ্বেলে দিতেন। সকাল না হওয়া অবধি ওখানে বসে পড়তে বলে ঠাকুরমশাই স্নান সেরে মন্দিরে যেতেন। তিনি যেই চলে যেতেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আবার শুয়ে পড়তাম।

"ঠাকুরমশাই এলে আমি বলে দেব তুই কেমন দুষ্টু ছেলে। তোর পড়াশোনায় একেবারে চাড় নেই, কেবল খাবো, ঘুমোবো আর খেলা করবো। এমনি করলে তোর যে কি গতি হবে তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন" এমনি ভাবে ঠাকুর মশায়ের স্ত্রী আমায় বকতেন। এসব যেন কিছুই শুনতে পাইনি এমনি ভাবে আমি পাশ ফিরে আবার কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে থাকতাম, সকালে নদীতে স্নান ক'রে সাড়ে ছ'টার মধ্যে স্কুলে পৌঁছোতে হ'তো। হাতের লেখা লেখা, অঙ্ক কষা, পড়া তৈরী করা সব স্কুলে ব'সে। অত সকালে আমি আর দুটো তিনটে ছেলে মাত্র স্কুলে এসে উপস্থিত হতাম। এতে আমরা আমাদের প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। আটটার সময় মঠে ফিরে এসে পান্তাভাত আর ঢেঁড়সের তরকারী খেয়ে আবার স্কুলে যেতাম। স্কুলটা ছোট ছিল। মাস্টার মশায়দের পড়ানোর আওয়াজ, ছাত্রদের মারার শব্দ, ছেলেপিলেদের চীৎকার, হৈ হৈ সবসময় এই ছোট্ট জায়গাটাকে মুখরিত করে রাখতো।

পাঁচটার সময় স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার আগে নদী থেকে স্নান ক'রে না এলে ঠাকুর মশাই ঘরে ঢুকতে দিতেন না। স্নান করতে যাবার সময়টুকু মাত্র আমার নিজস্ব ছিল। সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম সেরে বাড়ী এসে দেখতে পেতাম, আমাকে পড়াবার

গৃহশিক্ষক এসে বসে আছেন। ঠাকুরমশায় আর তাঁর স্ত্রী ততক্ষণে আমার সেদিনকার সব দুষ্টুমির এক এক করে বিবরণ তাঁকে দিতেন।

তুই এত কুঁড়ে কেন—অ্যাঁ? ব'লে গৃহশিক্ষক আমার হাঁটুতে খিমচি কাটতে আরম্ভ করতেন আর কাঁদলেই বেদম মার।—"হ্যাঁ আচ্ছা করে দিন মাস্টার মশায়। ভারী পাজী ছেলে। কোনো কিছুতে গা করে না হর হর—" ব'লে ঠাকুর মশায় আর তাঁর স্ত্রী ভেতরে চলে যেতেন। খিমচির যন্ত্রণা সহ্য ক'রে কোনো রকমে চোখের জল আটকে অনেকটা সময় আমাকে মাস্টার মশায়ের সামনে কাটাতে হতো। তিনি চলে গেলে খেয়েদেয়ে ঘুমোতে যেতাম।

স্কুলের বেতন আর গৃহশিক্ষকের বেতন দু'তিনমাস অন্তর বাড়ী থেকে কেউ এসে দিয়ে যেত। স্কুলের বই, স্লেট, পেন্সিল আর অন্য দরকারে আমাকে পয়সা দেবার ভার বাবা তাণ্ডবন নামে একটা ছোট দোকানদারের হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাণ্ডবনের কাছ থেকে পয়সা বার করা অত সহজ ছিল না। চার পাঁচবার চাইবার পর দরকারের অর্ধেক পয়সা পেতাম। একবার তাণ্ডবন আমাকে একটা টাকা দিয়েছিল। সেই টাকায় বই, খাতা-পেন্সিল কেনার পর দু'আনা বাকী ছিল। স্কুলের সামনে একটা বুড়ী কিছু খাবার বিক্রী করতো। রোজ সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি স্কুল যেতাম। কিছু কিনে খাবার মতো পয়সা আমার হাতে থাকতো না। এখন হাতে দু'আনা পেয়ে আমার সেই এতদিনের আগ্রহ মেটাবার ইচ্ছে হ'ল। এক আনার খাবার কিনে লুকিয়ে লুকিয়ে খেলাম। ছোট জাতের স্ত্রীলোকের হাত থেকে খাবার কিনে খেয়েছি, একথা যদি ঠাকুরমশাই বা তাঁর স্ত্রী জানতে পারেন সেই ভয় ছিল। পরের দিন বাকী আনাটাও এমনি ভাবে খরচ করলাম। তৃতীয় দিন খাবার কেনার আর কোনো উপায় না থাকাতে ধারে কিনলাম। এমনি ভাবে আট-দশদিন ধারে খেলাম। দশ আনা হবার পর বুড়ী আর ধার দেবে না বলল। ধার শোধ করার উপায়ও আমার ছিল না। তাই এরপর আমি খাবারওলীকে এড়াবার জন্যে অন্য পথ দিয়ে স্কুলে যেতে লাগলাম। আমায় দেখতে না পেয়ে বুড়ী আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রে একদিন ঠাকুর মশায়ের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। এর পরের কথা আর কি বলব! খাবারওলী, ঠাকুরমশায় আর তাঁর স্ত্রী আমাকে এমন গালাগালি করতে লাগলেন যে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাণ্ডবন এ ঘটনা জানার পর পয়সাটা দিয়ে দিল। বাবাকে এ কথা জানাবে ব'লে সে আমাকে বার কয়েক ধমকেছিল। আমার এমন খারাপ লাগছিল! পাওনাদারের হাত থেকে রক্ষা না পাওয়ার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা আমার এমনিভাবে হয়েছিল।

স্কুল বন্ধ হবার পর বাড়ী এসে মার কাছে যখন এ গল্প করলাম তখন পড়াশুনোর

জন্যে আমাকে কালিকটে পাঠানো হবে বলে বাড়ীর লোক ঠিক করলেন। কালিকটে যাবার আগের দিন সেখানে কেমন ভাবে চলাফেরা করতে হবে তাই নিয়ে বাবা আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। "খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে না, ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবে না। যেখানে থাকবে সেখানকার লোকদের বিরক্ত করবে না—" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু অনেকক্ষণ ধ'রে বাবা আমাকে বললেন। আমার বাবা বাইরে খুব ভালোবাসা দেখাতেন না, কিন্তু ছেলের পড়াশুনোর জন্যে যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পরের দিন সকালে কুলির মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে বাবার গোমস্তা বাসু পট্টরের সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম। তখন ১৮৯৮ সাল সবে শুরু হয়েছে।

বাড়ী থেকে লাকীডি ষ্টেশন সাত মাইল দূরে। মাঠঘাট, ধানখেত, নদী, ছোট ছোট পাহাড় পার হওয়া সেই যাত্রার কষ্ট বাসু পট্টরের গল্প শুনতে শুনতে এতটুকু অনুভব করতে পারিনি। গল্প বলতে বলতে ভদ্রলোক কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়তেন। পথঘাট তাঁর সব চেনা ছিল, তাই হাঁটতে বাসু পট্টরের বেশী কষ্ট হয়নি। ভদ্রলোক লিখতে পড়তে জানতেন না, তবে খুব চালাকচতুর গোমস্তা হিসেবে নাম করেছিলেন।

মনে মনে হিসেব কষার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বাসু পট্টরের। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তাও তিনি খুব ভালো ভাবেই জানতেন। রেলগাড়ীতে আগে চড়লেও লাকীডি থেকে কালিকটের রেলযাত্রা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। গাড়ী থেকে নেমে ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের জিনিষপত্র চড়িয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম। রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য আমার কাছে নতুন লাগছিল। বাসু পট্টরের নগর বর্ণনা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কালিকটে আমার বাসস্থানে এসে পৌছোলাম।

আমি আট বছর কালিকটের 'কেরল বিদ্যাশালা'য় পড়েছি। এই বিদ্যালয় পরে 'জামোরীন কলেজ' নামে পরিচিত হয়। এখন এর নাম 'গুরুভায়ূরাপ্পন কলেজ।' পুরোনো নামটাই ভালো ছিল ব'লে আমার অনেকবার মনে হয়েছে। নীচু জাতির লোকদের তখন কেরল বিদ্যাশালায় প্রবেশ বন্ধ ছিল। কিন্তু খ্রীশ্চান আর মুসলমানেরা এখানে পড়তে পারতো। নীচু জাতের লোকেদের এই কলেজে পড়তে দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত কি উচিত না, এই নিয়ে কলেজে আমরা একবার ডিবেট করেছিলাম। তখন আমি কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলাম। সুব্বারাও মাস্টারমশাই আমাদের এই বিষয়ে ডিবেট করতে বলেছিলেন।

তখনকার শিক্ষকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো সুব্বারাও মাস্টার

মশাইকে। ছেলেরা কি চায় সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করা, তাদের খুশী রাখা, তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর একেবারে অসাধারণ ছিল। ছেলেরা দোষ করলে তাদের মারা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। ছেলেরা যদি কোন ভুল করতো তাহ'লে তাদের সেই ভুলগুলো অত্যন্ত সুন্দর ক'রে তিনি দেখিয়ে দিতেন, যা ছেলেদের মনে দাগ কেটে রাখতো। ছেলেদের নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি 'ষ্টাডিট্যুরে' কাছাকাছি কোথাও বেরিয়ে পড়তেন। আমরা এই 'ষ্টাডিট্যুর' খুবই উপভোগ করতাম। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদে সময়টা এমন চমৎকার কাটতো! প্রতিদিন ক্লাশ আরম্ভ হবার আগে ছেলেদের সব একসঙ্গে প্রার্থনা করার নিয়ম ছিল। এতে যার খুশী সে যোগ দিত। এই প্রার্থনার কথাগুলি সর্বধর্মের লোকেদের পছন্দমত তৈরী করা হয়েছিল। এই সময় সদাচারের বিষয় যে কোন একজন শিক্ষক পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দিতেন। ছেলেদের চরিত্র গঠনের এই ব্যবস্থা অনেক দিন চলেছিল।

আর একজন শিক্ষকের কথা এখনো আমার মনে আছে। তাঁর নাম ছিল সি. পি. গোবিন্দন নায়ার। তিনি 'কেরলসঞ্চারী' ব'লে একটা কাগজেরও মালিক ছিলেন। আমাদের অঙ্ক কষতে দিয়ে মাস্টারমশায় কাগজের সম্পাদকীয় বা অন্য কিছু লিখতে বসে যেতেন। ছেলেরা গোলমাল করলে চোখ থেকে চশমা খুলে একবার দেখে নিয়ে আবার লেখায় মন দিতেন। তখনকার শিক্ষকেরা বেশ পরিষ্কার এবং ভদ্রজনোচিত বেশভূষা ধারণ করতেন। 'আমি সাদাসিধে মানুষ'—ব'লে বেশভূষায় মনোযোগ না দেওয়াটা তখনকার রীতি ছিল না।

দক্ষিণা মূর্ত্তি আয়্যার ছিলেন সপ্তম শ্রেণীর মাস্টার। স্যার যখন স্কুলে আসতেন তখন দূর থেকে তা দেখা যেত। তিনি কলেজের কাছাকাছি বাস করতেন। স্কুলের প্রথম ঘণ্টা বাজার সময় লম্বা কোট পরে আর মাথায় সাদা পাগড়ী বেঁধে, গ্লোবের আকারের একটা রঙীন লাল কাঠের বাক্স হাতে করে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তিনি যখন আসতেন, তা সত্যিই দেখার মত ছিল। পড়ানো ছাড়া তাঁর বই বিক্রীর ব্যবসাও ছিল। টাকাপয়সা এই বাক্সটায় থাকতো বলে বাক্সটা সব সময় তাঁর হাতে হাতে ঘুরতো। তিনি যেদিন ক্ষৌরকর্ম করতেন সেদিন তাঁর রাগ আরো বেড়ে যেত এই রকম একটা ধারণা ছেলেদের মধ্যে ছিল। এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তা সে যাই হোক, আমরা এই দিনটিকে খুব ভয় করতাম। এমন একদিনও যায় নি, যেদিন তিনি তাঁর বেত ব্যবহার করেন নি। মাথার পাগড়ীটা খুলে টেবিলে রেখে তিনি যখন তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে ছেলেদের মারতেন তখন তাঁর টিকির চার-পাঁচটা সাদা চুল কেমন দুলে দুলে নাচছে সেটা দেখতে পেতাম।

স্কুলের কাছে 'দশঘর' বলে একটা বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণের এক খাবারের দোকান ছিল। আমাকে সেখান থেকে রোজ দু'পয়সার খাবার দেবার জন্য আমার অভিভাবক এই দোকানদারকে বলে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় ক্লাশের পর আমি রোজ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম। আমার হাত খরচের যে পয়সা দেওয়া হতো তাতে লাড্ডু, জিলিপী কোনো ভালো খাবারই কেনা যেত না। মুরুককু, বড়া মাত্র কিনে সন্তুষ্ট থাকতে হত। লাড্ডু আর জিলিপী কেনার আমি একটা উপায় বার করলাম। চারদিন কোন কিছু না কিনে চুপচাপ থাকা, পাঁচদিনের দিন কি কি খাবার কিনবো সেগুলো ঠিক ক'রে রাখা, আর চারদিনের পয়সা জমিয়ে পঞ্চম দিনে দু'আনা দিয়ে ঐ খাবারগুলো কেনা। এই ভাবে ভেবে-চিন্তে একদিন আমি খাবারের দোকানে গেলাম।

—ঠাকুর মশায়, আমাকে একটা লাড্ডু, একটা জিলিপী আর একটা দৈ বড়া দিন—বলে সেখানে বসলাম।

—তোমার মাথা খারাপ নাকি খোকা! দু'পয়সায় দু'আনার খাবার পাওয়া যায় নাকি!—এমনি ঠাট্টার সুরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন!

—চারদিন আমি আসি নি। চারদিনে দু'আনা হয়নি? সেই দু'আনার খাবারই তো আমি চেয়েছি।

—তোমাকে আমার রোজ দু'পয়সার খাবার দেবার কথা। সেই দু'পয়সার খাবার আজকেও দেবো।

এই উত্তর শুনে আমার যে কি রাগ হ'ল আর আমি যে কতখানি হতাশ হলাম তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি কিছু না কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। এই ব্যাপারে আমি এমন কষ্ট পেয়েছিলাম যে সে কষ্ট ভুলতে আমার বেশ কিছুদিন লেগেছিল।

ফুটবল খেলতে আমার ভালো লাগতো না, কিন্তু কলেজের ড্রামাটিক ক্লাবে নানা বেশে নাটক অভিনয় করতে আমার ভালো লাগতো। একবার এইরকম অভিনয় করবার সময় একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ডিবেটিং সোসাইটির বার্ষিকী। কলেজের উত্তর ভাগে নতুন করে যে বাড়ীটা করা হয়েছিল তার ওপর তলায় মিটিং হচ্ছিল। প্রায় পাঁচশ'জন লোকের বসার হল। একদিকে উঁচু প্ল্যাটফর্ম, আর একদিকে সিঁড়ি। সন্ধ্যে ছ'টার সময় নাটক আরম্ভ হলো। নিমন্ত্রিতদের নিয়ে পাঁচশ'র বেশী লোক হলে জমা হয়েছে। গ্রীনরুমে সেজেগুজে আমরা সকলে বসে আছি। আমি সেদিন মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করার সাজ করেছি। ষ্টেজে যাবার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছি,

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে পেলাম আর তার সঙ্গে হলের মধ্যে বসা লোকেদের চীৎকার। নতুন বাড়ীর ছাদটা ভেঙে পড়েছে। বাইরে পালাতে না পেরে অনেকে ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। তাদের ব্যাকুল চীৎকার আর কান্না শুনে সেদিন আমার হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ষ্টেজের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে পড়লাম। কি যে করবো বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো এদিক ওদিক খানিকক্ষণ ঘুরলাম। আমার পরনে শাড়ী আর গয়না দেখে অনেকে নিশ্চয়ই আমাকে মেয়ে ভেবেছিল। ঐ সাজেই আমি বাড়ী এসে সাজপোশাক সব খুলে ফেলে আবার কলেজে ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল বলে লোকেদের নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কেউ কেউ আহতও হয়েছিল, তবে মৃত্যু হয়েছিল মাত্র একটি ছাত্রের। নতুন বাড়ীর কাজ শেষ হবার পর আর একবার ভালো করে পরীক্ষা না করে এত লোককে হলে বসার ব্যবস্থা করার জন্যে অনেকে কলেজের কর্তৃপক্ষকে দোষ দিল। এই দুর্ঘটনার পর কলেজের নাট্যসঙ্ঘের কাজকর্ম বেশ কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

এই সময়কার আর একটা মজার ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ঘটনাটি ঘটেছিল সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসনারোহণের সময়। সারা ভারতবর্ষে তখন এই উপলক্ষ্যে উৎসব চলছে। আমি স্কুলের ছুটিতে বাড়ী আসার পর দেখলাম আমাদের গ্রামের লোকেরা বিপুল আড়ম্বরে এই উৎসব পালন করার ব্যবস্থা করেছে। এই উৎসবের একটা প্রোগ্রাম ছিল নতুন সম্রাটের ছবি বেশ করে সাজিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করা। আমি সম্রাটের ছবি ধরে হাতীর পিঠে বসেছিলাম। অনেক রকম বাজনার সঙ্গে হাতীকে দু'মাইল ধরে ঘোরানো হল। ফিরে এসে রাজার ছবি একটা প্যাণ্ডেলে খুব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হল। গ্রামের লোকেরা রাজাকে বন্দনা করবার জন্য জড়ো হয়েছে। এই ছবির সঙ্গে ব্রিটিশ সম্রাটের চেয়ে বেশী মিল ছিল রাশিয়ান সম্রাটের সঙ্গে। এটা আমি পরের দিন বুঝতে পেরেছিলাম। এ'কথা জানতে পেরে উৎসব কমিটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ইচ্ছে করেই তারা এ'রকম রাজদ্রোহীর কাজ করেছেন একথা যদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাহ'লে তার পরিণাম ভেবে তাঁরা খুবই শঙ্কিত হ'য়ে পড়লেন। এই ভুলের জন্য তাঁরা আমাকেই দায়ী করলেন, কারণ সম্রাটের ছবি বাছার ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বাবা আমার ওপর খুব রেগে গেলেন তবে ভয় পাবার মত বিশেষ কিছু ঘটলো না।

কালিকটে পড়াশুনো করার সময় আমি মাঙ্গত কৃষ্ণন্ নায়ারের বাড়ীতে থাকতাম। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। উকীল হিসেবে তিনি তখন খুব নাম করেছিলেন।

কৃষ্ণন্ নায়ারের নির্মল চরিত্র, কঠোর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, সকলের সঙ্গে তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কোর্ট থেকে ফিরে এসে তিনি রাত বারোটা অবধি পরের দিনের কেসগুলো পড়ে রাখতেন, তারপর স্নান ক'রে খেতেন। এক মুহূর্ত্ত সময় তিনি নষ্ট করতেন না। তিনি তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকদিন তিনি মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্বলীর সদস্যও ছিলেন ! তারপর ত্রিবাঙ্কুরের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও পরে দেওয়ানও হয়েছিলেন। কৃষ্ণন্ নায়ার যে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন তা নয়। তাঁর ছিল অসীম ধৈর্য। সকলের সঙ্গে তিনি মধুর ব্যবহার করতেন, আর কঠিন পরিশ্রম করতে পারতেন। এই সবের জন্যেই তিনি জীবনে এত উন্নতি করেছিলেন।

নানা ঘটনা, নানা মানুষ আমাদের অজান্তে আমাদের মনে তাদের ছাপ রেখে যায়। বিশেষ করে বালহৃদয়ে এই ছাপটা বেশী করে পড়ে। কৃষ্ণন্ নায়ার তাঁর মক্কেলদের, নিমন্ত্রিতদের, বন্ধুবান্ধবদের এবং ভৃত্যদের প্রতি যে ব্যবহার করতেন তা আমার কাছে আদর্শ বলে মনে হতো। তাঁর এই ব্যবহার দেখে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার সব কাজকর্ম, আমার সাফল্য আর অকৃতকার্যতা লক্ষ্য করে এসেছিলেন।

'ইন্দুলেখা' উপন্যাসের বিখ্যাত লেখক চাণ্ডু মেননকে আমি কয়েকবার দেখেছি। তিনি তখন কালিকটের সাবজজ্ ছিলেন। লম্বা ধুতি, সাদা সার্ট, পাতলা চাদর আর মাথায় একটা টুপি প'রে সকালবেলা তিনি যখন বেড়াতে যেতেন তা একটা দেখার মত দৃশ্য ছিল। তখনকার দিনে সাবজজ্ একজন খুব বড় অফিসার বলে গণ্য হতেন, আর তার ওপর চাণ্ডু মেনন একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সাবজজ্‌কে আসতে দেখে লোকেরা সব দূরে সরে দাঁড়াতো। তাঁর সেপাই নারায়ণম্ নায়ার একটু দূরে তাঁর পেছন পেছন হাঁটতো। চাণ্ডু মেননের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সম্ভ্রমপূর্ণ চালচলন দেখে তাঁর সম্বন্ধে যে সব গল্প শুনেছিলাম তা যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয় তা আমরা বেশ বুঝতে পারতাম। কোনো নাট্যসঙ্ঘ বা কথাকলি নৃত্যসঙ্ঘ কালিকটে এলে তাঁর বাড়ীতে নাটক বা কথাকলি নাচ দেখানো একটা সাধারণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কালিকটে কাজ করবার সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

পড়াশুনোয় খুব ভাল ছাত্র ছিলাম বলে আমি গর্ব করতে পারি না। সারাটা ছাত্রজীবন আমি খারাপ ছাত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। পড়াশুনোয় অবহেলা করার জন্য যে সব ছাত্রদের নামে বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে রিপোর্ট যেত, তাদের

মধ্যে আমার নামটা প্রায়ই থাকতো। কিন্তু স্কুলের ডিবেটিং সোসাইটিতে আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতাম। অনেকবার আমি ডিবেট আর প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কারও পেয়েছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর এফ. এ. পড়ার জন্য আমি 1906 সালে মাদ্রাজ যাই। সেই বছরেই আমার বিয়ে হয়। পড়াশুনো শেষ করার আগে বিয়ের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু মা-বাবার পীড়াপীড়িতে আমাকে মত দিতে হল। অবশ্য এর জন্যে আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি, বরঞ্চ আমার দিক দিয়ে এই বিয়েটা একটা আশীর্বাদের মতই হয়েছিল।

একটি ব্যক্তির জীবনের সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তার স্ত্রীর অবদান যে কতখানি তা নির্ণয় করা খুবই মুস্কিল। একটি পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপরই আমাদের সুখশান্তি নির্ভর করে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় একটি পারিবারিক জীবনই বোধহয় অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিকতর কাম্য। কিন্তু খুব কম লোকেরই ভাগ্যে এটা ঘটে।

চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়া একটি বালিকাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। আমার স্ত্রী লক্ষ্মী ছিল পালঘাট রাজপরিবারের মেয়ে। লেখাপড়া খুব না শিখলেও লক্ষ্মী ঘরের কাজকর্ম খুব ভালো করেই জানতো। লক্ষ্মী খুব ভালো রাঁধতে পারতো। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমার খুবই খুঁতখুঁতুতি ছিল। আমার স্ত্রী ভালো রাঁধিয়ে ছিল বলে আমার পক্ষে এটা যেন আশীর্বাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

তিন

মাদ্রাজের ছাত্রজীবন

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে যখন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল তখন আমি মাদ্রাজে আমার পড়াশুনো আরম্ভ করলাম। তখনকার ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ভারতবর্ষ সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা ও জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করার প্রবণতায় ভারতবর্ষের সর্বত্র অসন্তোষে ছেয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করার পর দেশের সর্বত্র প্রবল আন্দোলন শুরু হলো। জনগণের আবেদন-নিবেদন, প্রতিবাদ সব কিছু উপেক্ষা করে কার্জন বঙ্গ বিভাগ করেন। তাঁর এই কাজে শুধু বাঙালীদের মধ্যে নয়, ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। এর ওপর ভারতবাসীদের সত্যবাদিতার প্রশ্ন তুলে কার্জন কলকাতায় যে বক্তৃতা দিলেন তাতে আগুনে যেন ঘি পড়লো। "কংগ্রেসকে কবর দেবার সময় এসেছে। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে তার শেষ কাজ আমি করে যেতে চাই"—এই কথাগুলি কার্জন তখনকার ভারত সেক্রেটারীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন। এই সব অপমানজনক কথাবার্তায় জনগণের ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। এর সঙ্গে যখন শুরু হলো সরকারী নিষ্পেষণ তখন জনগণের দেশপ্রেম দশগুণ বেড়ে গেল। তখন বাংলাদেশ ছিল সবরকম আন্দোলনের কেন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাগ্মিতা, বিপিনচন্দ্র পালের ওজস্বিনী বক্তৃতা, অরবিন্দ ঘোষের জ্বালাময়ী লেখা কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর অবধি সারা ভারতবর্ষে এক অদ্ভুত জাগরণের সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয় তাতে দাদাভাই নৌরজী কংগ্রেসের লক্ষ্য 'স্বরাজ' বলে ঘোষণা করেন। স্বদেশী জিনিষের ব্যবহার এবং বিদেশী পণ্য দ্রব্যের বর্জন আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু হওয়ার পর ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন 'স্বরাজ', 'স্বদেশী', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি শব্দগুলি দেশের সর্বত্র প্রবল আলোড়ন তুলেছিল।

সে সময় বিপিনচন্দ্র পাল যখন মাদ্রাজে আসেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যে শোভাযাত্রা বার করা হয় তা প্রায় দেড়মাইল লম্বা ছিল। বিপিনচন্দ্রের আগমনে মাদ্রাজে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এক সপ্তাহ ধরে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য অগণিত জনতা মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে ভীড় করেছিল। মাইকের সাহায্য ছাড়াই হাজার হাজার লোকদের বিপিনচন্দ্র পাল দু' তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর বাগ্মিতায় আকৃষ্ট করে

রাখতেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! জনগণের উত্তেজনা, আবেগকে দরকার মতো জাগিয়ে তুলে তাকে উঁচু তারে বেঁধে দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল।

মাদ্রাজের প্রথম জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন জি. সুব্রহ্মণ্য আয়্যার। দক্ষিণ ভারতের দেশীয় নেতাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতা তাঁর ছিল না, তবে জনগণকে ললিত ও হাস্যপূর্ণ ভাষায় সব কিছু বলে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা তাঁর অসামান্য ছিল। আজকে 'স্বদেশ মিত্র' নামে যে একটি নামী সংবাদপত্র আছে তার স্থাপক তিনি ছিলেন। 'হিন্দু' পত্রিকার সংগঠকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন এবং এর প্রথম সম্পাদকও ছিলেন তিনি।

এফ. এ. ক্লাশে একবছর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিলাম। পরের বছর এফ. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য আমি কোয়েম্বতুর যাই। আমি মাদ্রাজ খ্রীশ্চান কলেজে বি. এ. পড়ি। মাদ্রাজের এই দুটি বিখ্যাত কলেজের পার্থক্যটা যারা এই দুটি কলেজেই পড়েছে তাদের বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। দুটো কলেজেই বড় বড় প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু খ্রীশ্চান কলেজে প্রফেসর আর ছাত্রদের মধ্যে যে নিকট সম্পর্ক ছিল তা প্রেসিডেন্সি কলেজে পাইনি। ডক্টর স্কিনার, প্রফেসর হোগ, পিটেনবার্গ, মেস্টন প্রভৃতি অধ্যাপকদের ছাত্ররা কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এই সব প্রফেসরেরা প্রতিটি ছাত্রের বিষয়ে উৎসাহ দেখাতেন। ডক্টর স্কিনার ক্লাশে এলেই ক্লাশের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যেত। ছাত্রদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার মালয়ালম পণ্ডিত জুলিয়িল্ কৃষ্ণনের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিক্ষকতায়, তাঁর আচার-ব্যবহারে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আমরা শুনেছিলাম। তিনি কাউকে কখনো কটু কথা বলতে পারতেন না, কাউকে কখনো যদি অপ্রিয় বা অরুচিকর কিছু জানাতে হয় তাহ'লে সেটা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলার চেষ্টা করতেন। একবার এক ছাত্রের রচনা পড়ে, অনেক দাগ দিয়ে ছাত্রটিকে বললেন—"তোমার রচনায় অনেক ভুল শব্দ আছে। বিষয়বস্তুও বিশেষ কিছু নেই, বাক্য রচনাতেও অনেক ভুল আছে, হাতের লেখাও খারাপ। তবে সব মিলিয়ে রচনা খুব কিছু খারাপ নয়।"

রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং দেশীয় নেতাদের জীবনী পড়ার আগ্রহ আমার বরাবরই ছিল। হাতে পয়সা থাকলেই এই ধরনের বই কিনে পড়ে শেষ করতাম। এই সময় আমি লালা লাজপত রায়ের একটি ছোট্ট জীবনী লিখে ছাপিয়ে বার করেছিলাম। এর জন্যে কেউ কেউ আমাকে "পড়ার সময় এ সবে সময় নষ্ট করা উচিত নয়"—বলে উপদেশ দিতে ছাড়ে নি। বাবাও আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। তবে আমি

লেখক হিসেবে আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে খুব অহঙ্কারের সঙ্গেই ছেপে বার করেছিলাম।

বাবা সরকারী বিরোধী কোন কথাবার্তা বলা বা কাজকর্ম করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ রক্ষণশীল। মাদ্রাজে পড়ার সময় আমি আমার শিখা কেটে ফেলেছিলাম। কলেজের ছুটির পর বাড়ী এলে বাবা এজন্য আমাকে কঠিন তিরস্কার করেছিলেন। বাবা এসব ব্যাপারকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতেন।

প্রসিদ্ধ 'কেশরী' পত্রিকার কুঞ্জিরামন নায়ার "মালয়ালম একান্নবর্তী পরিবারের ভাগ হওয়া উচিত" এই বিষয়ে মাদ্রাজ মালয়ালী ক্লাবের সবচেয়ে ভালো প্রবন্ধ রচয়িতাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় আমিও যোগ দিই এবং পুরস্কার আমিই পাই। ছুটিতে যখন বাড়ী গেলাম তখন বাবা আমাকে এই লেখাটি পড়ে শোনাতে বল্লেন। আমার প্রবন্ধ একান্নবর্তী পরিবারের ভাগ হ'য়ে যাবার সমর্থনে লেখা হয়েছিল বলে বাবার ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। পড়ার শেষে খুব রেগে গিয়ে বল্লেন—"প্রথমতঃ তুই তোর শিখা কেটে ফেলেছিস, আর এখন এই একান্নবর্তী পরিবার ভাগ হয়ে যাবার সমর্থনে লিখেছিস। তোর মতিগতি যে কোন্ দিকে যাচ্ছে তা বোঝার সাধ্য আমার নেই।" এই প্রবন্ধ শোনার পর দু'তিনদিন পর্যন্ত বাবার মুখটা রাগে থম্‌থম্ করছিল।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে একবার মাদ্রাজে এসেছিলেন। তখন আমি খ্রীশ্চান কলেজে পড়ি। ভিক্টোরিয়া পাবলিক হলের উত্তর দিকটার খোলা জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শুধু ভারতবাসীই নয়, অনেক সাদা চামড়ার লোকেরাও গোখলের বক্তৃতা শুনতে জড়ো হয়েছিল। বাস্তব ঘটনার একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়ে, বেশী কথার মালা না সাজিয়ে, তিনি যা বিশ্বাস করেন তা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অন্যদের বোঝানোর একটা বিশেষ ক্ষমতা গোখলের ছিল। পুণায় অধ্যাপনার কাজ করার সময় তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। দেশের জন্য তিনি তাঁর জীবন সমর্পণ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন' দেশের সব কিছু ভালো করে জেনে জনসাধারণের সেবার জন্য ভারতবাসীদের নিয়ে একটা সংগঠন তিনি গড়েছিলেন। ১৯০৫ সালে পুণায় স্থাপিত এই সংগঠনের নাম ছিল 'সারভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। শ্রীনিবাসন্ শাস্ত্রী, দেবধার, পণ্ডিত কুঞ্জরু, কোদণ্ড রাও প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক বলে গোখলেকে দেশের যুবকেরা প্রায় পূজো করতো বল্লেই হয়। যে কোন প্রকারে একবার গোখলেকে আমার ছুঁতে হবে এই আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসলো। বক্তৃতা শেষ করে তিনি মঞ্চ থেকে নামার পরই লোকেরা

তাঁকে ঘিরে ধরলো। তাঁর কাছে যাবার কোনো উপায় ছিল না। গোখলে যখন গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন তখন তাঁর পেছন পেছন গিয়ে, সামনের লোকদের ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতটা হঠাৎ ছুঁয়ে ফেল্‌লাম। এই চেষ্টায় আমার টুপীটা মাটিতে পড়ে অন্যদের পায়ের তলায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। তা যাক, কিন্তু দেশপ্রেমিক গোখলেকে আমি ছুঁয়েছি। গোখলের লক্ষ্য থেকে ভারতবর্ষ আজ কতদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু তবু গোখলের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আজও আমাদের প্রেরণা জাগায়।

আমরা চার-পাঁচজন ছেলে একসঙ্গে একটা বাড়ী নিয়ে থাকতাম। এই পরিবারের সব দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন মতের চার-পাঁচজন লোক একসঙ্গে থাকলে তাদের সকলের সঙ্গে মানিয়ে থাকা খুব সহজ কথা নয়। অন্যদের সুখসুবিধার জন্য আমাদের নিজেদের কিছু কিছু সুখসুবিধা ত্যাগ করতে হয়। এর থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা লাভও হয়। সেদিন মাদ্রাজে যেসব বন্ধুদের সঙ্গে আমি ছিলাম তাদের মধ্যে কুট্টিকৃষ্ণ মেননের নাম বিশেষ করে বলতে চাই। কুট্টিকৃষ্ণ মেনন খুব ছোটবেলা থেকেই আমার বন্ধু। মাদ্রাজে বেশ কিছু দিন একসঙ্গে থাকার পর আমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হল। আমি ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার আগেই সে মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছিল। বুদ্ধি, সত্যবাদিতা আর কর্তব্যকর্মে অসীম নিষ্ঠার ফলে কৃষ্ণকুট্টি মেনন মাদ্রাজ বারের একজন প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ষাট বছরেরও বেশী আমি আর কৃষ্ণকুট্টি মেনন সুখেদুঃখে একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। সময় আমাদের এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে নি।

আমি কয়েকবার মাদ্রাজের মালয়ালী ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছিলাম। সুব্বারাওলু নামে একজন বেয়ারা সে সময় আমাদের ক্লাবে কাজ করতো। ক্লাবের মেম্বারদের কাছ থেকে যেভাবে সে চাঁদা আদায় করতো তা দেখার মত। ঐ বেয়ারাটা না থাকলে আমাদের ক্লাব চলতো না বললেই হয়। সকাল বেলায় চাঁদার বই হাতে নিয়ে চাঁদা আদায় করার জন্য সে বেরিয়ে পড়তো। 'এখন সময় নেই, ছুটির দিন এসো'—বললে সুব্বারাওলু ঠিক সেইদিন এসে উপস্থিত হ'তো। তার সেই মাথা নীচু করে নমস্কার করা আর মৃদু হাসি দেখে চাঁদা না দিয়ে পারা যেত না। স্যার সি. শঙ্করণ নায়ার, ডক্টর টি. এম. নায়ার, উকীল নাম্বিয়ার, সি. গোপাল মেনন, কে. করুণাকর মেনন —এঁরা ছিলেন তখন মাদ্রাজের নাম করা মালয়ালী। শঙ্করণ নায়ার তাঁর বড় কাজ আর বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে অন্যদের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিলেন। ডক্টর নায়ার খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। জাস্টিস্ পার্টির সংগঠন করা এবং তার নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে এই পার্টি পরে একটা বড় রাজনৈতিক পার্টি হ'য়ে

দাঁড়িয়েছিল। করুণাকর মেনন একজন নাম করা সম্পাদক ছিলেন। বেশ কিছুদিন 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ দেখার পর তিনি 'ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট' বলে একটা দৈনিক পত্রিকা বার করেন। এ কাগজটা অবশ্য বেশী দিন চলেনি। করুণাকর মেনন মাদ্রাজের সাংস্কৃতিক আর সামাজিক জীবনেও অনেক অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বি. এ. পরীক্ষা পাশের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম, কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন আমার বাবা। বি. এ. পাশের পর আমি কি করবো তাই নিয়ে দীর্ঘ জল্পনাকল্পনা চল্‌ল। বাবার অনেক বন্ধু তাঁকে উপদেশ দিলেন ছেলেকে সরকারী কাজে ঢুকিয়ে দিতে। আমার কিন্তু সরকারী কাজ একেবারেই পছন্দ ছিল না। আমার ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ব্যারিষ্টারী পড়ার ইচ্ছে ছিল। আমাকে বিলেত পাঠানোর মত পয়সা বাবার আছে কিনা আমার জানা ছিল না। সে সময়ে সংসারে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল যাতে বাবাকে খুব অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। কিন্তু যে করেই হোক আমার আগ্রহ মিটোবেন বলে বাবা ঠিক করলেন। এর জন্যে তাঁকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হ'য়েছিল সে কথা ভেবে সেই মহান পিতৃহৃদয়ের কাছে আমি আর একবার মাথা নীচু করছি। অনেক পিতা তাঁদের সন্তানদের জন্য যে ত্যাগ আর কষ্ট স্বীকার করেছেন তা ভাবলে আমাদের হৃদয় ভক্তি আর শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। সন্তানদের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করা পিতারা যখন তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের কাছ থেকে আঘাত পান তখন মানুষ যে কত হীন কত নীচু, এ কথা ভেবে দুঃখের সীমা থাকে না।

আমার বিলেত যাওয়াটা আমার ছোট্ট গ্রামটির কাছে একটা বিরাট ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি বাড়ী থেকে যাত্রা করার পর বিরাট এক জনতা বেশ কিছু দূর আমার পেছন পেছন এলো। ওলাভাকোট স্টেশন থেকে গাড়ী চলতে শুরু করলে আমার বাবা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। বাবার সঙ্গে সেই-ই যে আমার শেষ দেখা এ কথা আমি ভাবতেই পারিনি। ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে আমি ইংল্যাণ্ডে পৌছোলাম।

বিলেতের খবর মাঝে মাঝে তাঁর কাগজে পাঠানোর জন্যে কালিকটের 'মনোরমা' দৈনিক পত্রের সম্পাদক কুঞ্জীকৃষ্ণ মেনন আমাকে বলেছিলেন। তাঁর কথামত 'বিলাতের খবর' লেখা শুরু করি। সেই লেখাগুলো একসঙ্গে করে 'বিলাতের খবর' বলে একটা বই বার করি। এই লেখার সময় কেরলের নানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেবার জন্যে 'মনোরমা' কাগজ ও তার তখনকার সম্পাদকের কাছে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আমি এখানে জানিয়ে রাখছি।

চার

ইউরোপে

কলম্বো থেকে যে জাহাজে আমি লণ্ডনে যাবার জন্য চড়ি, সেটা অস্ট্রেলিয়া থেকে লণ্ডনে যাচ্ছিল। এই জাহাজের কর্মচারীরা বেশীর ভাগই সাদা চামড়ার লোক ছিল। এতদিন সাদা চামড়ার লোকেদের বড় বড় কাজ করতেই দেখেছি। এখন তাদের চাকরবাকর হিসেবে দেখে আমার খুব অদ্ভুত লাগলো। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেশ কিছুদিন কাটলো। এর মধ্যে সাতদিন সমুদ্র ব্যাধিতে খুব ভুগলাম। বমি আর মাথাধরা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। বিলেত না গেলেই হ'ত এরকম একটা ভাবনা আমার মনে কয়েকবার উদয় হয়েছিল। সুয়েজ খাল না পৌছোনো অবধি আমার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল। মার্সেলিসে পৌছে ট্রেনে করে লণ্ডনে গেলাম। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আমার এক বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে গন্তব্যস্থলে গেলাম।

লণ্ডনের সব কিছু ঘুরে দেখতে দেখতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, ঐ বৃহৎ শহরের পরিচ্ছন্নতা, তার সৌন্দর্য, যানবাহনগুলির চলাচল। সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা, লোকেদের সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার, অপরকে সাহায্য করার মনোভাব, পুলিশদের কর্ম তৎপরতা, সাধারণ লোকের ভদ্র ব্যবহার দেখে আমি সত্যই অভিভূত হয়ে গেলাম। তাদের ওপর একরকম স্নেহের আকর্ষণও আমি অনুভব করলাম। ভারতে ইংরেজদের যে ব্যবহার দেখেছিলাম, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এখানকার ইংরেজদের ব্যবহার। গর্ব আর তাচ্ছিল্যের পরিবর্ত্তে দেখলাম নম্রতা আর শিষ্টতা। ইংরেজদের কর্মকুশলতা, জীবনকে উপভোগ করার আগ্রহ আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। পরস্পরকে সাহায্য করার যে মনোভাব আমি সেখানে দেখেছিলাম, তার থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেছিলাম। এদের এই সব গুণের কিছু কিছুও যদি আমাদের দেশের লোকেরা পেত —এ চিন্তা আমার মনে প্রায়ই উদয় হতো।

সর্বগুণসমন্বিত কোন লোক বা দেশ এ পৃথিবীতে দেখা যায় না। অন্যদের ভালো গুণগুলি নেওয়া আর দোষগুলি পরিহার করার চেষ্টা করলে আমাদের চরিত্রের বিকাশ হয়। ইংরেজদের মধ্যে নানা গুণ আছে যা আমাদের দেশের লোকেদের অনুকরণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছিল। আমার এই মনোভাবের আজও কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি।

লণ্ডনে আমি একটি ছোট্ট ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে বাস করতাম। এই পরিবারে একজন স্ত্রীলোক এবং তিনটি বাচ্চা ছিল। আমি আর আমার বন্ধু এখানে 'পেয়িং গেস্ট' হিসেবে একটা ঘর নিয়ে থাকতাম। এই মহিলাটি কি ভাবে তাঁর গৃহকর্ম করতেন তা দেখে শেখা উচিত। সকালবেলা উঠে বাড়ী ঘরদোর পরিষ্কার করে, আমাদের সকলের খাবার তৈরী করে, খাইয়ে দাইয়ে তিনি বাজারহাট করতে বেরিয়ে যেতেন। তার আগে বাচ্চাদের খাইয়ে দাইয়ে তাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার পাঠিয়ে তাদের স্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। আমরা বাইরে গেলে পর আমাদের ঘরগুলো ঝাঁটপাট দিয়ে, জানলা-দরজা সমস্ত কিছু মুছে পরিষ্কার করতেন। একদিনও এ কাজে বাদ পড়ত না। সন্ধ্যেবেলায় আমরা বাড়ীতে ফেরার সময় দেখতাম মহিলাটি আমাদের জন্য চা তৈরী করে অপেক্ষা করছেন। রাতের খাবারের জন্য বিশেষ কিছু তৈরী করতে হবে কিনা জেনে নিয়ে তারপর রাঁধতে যেতেন। সময় পেলে বই বা কাগজ পড়তেন। একটা কাজও ভদ্রমহিলা ফেলে রাখতেন না। খুব যে তাড়াহুড়ো করতেন তাও নয়। প্রত্যেকটা কাজের একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। সেই সময় সেই কাজ করতেন।

দু'বছর এই বাড়ীতে আমি ছিলাম। দেশে ফেরার সময় নিজের পরিবার ছেড়ে যাওয়ার মতো কষ্ট আমার হয়েছিল। শুধু রক্তের সম্পর্ক থাকলেই যে আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠে তা নয়। যদি একজন মানুষের স্বভাবটি হাসিখুশী হয়, যদি অন্যের সুখদুঃখে ভাগ নেবার জন্য সে এগিয়ে যায় তাহলে তার সঙ্গে আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠতে সময় লাগে না। কেউ কেউ তাদের ব্যবহারে অন্যদের আকৃষ্ট করে। আবার কেউ কেউ তাদের ব্যবহার দিয়ে অন্যদের ঘৃণা লাভ করে।

বৃটেনের সব জায়গায়ই অপরিমিত ব্যক্তি স্বাধীনতা দেখতে পাওয়া যায়। রবিবার আমি আর আমার বন্ধু লণ্ডনে হাইড পার্কে অনেকক্ষণ ধরে বেড়াতাম। সেখানে নানারকম বক্তৃতা আমরা শুনতাম। এই সব বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল নানারকম। এই বক্তৃতায় তাদের মতের স্বাধীনতা আর তা শোনার জন্য লোকের ভীড় দেখে আমরা বিদেশীরা খুব আশ্চর্য বোধ করতাম। ইংরেজদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা, তাদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ইংল্যাণ্ডের নির্ভয় অন্তরীক্ষ আমাদের মতো পরাধীন জাতির মনে সত্যিই উন্মেষ আর প্রেরণা যোগাত।

ইংল্যাণ্ডের অবস্থা আর সেখানকার অপূর্ব ব্যবস্থার বিষয় যতই জানতে পারলাম ততই আমার দেশের কথা ভেবে আমার খুব লজ্জা আর কষ্ট হতো। ভারতবর্ষ পরাধীন এই বাস্তব সত্য ভোলা খুব কঠিন ছিল। আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিকই নই, বৃটিশ সম্রাটের প্রজা, এই চিন্তা সব সময় আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধতো।

আমি যে বাড়ীতে থাকতাম, সেই বাড়ীর একটি মেয়ে একদিন আমাকে বলল—"কাল আমাদের শিক্ষক আমাদের ভারতবর্ষের কথা বলছিলেন। ভারতবাসীদের তাদের নিজেদের রাজ্যশাসন করবার ক্ষমতা নেই। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ক'রে দেশে অশান্তি আনছে। তাই তাদের হ'য়ে আমরা রাজ্যশাসন করছি। আমরা চিরদিন ভারত শাসন করবো।"

এই শিক্ষয়িত্রী যা বলেছেন তা কি ঠিক নয়? আমাদের নিজেদের মধ্যে এই বিভেদ কি আমাদের অন্যের অধীন করেনি? এই অবস্থা থেকে ভারতকে উদ্ধার করার পথ কি? আমরা ছাত্রেরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করতাম।

অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানার আমার আগ্রহ হল। ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, জর্জ ওয়াশিংটন, রানী লক্ষীবাঈ প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের জীবনী পড়ার আগ্রহ আমার বাড়তে লাগলো। পড়া ছাড়াও দেশের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছেও আমার মনে জেগে উঠতে লাগলো। জনজীবনে অংশগ্রহণ করা ছিল আমার আকাঙ্খা। এর জন্যে যে পরিশীলনের দরকার তা ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে নেবো এই ইচ্ছে আমার ছিল। সেখানকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখে শেখার আগ্রহ আমার বাড়তে লাগলো। "লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স্" এই শিক্ষায়তনে যোগ দিয়ে অনেক দিন পড়াশুনো করেছিলাম। অনেকবার বিলেতের পার্লামেণ্টে গিয়ে সেখানকার তর্কবিতর্কও শুনেছি।

বাবার খুবই ইচ্ছে ছিল যে আমি কোন সরকারী পদ গ্রহণ করি। কয়েকটা চিঠিতে বাবা তাঁর এ ইচ্ছের কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ওপর বাবার খুব ভক্তি ছিল। তাদের শাসন ব্যবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

আমার লণ্ডনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপত রায়, মুহম্মদ আলি জিন্না, সরোজিনী নাইডু, স্যার সি. শঙ্করণ নায়ার, অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা সে সময় লণ্ডনে এসেছিলেন। তাঁদের জন্য আহূত প্রত্যেকটি সভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। এই সব দেশপ্রেমিক নেতাদের দেখবার, তাঁদের কাছে যাবার খুব আগ্রহ আমার ছিল। এই সব নেতাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। তাঁদের কোনো কাজ করে দিতে পারলে আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করতাম। আমার অপরিণত বুদ্ধি দিয়ে যেসব মতামত আমি প্রকাশ করেছিলাম তা' শুনে তাঁরা হয়তো মনে মনে হেসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কি সব বোকার মত কথাবার্তা বলেছিলাম তা আমার পরে মনে হয়েছে। তবুও এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি যে কথা বলতে পেরেছি তার জন্য আমি খুব গর্ববোধ করতাম।

ইংল্যাণ্ডের এক গ্রামে এক কৃষকের বাড়ী থাকার সময় আমার বাবার মৃত্যুর টেলিগ্রাম পাই। বাবা অসুস্থ ছিলেন সে কথা আমি জান্‌তাম। তাই বলে যে তিনি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যাবেন একথা ভাবতে পারিনি। বাবা চেয়েছিলেন যে আমি ব্যারিষ্টার হয়ে বাড়ী ফিরি। সেই ব্যারিষ্টার হ'য়ে পিতৃহীন বাড়ীতে আমি যাবো একথা যেন আমি ভাবতেও পারছিলাম না।

ইংরেজ কৃষকটি এবং তার স্ত্রী আমাকে অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। নির্জন জায়গায় একলা একলা বসে বাবার চিন্তা করে আমি অনেক সময় কাটালাম। কঠিন দুঃখের সম্মুখীন হবার সময় যদি নিজের লোকজন কাছে না থাকে তাহ'লে সেই দুঃখভার যে কতখানি দুঃসহ হয়ে ওঠে তা বলে শেষ করা যায় না।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমার ঠিকমতো বিশ্বাস না থাকায় আমি খুব অসুবিধায় পড়লাম। ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে যে সব সংস্কার, বিশ্বাস শিকড় গেড়েছিল আজ তা সব অর্থশূন্য বলে মনে হ'লো। কিন্তু তাদের জায়গায় অন্য কিছু খুঁজেও পেলাম না। অনেক বই আমি পড়ে দেখলাম, অনেক বক্তৃতাও শুনলাম। তবু আমার মনে দৃঢ় কোন বিশ্বাস গ'ড়ে উঠলো না। টমাস অ্যাকেম্বির 'খ্রীস্টের অনুকরণ,' এপিক্টেটাসের বক্তৃতাগুলি, মার্কাস অরেলিয়াসের 'আত্মচিন্তা' এডউইন্ আর্নল্ডের 'প্রাচ্যদীপ' বইগুলি আমার খুবই প্রিয়। খ্রীস্ট এবং বুদ্ধের জীবনী বারবার পড়েও আমার তৃপ্তি হয় না, তেমনি পঞ্চতন্ত্র আর রামায়ণও। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ আমার মুখস্থ। তবু মৃত্যুর পর কি হয়, এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস কি কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার পক্ষে ঠিকমত জবাব দেওয়া মুশ্‌কিল হতো।

আমার নিজের বিশ্বাসানুযায়ী জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ আমার ছিল। কিন্তু এর জন্যে যে সাহসের দরকার, সে সাহস আমার ছিল না। এমনি ভাবে কাজ করবো বলে ঠিক করে তেমনি ভাবে আরম্ভও করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগিয়ে তাকে নিয়ে যাবার চারিত্রিক দৃঢ়তা আমার ছিল না। বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন, খরচের একটা হিসেব রাখতে। কয়েক দিন খরচের হিসেব রাখলাম। তারপর আর রাখতে পারলাম না। দু'তিন মাস পরে আবার আরম্ভ করলাম। আগের মতোই তার শেষ হলো। তেমনি ভাবে আমার দৈনন্দিন কাজকর্মও। কি করবো না করবো তা ভেবে রাখতাম, কিন্তু তা করতে পারতাম না। যা করা সম্ভব নয় তা করা, যা করা উচিত তা ফেলে রাখা, এসব যে ঠিক নয় আমি তা ভালো করেই জানতাম। কিন্তু তবু যে করতে পারিনি তার কারণ, চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব। এর জন্য আমি খুব মনোকষ্ট পেয়েছি।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে এক বন্ধুর সঙ্গে ইউরোপের কয়েকটি রাজ্য দেখার জন্য বেরোলাম। আমরা যখন জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে ছিলাম তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর দু'মাস আমরা সুইট্জারল্যাণ্ডে ছিলাম। লণ্ডনে ফেরার তখন উপায় ছিল না। ইন্টারলাকান নামে একটা বোর্ডিং হাউসে আমরা ছিলাম। ফিরে যাবার সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লণ্ডন ফিরে গেলাম। সেই সময়কার সব অভিজ্ঞতা আমি আমার 'বিলাতের খবর' বইটিতে সব বিশদভাবে বলেছি ব'লে তার আর পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। তখনকার শুধু একটি ঘটনার কথা এখানে বলবো।

ইনটার্লাকানে পৌঁছোনোর পর আমাদের হাতে টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে আমাদের হাতের নোটগুলো পর্যন্ত ভাঙাবার উপায় ছিল না। শুধু আমাদের নয়, অন্যান্য ভ্রমণকারীদের অবস্থাও এই একই ছিল। টাকা দেবার মত ক্ষমতা আমাদের তখন নেই জেনেই বোর্ডিং-এর মালিক আমাদের সেখানে থাকতে দিয়েছিলেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর এক ইংরেজ ভদ্রলোক বল্লেন যে ইনটার্লাকানে যে সব বৃটিশ প্রজা বাস করছে তাদের দরকার মত টাকা লণ্ডন থেকে গভর্নমেণ্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের যদি টাকার দরকার থাকে তাহলে এর জন্যে গঠিত এক বিশেষ কমিটির কাজে জানালে আমরা সাহায্য পেতে পারি। ব্রিটিশ প্রজাদের সুযোগসুবিধা চাইবার অধিকার আমাদের ছিল। আমি আর আমার বন্ধু এই কমিটির কাছে গিয়ে লণ্ডন না পৌঁছোনো অবধি এখানে থাকার জন্য আমাদের কত টাকার দরকার তার একটা হিসেব তাদের জানালাম। তা শুনে কমিটির একজন সদস্য মন্তব্য করলেন যে টাকাপয়সার জন্যে আমাদের এখন এত তাড়া নেই! ব্রিটিশদের টাকা দেওয়া হচ্ছে শুনতে পেয়ে আমরাও নাকি টাকার দাবী করছি। তাই আমাদের টাকা দেওয়াটা এখন সম্ভব নয়। এই লোকটি তখন ভারতে একজন বড় ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন। এই লোকটি এই সময় সুইট্জারল্যাণ্ডে এসেছিলেন এবং তখন ফিরে যাবার উপায় ছিল না বলে এখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়ে ইন্টারলাকানে প্রায় তিনশ' ব্রিটিশ প্রজা বাস করছিল। তাদের মধ্যে আমরা দু'জন মাত্র ভারতীয় ছিলাম।

এই লোকটি এমনভাবে কথা বলার পর—"আমরা ভিক্ষে চাওয়ার জন্যে এখানে আসিনি। কমিটির নিমন্ত্রণেই আমরা এখানে এসেছি। আমাদের দেশ এবং আমাদের সম্বন্ধে কমিটির একজন সদস্য নিন্দনীয় কথাবার্তা বলেছেন এবং এই কথাবার্তার কেউ প্রতিবাদ করেনি বলে এই কমিটির সাহায্যের আমাদের দরকার নেই" বলে আমরা

সেখান থেকে চলে এলাম। সেদিনই আমরা কমিটির সেক্রেটারীকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দিলাম। চিঠির শেষে লিখলাম—'ওপরে লিখিত বিবরণানুযায়ী আপনাদের কমিটির কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া আমাদের এবং আমাদের দেশের পক্ষে অপমানকর বলে আমরা মনে করি। আশা করি এই ব্যাপার আপনাদের কমিটিকে জানাবেন।'

কমিটির সেক্রেটারীর কাছ থেকে পরের দিন এই চিঠির উত্তর পেলাম। আগের দিনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য কমিটি খুবই দুঃখিত। দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন সদস্য এই মত প্রকাশ করেছে বলে তা কমিটির মত বলে আমরা যেন না ভাবি। টাকা পয়সার যা দরকার তা জানালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা তা পাঠিয়ে দেবেন—এই ছিল চিঠির সংক্ষিপ্তসার। টাকার দরকার নেই বলে আমরা জানালাম! লণ্ডনে ফিরে যাবার পাশ মাত্র আমরা নিলাম।

এই ঘটনায় বোর্ডিং-এর মালিক আমাদের অভিনন্দন জানালেন। তিনি বল্লেন যে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তাঁর টাকাটা পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিছু দিন পরে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রাপ্য টাকাটা আমরা পাঠিয়ে দিলাম।

পরীক্ষায় পাশ করে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে যাবার সময় আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু নারায়ণন মেননের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তিনি তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পাবার জন্য ডাক্তারী পড়ছিলেন। তাঁর পড়াশুনো শেষ হ'তে আরো দু'বছর। কলেজের সময় ছাড়া বাকী সব সময় আমরা দু'জন একসঙ্গে কাটাতাম। যতদিন না তিনি দেশে ফেরেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না এই ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমরা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই তখন এই বিদায়ই যে শেষ বিদায় তা তখন আমি ভাবতেই পারি নি। দু'বছরের আগেই তিনি লণ্ডনে মারা যান। সৌম্য, শান্ত, সৎ, দয়ালু ঐ যুবকটি যে একদিন খুব ভালো ডাক্তার হতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। তবে বিধির বিধান বোধহয় অন্যরকম ছিল।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে আমি দেশে ফিরলাম। যুদ্ধ তখনো চলছিল। শত্রুর ভয়ে জাহাজে যাওয়া সে সময় খুবই বিপজ্জনক ছিল। তাই জাহাজ যখন নিরাপদে বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছোলো তখন মরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

দেশে যখন ফিরলাম তখন বাজিবাজনা, হাতী ইত্যাদি নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এক বিরাট জনতার ভীড় দেখে আমার খুব মজা লাগলো। আমাদের

গ্রাম থেকে সে সময় আমি ছাড়া আর কেউ বিলাত যায় নি। তাই আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সারা গ্রাম জড়ো হ'য়েছিল।

তিন বছর পরে আমি দেশে ফিরে এলাম। এই সময়ের মধ্যে আমার স্নেহময় পিতা আর এক বোনও মারা যায়। এই বিরাট পরিবারের সব ভার আমি আমার বৃদ্ধা মাতার ক্ষীণ হাত থেকে আমার হাতে তুলে নিলাম।

পাঁচ

প্র্যাকটিশ আর জনজীবন

১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে আমি কালিকটে প্র্যাকটিশ্ আরম্ভ করি। টেবিল, চেয়ার, আলমারী, বই ইত্যাদি সাজিয়ে মক্কেলদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি অধৈর্য হ'য়ে গেলাম। আমার কয়েকজন বিজ্ঞ বন্ধুবান্ধব বল্লেন যে সবচেয়ে প্রথমে দরকার একজন অভিজ্ঞ ক্লার্ক। ভালো একজন ক্লার্ক না পাওয়া অবধি কোর্টের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন সবজান্তা গোছের লোক আমার সঙ্গে কিছুদিন কালিকটে এসে রইলো। এই লোকটির নাকি অনেক বড় বড় উকীলের সঙ্গে চেনা পরিচয় ছিল। এই সব উকীলেরা তাদের কেসগুলোকে কেমন ভাবে চালায় তার অনেক গল্প সে আমায় করেছিল। বেশ মজার মজার গল্প সব। একজন উকীল নাকি কেসের দরকার মত প্রমাণ তৈরী করতেন। মাস্টার যেমন ছাত্রদের পড়ায়, তিনিও তেমনি তাঁর সাক্ষীদের শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতেন। অপর পক্ষের উকীলের বাদানুবাদের সময় জজ কিছু লিখতে আরম্ভ করলে—"অমনি ভাবে লেখা চলবে না"—বলে জজকে এক উকীল হুকুম করেছিল সে গল্পও এই লোকটি করেছিল। উকীলের কথা না শুনে জজ লিখে চললে উকীল জজের হাত পর্যন্ত চেপে ধরেছিলেন। লোকটির এই সব গল্প আমি বিশ্বাস করেছি ব'লে সে হয়তো বিশ্বাস করেছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—মিথ্যে প্রমাণ তৈরী করাটা কি উচিত? তাতে সে উত্তর দিল—কোর্ট সত্যের জন্যে নয়, ন্যায়ের জন্যে। কেসে জেতার জন্যেই মক্কেলরা উকীলের সাহায্য নেয়। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, উকীলদের যে ক'রেই হোক, কার্যসিদ্ধি করতে হবে। সব সময় সত্যি কথা বলতে হ'লে উকীলের কাছে কে যাবে?

যে ক'রেই হোক আমাকে একটা কেস যোগাড় করে দিতে হবে বলে লোকটি ঠিক করলো। আমি কেমনভাবে কেসটা চালাই তা দেখারও তার আগ্রহ ছিল। সকালে স্নান করে, কফি খেয়ে আমি অফিসে গিয়ে বসতাম। দশটার সময় খেয়েদেয়ে কোর্টে যেতাম। এমনি ভাবে দু'মাস কেটে গেল।

একদিন সকালে যখন আমি স্নান করছিলাম তখন লোকটি আমাকে তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে বাইরে আসতে বলল। কয়েকজন মক্কেল এসেছে ব'লে সুখবরটি আমাকে জানালো। আমার স্নান শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে পাঁচ

মিনিটের মধ্যে অফিসে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। 'মক্কেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করার পর 'তারা অন্য উকীলের বাড়ীর খোঁজ করতে এখানে এসেছিল'—এই উত্তর পেলাম। লণ্ডনে আমি যখন এক ব্যারিস্টারের অধীনে শিক্ষানিবাসী করছিলাম তখন সেই ভদ্রলোক একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। তার কথা এখন মনে হলো।

প্র্যাকটিশ আরম্ভ করার বেশ কিছুদিন পরও কোনো কেস হাতে না পাওয়া এক ব্যারিস্টারের গল্প। এই ভদ্রলোক রোজ অফিসে যেতেন। কিছুক্ষণ সেখানে ব'সে কোর্টে যেতেন। কোর্টে যাবার আগে তিনি ক্লার্ককে বলে যেতেন যে যদি কোন মক্কেল আসে তা'হলে তাঁকে যেন কোর্টে খবর দেওয়া হয়। এমনি ভাবে বেশ কিছু কাল কেটে গেল, মক্কেলের কোনো পাত্তা নেই। একদিন ব্যারিস্টার কোর্টে বসে আছেন, সেই সময় তাঁর কেরানীটি ছুটে এসে খবর দিল যে একজন মক্কেল এসেছে। ব্যারিস্টারটি শুনে খুব খুশী হয়ে ক্লার্ককে বল্লেন,—শীগ্‌গির গিয়ে তাঁকে বসাও, আমি এক্ষুনি আসছি।

ক্লার্ক বলল—মক্কেল পালাতে পারবে না, আমি দরজায় চাবি দিয়ে এসেছি।

তাঁর কেরানীটির তৎপরতায় খুশী হয়ে ব্যারিস্টার অফিসে এসে দরজা খুলে দেখেন ঘরেতে কেউ নেই। পেছনের দরজা বন্ধ করতে কেরানীটি ভুলে গিয়েছিল।

তা সে যাই হোক, বেশী দেরী না করে এই লোকটি একটা কেস আমার জন্যে নিয়ে এল। তখন আমি একটি ক্লার্কও পেয়েছি। কেসটি ছিল হেরিডেটারী সার্টিফিকেটের জন্য একটা আরজি। লোকটি আমায় উপদেশ দিল—'সায়েবের কোর্টে কেস উঠেছে। বেশ ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন।' এইটেই আমার প্রথম কেস। পাঁচ টাকা ফী পেলাম। পিটিশনটা খুব ভালো করে পড়লাম, আইনকানুনও সব দেখলাম। 'প্রথম কেস, যেন জিতি'—মনে মনে এই প্রার্থনা ক'রে কোর্টে গেলাম, তখন জেলা জজ ছিলেন মিঃ জ্যাকসন। আমার কেসের ডাক পড়লো। আমি সব রেকর্ড নিয়ে আইনের বই খুললাম। তার আগেই আরজি অনুমোদন করে অর্ডার দেওয়া হলো। আমার দাঁড়ানো, বই খোলা ইত্যাদি খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমার ক্লার্ক আর সেই লোকটি লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হলো না। এমনি ভাবে আমার প্রথম কেস আমি চালালাম।

কালিকটের বার লাইব্রেরী তখন অনেকটা ক্লাবের মত ছিল। যেসব উকীলদের হাতে বেশী কেস ছিল না তাঁরা এখানে ভীড় জমাতো। তারা নানা বিষয়ে গল্পগুজব করতো, আড্ডা মারতো। একটু নিশ্চিন্তে পড়াশুনা করার সুযোগ এখানে মিলত না। যারা নতুন প্র্যাকটিশ করতে নেমেছে তারা তাদের সরকারী শিক্ষানবিশীর সুযোগও

এখানে পেত না। আজ এই অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আমার সঠিক জানা নেই।

দু'তিনজন উকীল একসঙ্গে প্র্যাকটিশ করলে কেস চালানোর খুব সুবিধে হয়, কারণ তাতে একজন আর একজনকে সাহায্য করতে পারে। বিদেশে এই ধরনের চলন থাকলেও আমাদের দেশে এটা দেখা যায় না। যদি এরকম ব্যবস্থার প্রচলন আমাদের দেশে হয়, তা'হলে উকীল এবং মক্কেল দু'জনেরই খুব সুবিধে হয়। আজকের এই অবস্থায় এইরকম একটা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা উচিত বলেই মনে হয়।

কালিকট থেকে তিরুরে একবার একটা কেসের জন্যে আমি গিয়েছিলাম। এখানে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় চার-পাঁচজন লোক অনেকগুলো কাগজের বাণ্ডিল এনে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। পরদিন তিরুর মুন্সেফ কোর্টে একটা কেসে আমার উপস্থিতির জন্য তারা আমাকে অনুরোধ করতে এসেছে। কেসটা আমি হাতে নিলাম। সব কাগজপত্র দেখার জন্য আমার তিন ঘন্টারও বেশী সময় লাগলো, ফীও ঠিক হলো। ফী আর পথের খরচের টাকা নিয়ে তারা রেলষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে বলে বলল। আমি সময়মত ষ্টেশনে গিয়ে দেখি একজন মাত্র লোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়ী ছাড়তে পাঁচ মিনিট বাকী ছিল। ঐ লোকটি আমাকে বলল—"আমার সঙ্গের লোকেরা বাজারে গেছে। তারা অন্য গাড়ীতে আসবে। আমরা এই গাড়ীতে যাই চলুন। টাকা ওরা নিয়ে আসবে।" এর পর লোকটা আমার আর তার টিকিট আমাকে দিয়ে কেনালো। আমরা তিরুর পৌছোলাম। কি কারণে যেন কেসটাকে কিছুদিনের জন্য ফেলে রাখা হ'ল। শতকুন্নী মেনন ছিলেন তখন মুন্সেফ। তিনি আমাকে ছোটবেলার থেকেই জানতেন। কেসের দিন ফেলে তিনি দুপুরবেলায় তাঁর অবসর সময় আমাকে তাঁর নিজস্ব ঘরে ডেকে বসালেন। আমি একজন অল্পবয়সী ব্যারিস্টার, তাই মক্কেলদের সঙ্গে কেমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে সে নিয়ে কিছু উপদেশ দিলেন—"যখন বাইরের কোনো কেস হাতে নেবে তখন ফী না নিয়ে কক্ষনো বাড়ীর বাইরে পা দেবে না। মক্কেলরা অনেক সময় ফী না দিয়েই অল্প বয়সী উকীলদের ঠকায়।" তাঁর এই উপদেশ আমার মনে বিঁধে গেল। কালিকটে ফিরে যাবার সময় মক্কেলদের খোঁজ ক'রে কাউকে পেলাম না। এবার থেকে শতকুন্নী মেননের উপদেশ মতো কাজ করবো ঠিক করে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে কালিকটে ফিরে এলাম। এই মক্কেলদের আমি আর পরে দেখিনি।

প্র্যাকটিশ আমি বেশী দিন করিনি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার যে অভিজ্ঞতা হয় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে চাই। কেস চালাবার সময় কিছু উকীল জজদের সঙ্গে যে

রকম ব্যবহার করে তা আমার খুব খারাপ লেগেছে। কোর্টকে সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু তার জন্য আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়, জজ চেয়ারে বসে আছেন, উকীল বারে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু দুজনেই দুজনের কর্ত্তব্য কাজ করছেন। জজের কাউকেই ভয় করার দরকার নেই। উকীলেরও জজকে ভয় করবার দরকার নেই। একজন ভয়ডরহীন উকীলের পক্ষেই তাঁর মক্কেলের কেস ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কেসে হারলেও ক্ষতি নেই কিন্তু তার জন্যে সত্যকে বলি দিলে চলবে না।

জনসাধারণের উপকারের জন্য উকীলরা অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁদের কাজকে শুধুমাত্র পয়সা উপার্জন করার একমাত্র পথ বলে উকীলদের ভাবা উচিত না। অন্য লোকের ভার লাঘব করে তাদের সুখশান্তি বাড়ানো উকীলদের পক্ষে সম্ভব। অনেক দেশে নিয়ম-সভাগুলোয়, সে দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিষ্ঠানগুলিতে অভিভাবকেরা যে প্রভাব বিস্তার করেন তা রীতিমত বিস্ময়জনক। দেশের অবস্থা বদলানোর সঙ্গে আমাদের দেশেও অভিভাবকদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার ক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তা তাঁদের থাকা উচিত। কেউ কেউ যেমন বলে যে উকীলেরা সমাজের পরগাছা তা মোটেই নয়। উকীলেরা সমাজের নিয়মকানুন, নীতি, ন্যায়কে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান স্তম্ভ।

১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে আমি 'বিলাতের খবর' বইটি বার করি। এর জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে যে অভূতপূর্ব সাড়া পাই তাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম।

বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে সব বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আসতে লাগলো তাতে দেশের রাজনৈতিক আর সামাজিক জীবনে ভাগ নেবার আগ্রহ আমার বাড়তে লাগলো। ছোট ছোট দেশগুলির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে একথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করলে পর ভারতের মতো একটা বিরাট দেশকে স্বাধীনতা না দেওয়ার অর্থ কি, ভারতবাসীরা জিজ্ঞাসা করলো। ভারত তার নিজের শাসন নিজে করবে এই উদ্দেশ্যে অ্যানি বেসান্তের 'হোমরুল' আন্দোলন শুরু হলে পর সারা দেশ একে স্বাগত সম্ভাষণ জানালো। ইংরেজরা যখন একটা বিশ্ব মহাযুদ্ধতে জড়িয়ে পড়েছে তখন তাদের সাহায্যের পরিবর্ত্তে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আনা নিয়ে তাদের বিরক্ত করাটা ঠিক নয় ব'লে কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের অনেকে বলতে আরম্ভ করলেন। অ্যানি বেসান্তের মত ছিল ঠিক এর উল্টো। তিনি বেশ দৃঢ় ভাবেই বললেন যে ইংরেজরা যখন বিপদের সম্মুখীন তখনই তাদের ভারতবর্ষের কথা বলে আরো ব্যতিব্যস্ত করে তোলা উচিত। ৬৭ বছরের এই বৃদ্ধা এক যুবতীর

উৎসাহ নিয়ে বীর যোদ্ধার মত সমরে নামলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায় একথা তিনি জোর গলায় ঘোষণা করলেন। সব কিছু জড়তা আর আলস্য পরিত্যাগ ক'রে হোমরুল আন্দোলনে শক্তি জোগাবার জন্য তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। দেশের লোক তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পাঠ এই ভাবেই তারা শিখল। অ্যানি বেসান্তের সম্পাদকীয়ত্বে মাদ্রাজ থেকে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটা কাগজ এই আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে বেরোলো। দেশের চারিদিকে হোমরুল বা 'নিজেদের শাসন' এই শব্দটি ছেয়ে গেল। হোমরুল লীগের শাখা দেশের নানা জায়গায় স্থাপিত হবার সময়ে মালাবারেও স্থাপিত হলো। আমি এই শাখার সেক্রেটারী নির্বাচিত হলাম। এর আগে আমি কংগ্রেস সেক্রেটারীও নির্বাচিত হ'য়েছিলাম। সংগঠিত ভাবে কংগ্রেসের কাজ এই সময়েই মালাবারে আরম্ভ হয়।

আমি কালিকটে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করার কিছু আগে কে. মাধবন নায়ারও প্র্যাকটিশ করার জন্য মাঞ্চেরী থেকে কালিকটে এসেছিলেন। তিনি একজন ভালো উকীল ছিলেন। মালয়ালমে খুব ভালো বক্তৃতাও দিতে পারতেন, কবিতাও লিখতে পারতেন। জনসাধারণের কাজে তার প্রচুর উৎসাহ আর আগ্রহ ছিল। বিকেলবেলা আমরা দুজনে প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতে যেতাম। জনগণের কাজও আমরা দুজনে একসঙ্গে করেছি। আমাদের আর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি হচ্ছেন অচ্যুতন উকীল। তখনকার 'মিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণন উকীলের মতে—"হোমরুল আন্দোলন উঁচু জাতের আন্দোলন, নীচু জাতের লোকেরা এই আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের কিছুই লাভ হবে না—"একথায় অচ্যুতন উকীল বিশ্বাস করতেন না। তিনি আমাদের সহপ্রবর্তক হিসাবে হোমরুল আন্দোলনকে সাহায্য করে গেছেন। সেই যে জনগণের সেবায় তিনি নেমে ছিলেন, তার থেকে একদিনের জন্যও তিনি বিরত হন নি। সুপ্রসিদ্ধ মাঞ্চেরী রামায়্যার মালাবারের হোমরুল শাখার যেন জীবন ছিলেন। হাস্যরসিক রামায়্যারের বক্তৃতা, তাঁর ভয়ডরহীন কাজকর্ম, মধুর ব্যবহার মালাবারের হোমরুল আন্দোলনের শক্তি খুবই বাড়িয়ে দিয়েছিল। রামায়্যার ছিলেন অ্যানি বেসান্তের শিষ্য এবং আরাধক। অ্যানি বেসান্তের জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে না হলেও অন্যভাবে প্রসিদ্ধ কয়েকজন লোকের কথা এখানে বলছি। ডেপুটি কালেকটর ভার্গীস মালাবারের সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইংরাজী আর মালয়ালমে অতি সুন্দর বক্তৃতা করতে পারতেন। সৎ এবং ধর্মপ্রাণ ভার্গীস তাঁর উপরঅলাদের এবং জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। ব্রিটিশ

বিরোধী কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। তখনকার অবস্থায় তাঁর এই মনোভাব বোঝা কঠিন নয়। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কত লোক যে তাঁর উপদেশ আর সাহায্য নেবার জন্য তাঁর কাছে আসত! আমার বাবার বন্ধু ছিলেন ভার্গীস। কালিকটে প্র্যাকটিশ করার সময় তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা করেছি। আমার রাজনৈতিক মতামতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু জীবনে আমার সাফল্য লাভের জন্য তিনি আন্তরিক কামনা করেছেন। সাদা লম্বা কোর্ট, সেই রঙের প্যাণ্ট, বড় পাগড়ী, আর সকলকে মোহিত করা মিষ্টি হাসি নিয়ে ভার্গীস যখন অফিসে আসতেন তখন তাঁকে একবার দেখে কেউ ভুলতে পারত না।

নেটুঙ্গাডী ব্যাঙ্কের স্থাপক আপ্পু নেটুঙ্গাডী সে সময় কালিকটের উকীলদের মধ্যে একজন নাম করা উকীল ছিলেন। কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর ব্যাঙ্ক সংগঠনের কাজে তিনি তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করেন। সাদা চামড়ার লোকেদের ওপর নেটুঙ্গাডীর অদ্ভুত শ্রদ্ধা ছিল। কংগ্রেস বা অন্য কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁর ভালোবাসা ছিল না। ভারতবাসীরা নিজেদের শাসন নিজেরা করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তবে তাঁর কার্যক্ষমতা, ব্যবসায়িক তৎপরতা, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদির জন্য তিনি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। মালয়ালম ভাষায় প্রথম উপন্যাসের লেখক বলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

'মিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক সি. কৃষ্ণনের নামও এখানে করা উচিত। উকীল হলেও ওকালতিতে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন নি। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সমস্ত সময় নিয়োগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের অবস্থা পরিবর্তনের আগে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় তা হ'লে সেই স্বাধীনতা উঁচু জাতের লোকদের স্বাধীনতা হবে। নীচু জাতের লোকদের এতে কিছুই লাভ হবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার মত বিরোধ থাকলেও জাতের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে আমাদের মত বিরোধ ছিল না। কালিকটের তালীর (জায়গার নাম) নীচু জাতের লোকদের যাওয়া নিষিদ্ধ করে একটা বোর্ড টাঙানো ছিল। এই রকম একটা কুপ্রথাকে উঠিয়ে দিতে হবে বলে আমরা ঠিক করলাম। একদিন রামায়্যার, মাধবন নায়ার, সি. কৃষ্ণন আর আমি ঐ রাস্তা দিয়ে গেলাম। আমাদের যাবার সময় কেউ বাধা দেবে না এটা আমরা জানতাম। কৃষ্ণনকে কেউ যদি বাধা দেয় সেই ভেবে আমরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেদিন খারাপ কিছু ঘটলো না। কিন্তু এমনি ভাবে নিয়ম ভাঙ্গার ব্যাপার কৃষ্ণনের ভালো লাগে নি।

সাদা প্যাণ্ট, কালো কোর্ট, পাগড়ী আর কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে কৃষ্ণন

কালিকট বার এ্যাসোসিয়েশনের ঘরে এলেই তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্যার কথা না বলে থাকতে পারতেন না। তিনি বলতেন, জাতির অস্পৃশ্যতা দূর না হলে স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয়। এই নিয়ে তীব্র বাদপ্রতিবাদ হ'লেও কৃষ্ণন কখনো রেগে যেতেন না। তাঁর মুখে সব সময় একটা মৃদু হাসি লেগেই থাকতো। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে তাঁর মতামত কি হ'ত তা ভাবতেও মজা লাগে।

1916 সালের এপ্রিল মাসে পালঘাটে প্রথম মালাবার জেলা হোমরুল সংগঠনের কনফারেন্স আহূত হয়। অ্যানি বেসান্ত এর সভানেত্রী ছিলেন। এই সভায় হোমরুলের প্রস্তাব এনে আমি বক্তৃতা দিই। এরকমভাবে সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিলে আমি সরকারের কোপ নজরে পড়বো, আর তাতে আমার কাজকর্মের অসুবিধে হবে বলে অনেকে আমাকে অনেক রকম উপদেশ দিয়েছিলেন।

পরের কনফারেন্স 1917 সালে কালিকটে আহূত হ'লে তার কয়েকজন সেক্রেটারীর একজন ছিলাম আমি। রামন মেনন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। তিনি কালিকটের একজন নামকরা উকীল। জনজীবনে খুব সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও আমাদের কাজে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কনফারেন্সের জন্য ময়দানে প্যাণ্ডেল বাঁধার অনুমতি তখনকার কালেক্টর না দেওয়াতে রামন মেননের বাড়ীতে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে সেখানে কনফারেন্স করা হল। স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়্যার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। অ্যানি বেসান্তও বিশেষ রূপে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন।

এমনিভাবে কনফারেন্স সংগঠন করা, জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদিতে আমার অনেক সময় গিয়েছিল। প্র্যাক্‌টিশ না করে এই সব সরকার-বিরোধী কাজকর্মে সময় নষ্ট করতে দেখে আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু রাজনীতি আমাকে এমনভাবে আকর্ষণ করতো যে আমি তা না করে পারতাম না।

মান্দত কৃষ্ণন নায়ার রাজনীতিতে আমার এই উৎসাহের কথা জানতে পেরে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি তখন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ছিলেন। "প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করার সময়ই ওপরে ওঠার ভিত্তি খুব নিপুণ ভাবে তৈরী করতে হয়। কেসগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া, সেগুলির আইনকানুন ঠিকমতো জানা, মক্কেলদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করা, জজের বিরক্তি উৎপাদন না করে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য করা—এসব যদি প্র্যাক্‌টিশ আরম্ভ করার সময় শেখো তাহলে তোমার কাজে তুমি উন্নতি করতে পারবে। রাজনীতি করার সুযোগ পরে অনেক পাবে। তখন

তাতে মন দিলেই চলবে। যদি তা না করো, তাহ'লে প্র্যাক্টিশ জমবে না।" এই ছিল তাঁর চিঠির সারাংশ। বলা বাহুল্য, চিঠিটি পেয়ে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করেছিলাম।

কাজে উন্নতি করার আকাঙ্খা আর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবার আগ্রহ—এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলা সম্ভব কিনা সেই সমস্যা তখন আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলেছিল।

ছয়

হোমরুল আন্দোলন

ওকালতী আরম্ভ করার সময়েই সংসারের নানা ভার আমার ঘাড়ে পড়েছিল। আমার পড়াশুনো শেষ হবার আগেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। সেই জন্য ইংল্যাণ্ডে পড়া শেষ করার জন্য বেশ কিছু টাকা ধার করতে হয়েছিল। সেই টাকা শোধ করার দায়িত্ব ছিল আমার। সংসারের খরচ জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। তার ওপর এই দায়িত্ব। আমি যে কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। রাজনীতি না ক'রে একমনে প্র্যাকটিশ করার জন্যে অনেকে আমাকে উপদেশ দিলেন। বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে সরকার-বিরোধী কোনো কাজ করতে দিতেন না। বাবা মারা যাওয়ায় আমার দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে গেছে। আগে সেই দায়িত্ব পালন, তারপর অন্য কাজ—এই সব উপদেশ। আমার দায়িত্বের কথা আমি ভুলিনি। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য আমার যথাসাধ্য চেষ্টাও আমি করছিলাম। তার জন্যে রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্র্যাকটিশের ক্ষতি না ক'রেও জনসাধারণের উন্নতির কাজে ভাগ নেওয়া যায় এ বিশ্বাস আমার ছিল। এই কাজের জন্য আমার কিছু সময় আমি দেব বলে ঠিক করলাম।

তখন আমার দৈনন্দিন জীবন এই রকম ছিল—ভোর পাঁচটায় উঠে আইনের বইগুলি পড়ি। পরে স্নান করে মনে উৎসাহ আর প্রেরণা জাগায় এমন কতকগুলি বই পড়ি। তারপর কেসগুলি পড়ি। মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করে কেসগুলো নিয়ে আলোচনা করি। কেস থাক বা না থাক, রোজ কোর্টে যাই। কোর্ট থেকে ফিরে এসে কাগজ পড়ে পাঁচটার সময় বেড়াতে বেরোই। যদি কোনো মিটিং থাকে তাতে যোগ দিই। রাতের আহারের পর দু'ঘণ্টা বই পড়ি—সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, জীবনী ইত্যাদি। তাস খেলা, ক্লাবে গিয়ে হৈ হৈ করা আমি পছন্দ করতাম না।

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব প্রত্যেক রবিবার এক জায়গায় মেলবার একটা ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে আমরা নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। অল্পবয়সী উকীলেরাই এই চর্চায় বেশী সংখ্যায় যোগ দিত। এক এক জনের বাড়ীতে এক এক সপ্তাহে এই সভা বসতো। চা পানের পর আলোচনা শুরু হ'ত। দু'ঘণ্টা ধরে চর্চা চলতো। এই আলোচনার ফলে উপস্থিত লোকদের জনসাধারণের ব্যাপারে একটা

আগ্রহ জেগে উঠেছিল। কংগ্রেস বা হোমরুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু এই আলোচনার ফলে তাঁরা কংগ্রেস আর হোমরুলের কাজকর্ম সম্বন্ধে উৎসাহী হ'য়ে উঠেছিল।

1916 সালে লখনৌতে আমি প্রথম একটি কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দিই। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। এই আমি প্রথম মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে দেখলাম। তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ চলছিল বলে কংগ্রেসীদের সন্তুষ্ট করার জন্য গভর্ণর স্যার জেম্‌স্ মেস্টন কংগ্রেসের এই সভায় এসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, এই সভায় স্যার মেস্টন বলেছিলেন যে, যে বছর কংগ্রেস আরম্ভ হয় সেই বছরই তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন, তাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা। কংগ্রেসীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন।

অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলনের শক্তি দিনের পর দিন বাড়ছিল। হোমরুলের ক্রিয়াকলাপ যুদ্ধ বিরোধী বলে অ্যানি বেসান্ত, তাঁর সহপ্রবর্ত্তক আরুণ্ডেয়ৌন, ওয়াদিয়া প্রভৃতিদের গভর্ণমেণ্ট বন্দী করে জেলে পুরলেন। এঁদের বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্তির জন্য দেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হলো। কালিকটেও এই নিয়ে শোভাযাত্রা বার করা, সভা ইত্যাদি করা হ'ল। কংগ্রেস আর হোমরুল কমিটির সেক্রেটারী আমি ছিলাম বলে আমি সরকারের কুনজরে পড়লাম। আমার সহপ্রবর্ত্তক-দের ওপরও সরকারের সন্দেহ জন্মালো। এতে আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা আমার বাড়ীতে আসা একরকম প্রায় ছেড়েই দিলেন। তাঁরা আমাকে বিপথগামী তরুণ বলে মনে করতেন। এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁদের বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হ'ল।

মাদ্রাজের গভর্ণর কালিকট সন্দর্শনে আসা ঠিক করলে পর যুদ্ধের সাহায্যের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি টাকার তোড়া দেওয়া হবে বলে কিছু লোক ঠিক করলেন। এই উপলক্ষ্যে কালিকটের টাউন হলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সি. ভি. নারায়ন মেননের নেতৃত্বে একটা মিটিং ডাকা হয়। আমি নারায়ন মেননকে আগেই জানিয়েছিলাম যে জনসাধারণের নামে কোনো টাকার তোড়া দেওয়ার প্রস্তাব যদি এই মিটিঙে করা হয় আমি তাহ'লে তার বিরোধিতা করবো। এই খবর শোনা মাত্র বিরাট একটা জনতা টাউন হলে এসে উপস্থিত হ'ল। কালেক্টর ইভান্স এই মিটিঙে সভাপতিত্ব করেছিলেন। জেলা জজ জ্যাকসন, পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট প্রভৃতি বড় বড় অফিসাররা ছাড়াও দেওয়ান বাহাদুর এবং অন্যান্য আরো অনেক

মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। এঁরা সব ডায়াসে বসেছিলেন। গোলমাল হতে পারে বলে বেশ কিছু সৈন্য টাউন হলের চারিদিকে পাহারা দিচ্ছিল।

কালেক্টর সভার উদ্দেশ্যে একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে প্রথম প্রস্তাব আনার জন্য মুপ্পিল নায়ারকে ডাকলেন। মাদ্রাজের গভর্নর কালিকট সন্দর্শনে এলে তাঁকে জনগণের পক্ষ থেকে একটা টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হবে এই ছিল প্রস্তাব। প্রস্তাবটিকে সমর্থন করলেন দেওয়ান বাহাদুর। এরপর আমি উঠে প্রস্তাবের উপর দুটি কথা বলার জন্য কালেক্টরের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলে বিপুল হর্ষধ্বনির সঙ্গে আমি আমার বক্তৃতা মালয়ালমে আরম্ভ করলাম। কিন্তু আমি মালয়ালমে আরম্ভ করতেই সভাপতির রাগ হয়ে গেল। তিনি বললেন যে তিনি আমায় মালয়ালমে বলার অনুমতি দিতে পারেন না। "এখানে যারা এসে জড়ো হয়েছে তারা মালয়ালম ভাষায় কথা বলে। এখানে বেশীর ভাগ লোকেই ইংরাজী জানে না। তাদের নামে পাশ করা প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কি তা তাদের জানার অধিকার আছে। আমি তাই মালয়ালমেই বলবো"—একথা আমি বলার পর লোকেরা আর একবার হর্ষধ্বনি করে উঠলো। তারা সব চীৎকার করতে লাগলো "মালয়ালমে বলুন, মালয়ালমে বলুন।" কিন্তু সভাপতি জেদ ধরলেন তিনি কিছুতেই আমাকে মালয়ালমে বলতে দেবেন না। "যদি তাই হয়, তাহলে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মালয়ালীরা এই সভায় অংশ গ্রহণ করবে না" বলে আমি হল থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার পেছন পেছন হলের সব লোকই প্রায় বেরিয়ে এল। এই ঘটনায় শহরে খুবই হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। আমাকে অ্যারেস্ট করা হবে এখবরও বেশ ক'দিন শোনা গিয়েছিল।

সাদা চামড়ার অফিসারদের আমার ওপর খুব রাগ, এ কথা অনেকে বিশ্বাস করতো। তাই তাদের এজলাসে কোনো মামলা এলে তাতে উকীল হিসেবে আমার ডাক খুব কমই পড়তো। কিন্তু তাহলেও বিশেষ বিশেষ কোনো কারণে আমাকে কয়েকবার তাদের সামনে উপস্থিত হতে হয়েছে। এই রকম একটা মামলা কালিকটের সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হলের আদালতে এল।

মুসলমানদের আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মামলা খুব আগ্রহ জাগিয়েছিল। বিবাদী পক্ষের হয়ে হাজির হয়েছিলেন দু'জন নামকরা উকীল। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ঠিকমত আর একবার পরীক্ষার অনুমতি ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের দেয় নি। এইজন্য দু'দিন কেস চলবার পর আমার কাছে এলেন। তাঁদের হয়ে কোর্টে হাজির হলাম। কোর্টের বাইরে ভেতরে বহু লোকের ভীড়। বেলা ১১টায় মামলা শুরু হলো। আমি কোর্টের কাছে প্রার্থনা জানালাম যে আগের দিন যে সব সাক্ষীদের জেরা করা হ'য়েছে তাদের

কিছু প্রশ্ন করতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক। ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে অনুমতি দেওয়া হবে না। "কতকগুলো আরবী শব্দের অর্থ আমি সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করতে চাই।" ম্যাজিস্ট্রেট তার উত্তরে বললেন যে, সাক্ষীরা আরবী জানে না। তখন আমি জেদ ধরলাম—"তাহলে সাক্ষী নিজে সে কথা বলুক। আপনি বললে হবে না!" ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আরো রেগে গিয়ে বললেন—"আমি সম্মতি দিতে পারি না। কথনোই দেব না।" "তাহ'লে আমি এই প্রশ্ন করেছি এবং কোর্ট থেকে আমাকে এ প্রশ্ন করার অনুমতি দেয়নি একথা লিখে রাখতে হবে" আমি বললাম। ম্যাজিস্ট্রেট এতেও সম্মত হ'লেন না। আমি তখন আমার প্রশ্নটা লিখে ম্যাজিস্ট্রেটকে একটা পিটিশন দিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সেটা পড়ে বললেন—'কোর্ট যে সব প্রশ্ন করতে অনুমতি আপনাকে দেয়নি সেই সব প্রশ্ন করে আপনি পিটিশান দেবেন বলে ভাবছেন নাকি?'

—হ্যাঁ, সেই ভাবেই আমি তৈরী হ'য়ে এসেছি।

তখন আমার পিটিশান নিয়ে সাক্ষীকে জেরা করার অনুমতি তিনি আমায় দিলেন।

এতে অনেক সময় গেল। কোর্টে উপস্থিত লোকেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার আর ম্যাজিস্ট্রেটের তর্কাতর্কি শুনছিল। কোর্ট শেষ হবার পর বাইরে এসে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হল আমার পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন,

—আমি আপনার মক্কেলকে শাস্তি দেব তবু কেন আপনি এত গণ্ডগোল করলেন?

—আমি তা জানি। সেই জন্যেই তো আপীল করার দরকারী প্রমাণ সংগ্রহ করছি।

পরের দিন মামলার বিচার খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। ম্যাজিস্ট্রেট কোন গোলমালের সৃষ্টি করলেন না। দু'পক্ষের বাদপ্রতিবাদ শুনে রায় দেবার দিন আর একদিন ফেললেন।

আমরা যখন জানতে পারলাম যে বিবাদীরা দোষী নয় বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ছেড়ে দিয়েছেন তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। আমার মতো একটা তরুণ উকীলের এটা একটা বিরাট সাফল্য।

সেই কেস জেতার দিনই টাউন হলে কালেক্টরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হয়েছিল।

সাত

সংগঠিত রাজনৈতিক কাজ

সংগঠিত ও সক্রিয়ভাবে ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য কাজ আরম্ভ করেছিলেন অ্যানি বেসান্ত। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মত হোমরুল আন্দোলন অতটা ছড়িয়ে পড়েনি বা শক্তিলাভ করেনি এটা ঠিক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা শুধু বক্তৃতা দিয়ে মিলবে না, তার জন্য সংগঠিত কাজকর্মেরও দরকার, একথা বেশ ভালো ভাবেই জেনে উৎসাহের সঙ্গে অ্যানি বেসান্ত তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত এতদিন ধর্ম, সমাজ, দর্শন, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করছিলেন। এখন যখন তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন জাগরণ, নতুন উন্মেষের সৃষ্টি হল, যে কোন কাজেই হাত দিন না কেন, তা সুষ্ঠু ভাবে করার ক্ষমতা অ্যানি বেসান্তের ছিল। এই মহীয়সী নারীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব, কঠিন পরিশ্রম করার শক্তি, অতুলনীয় বাগ্মিতা, তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের কাছে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

মালাবারের হোমরুল লীগের সেক্রেটারী হিসেবে আমার অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। কাছে আসার সুযোগও হয়েছে। কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমি সফরেও গিয়েছি।

কোনো জনসভায় বক্তৃতা করতে হ'লে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছোবেন। কোনোরকম ভূমিকা না করে বক্তৃতা করবেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করবেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করে যেতে পারতেন। এক মুহূর্ত্ত সময় তিনি নষ্ট করতেন না। মোটরে বা ট্রেনে যাত্রার সময়ও তিনি কোনো না কোনো কাজ করতেন।

মাদ্রাজ থেকে দিল্লী অবধি একবার আমি মিসেস বেসান্তের সঙ্গে সফর করেছিলাম। অ্যানি বেসান্ত সবসময় রিজার্ভ করা কামরায় সফর করতেন। সফরের সময় কি কি কাজ করতে হবে তা তিনি আগে থাকতেই ঠিক করে রাখতেন। ট্রেনে বসে সেই কাজগুলো করতেন। ভোর চারটের সময় তিনি উঠতেন। স্নান আর প্রার্থনা সেরে সেই দিনকার কাজ আরম্ভ করতেন। যতক্ষণ না কাজ শেষ হতো ততক্ষণ তিনি কাজ করে চলতেন। যাঁদের অ্যানি বেসান্তের মত বা বিশ্বাসের সঙ্গে মিল ছিল না তাঁরা

পর্যন্ত স্বীকার করতেন যে তিনি অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তাঁর কর্মপদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠা আর তৎপরতা দেখে শেখা উচিত। হোমরুল আন্দোলনের সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করবার যে সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে তার মূল্য অসামান্য। এজন্য নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি।

1917 সালের শেষে ভারতের শাসন সংস্কারের ব্যাপারে ভারতবাসীদের অভিমত-জানতে তখনকার ভারত সেক্রেটারী মণ্টেগু ভারতে এলে হোমরুল লীগের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে তাঁকে এক স্মারকলিপি দেন। আমিও এই প্রতিনিধিদের দলে ছিলাম। লোকমান্য তিলকও মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা করেন।

রাজদ্রোহের অপরাধে তিলককে ছয় বছর জেলে বন্দী ক'রে রাখা হয়। 1914 সালে ছাড়া পেয়ে তিনি আবার রাজনীতিতে যোগ দেন।

স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনিও এক হোমরুল লীগের সূত্রপাত করেন। ধুতি পরে, কোর্ট পরে, মহারাষ্ট্রীয় রীতিতে মাথায় পাগড়ী বেঁধে, গলায় একটা চাদর জড়িয়ে, হাতে লাঠি নেওয়া তিলককে তখন দেশের লোক পূজো করতো বললেই হয়। তিলক আর বেসান্ত এঁরাই ছিলেন তখন ভারতবর্ষের রাজনীতির আকাশে দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মহাত্মা গান্ধী এ সময় দিল্লীতে ছিলেন। গান্ধীজি তখনও রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, খদ্দরের ধুতি, সার্ট আর টুপি পরে। একটা খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে গান্ধীজিও অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে ভাইসরয় আর মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সি. পি. রামস্বামী আয়্যার, রঙ্গস্বামী আয়্যাঙ্গার, রাজাগোপালাচারী, বিজয় রাঘবাচারী, সত্যমুর্ত্তি, নরসিংহ আয়্যার প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় বড় বড় নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার এ সময় হয়। সি. পি. রামস্বামী আয়্যার হোমরুল আন্দোলনের একজন বড় নেতা ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত অভিভাষকও ছিলেন। রাজনীতিতে আর সাহিত্যেও তিনি বেশ নাম করেছিলেন। যে কোনো বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল অদ্ভুত। পরে তাঁর জীবন অন্য রাস্তায় ঘুরে গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দান ভোলার নয়।

একই উদ্দেশ্যে যেসব বন্ধুরা একসময় একসঙ্গে কাজ করেছে কালক্রমে তাদের মতের বিভিন্নতার জন্য তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। আমরা যা করছি তা ঠিক, আর তারা যা করছে তা ভুল বলে দোষ দেবার মত অনেক লোক থাকে। আমরা যখন অপরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য শুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার তা'দেরও আছে এ কথা মনে রাখা উচিত। অনেক বড় বড় লোকও কোনো

রকম দয়াদাক্ষিণ্য না দেখিয়ে এমনভাবে অপরের দোষ দেয়, সমালোচনা করে যে তা দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়।

সেলমবাসী নরসিংহ আয়্যার অ্যানি বেসান্তের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। হোমরুল আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুইটি মেয়ের হঠাৎ অপমৃত্যু হয়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি জাগতিক জীবন থেকে সরে গিয়ে তাঁর সমস্ত মনোযোগ আধ্যাত্মিক কাজকর্মে দিলেন। সাইবাবার একজন ভক্ত শিষ্যরূপে তিনি 'নরসিংহ স্বামী' নাম নিলেন। 1957 সালে তিনি মারা যান। সামাজিক জীবনে মনের যে শান্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে বোধহয় তিনি তা লাভ করেন।

এস. সত্যমূর্তি খুব ভালো বক্তা ছিলেন। তামিল আর ইংরিজী দুটোতেই একই ভাবে ঝরঝর করে বক্তৃতা দিতে পারতেন। রাজনৈতিক সভা, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, যেখানেই হোক না কেন, তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় ভালো ক'রে পড়াশুনো করে তারপর বক্তৃতা দিতেন। সত্যমূর্তির অকাল মরণ ভারতের পক্ষে একটা বৃহৎ ক্ষতি।

দিল্লীতে আমি স্যার সি. শঙ্করন নায়ারকেও দেখেছিলাম। তিনি তখন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। কালিকটের টাউন হলে আমার আর কালেক্টরের সংঘর্ষের কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। ঠিক কি হ'য়েছিল তা আমাকে সব বলতে বললেন।—"আপনি ঠিকই করেছেন, আমাদের আত্মসম্ভ্রম কখনোই বিসর্জন দেওয়া উচিত না।" একথা তিনি আমায় বলেছিলেন।

'বিলাতের খবর' বইটি সমাদর লাভ করলে গোখলে আর তিলকের জীবনী লিখতে আমার আগ্রহ হয়। প্র্যাকটিশ করে যা উপার্জন করতাম তাতে খরচ চালানো যেত না, তাই বই থেকে যা টাকা পেতাম তাতে খুব সাহায্য হ'ত। টাকার কথা দূরে থাক, একটা আনা পর্যন্ত নষ্ট করার সঙ্গতি তখন আমার ছিল না।

এই বছরের মার্চ মাসে ত্রিবাঙ্কুরের নাম্পুতিরি যোগক্ষেম সভা আমাকে 'কেরল তিলকম্' মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। কেরলের জনজীবনে আমার কাজের কথা স্মরণ রেখে এই মেডেল আমাকে দেওয়া হয়। এই মেডেল আমার হাত থেকে খোয়া গেছে, কিন্তু এই মেডেল দিয়ে নাম্পুতিরি সমাজ যে আমাকে সম্মানিত করেছেন তা অতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি স্মরণ করছি।

হোমরুল আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যাশিক্ষার জাগরণ হয়। টাকা সংগ্রহ করার

জন্য কালিকটে আমরা একটা কার্নিভ্যাল মতো করেছিলাম। তিন দিন ধরে এই কার্নিভালে বহু লোক এসেছিল। যাদের হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে কোনো সহানুভূতি ছিল না, তারাও এই কার্নিভ্যালকে সফল করে তোলার জন্য অনেক সাহায্য করেছিলো।

1918 সালে তালাশেরীতে মালাবার কনফারেন্সের যে সভা হয় তাতে স্বাগত সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন রাম বর্মা। তিনি একজন রাজা ছিলেন। কালিকটের কালেক্টর এই ব্যাপারে কালিকটের সামুতিরিকে (জামোরিন) তিরস্কার করেছিলেন। রাম বর্মা এসব জেনেও অধ্যক্ষের পদ নিয়েছিলেন। তাঁর এই সাহস আর দেশপ্রেমকে সকলেই তখন খুব প্রশংসা করেছিল।

আন্তর্জাতিক কাজকর্মে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে এবং বড় পদে এখন দেশের সেবা ক'রে আসছেন যে কৃষ্ণ মেনন, তিনি তখন হোমরুল আন্দোলনে খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। তালাশেরি কনফারেন্সে যোগ দিতে আমি শ্রীকৃষ্ণ মেননের পিতা শ্রীকৃষ্ণ কুরুপের বাড়ীতে ছিলাম। কৃষ্ণ কুরুপ তখন একজন বড় অভিভাষক ছিলেন।

সে বছর কোর্ট বন্ধ হলে পর আমি দেওয়ান মান্দগু কৃষ্ণন্ নায়ারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেওয়ানের সরকারী বাড়ী ভক্তিবিলাসে আমি সপ্তাহ খানেক ছিলাম। বড় কাজের অহঙ্কার কৃষ্ণন্ নায়ারকে একটুও স্পর্শ করতে পারে নি। প্রতিদিন কতলোক যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো তা আর বলার নয়, তাদের মিছিমিছি বসিয়ে রাখা বা তাদের সঙ্গে অসৌজন্য ব্যবহার কখনো তিনি করেন নি।

তাঁর কথামতো আমি ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ মূলম্ তিরুনাল মহারাজার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। রাজপ্রাসাদে প'রে যাবার পোষাক আমার ছিল না। কৃষ্ণন্ নায়ারের প্রাইভেট সেক্রেটারী রাঘব পানিক্করের লম্বা কোট আমার গায়ের মাপের ছিল। ধুতি আর জরিপাড় মাথার পাগড়ী কৃষ্ণন্ নায়ারের। এই সব পোষাক প'রে দেওয়ানের ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে আমি যখন রাজপ্রাসাদে যাচ্ছিলাম, তখন রাস্তায় আমাকে দেখে লোকে হয়তো আশ্চর্য হ'য়ে ভেবেছিল এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করা লোকটি কে?

একজন সংবাদবাহক আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। শুধু মাত্র একটা সূক্ষ্ম কাপড় পরা মহারাজা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। রাজকীয় কথাবার্ত্তা যা মুখস্থ করে রেখেছিলাম তা তাঁকে দেখে সব ভুলে গেলাম। প্রায় পনের মিনিট ধরে রাজা আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন। ত্রিবান্দ্রামে আবার এলে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করি একথাও তিনি বললেন। আমিও কথা দিলাম যে,

এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তবে এর পরের বার আমি যখন ত্রিবান্দ্রাম যাই তখন ভৈকম সত্যাগ্রহে অ্যারেস্ট হয়ে মহারাজার জেলের একজন বন্দী হিসাবে যাই।

এমনি ভাবে কালিকটে আমার তিনটি বছর কেটে গেল। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে মাদ্রাজে গিয়ে প্র্যাকটিশ করার পরামর্শ দিলেন। একটা পরিবর্ত্তন যে দরকার, সেটা আমারও মনে হলো। গরমের ছুটির পর কোর্ট খুললে মাদ্রাজ গিয়ে প্র্যাকটিশ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করলাম।

আট

শ্রমিক সংগঠন

কালিকটের চেয়ে মাদ্রাজেই আমার ভালো প্র্যাকটিশ হলো। এর অনেকগুলো কারণ ছিল। আমার বন্ধু মাধবন নায়ার এবং অন্য দু'একজন উকীল কালিকট থেকে মাঝে মাঝে কিছু কেস পাঠাতেন। তখন মাদ্রাজ বারের একজন প্রধান সদস্য ব্যারিস্টার সি. মাধবন নায়ার যেসব ছোট কেসগুলিতে হাজির হ'তে পারতেন না তার কয়েকটা আমাকে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমার রাজনৈতিক মতে সহানুভূতিশীল মাদ্রাজের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও আমাকে দরকার মত সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়াও হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতে আমার খুব ভালো লাগছিল। কেসের জন্য কখনো কখনো মাদ্রাজের বাইরেও যেতে হয়েছে। একজন অল্পবয়সী উকীল হিসেবে আমি যা উপার্জন করতাম তা মন্দ ছিল না। তবু আমার দায়িত্ব এত বেশী ছিল যে এই উপার্জনে তা মিটিয়ে উঠতে পারছিলাম না।

জনগণের কাজে কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার পর তাদের থেকে একেবারে সরে দাঁড়ানো আমার পক্ষে মুশকিল হ'ল। মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করতে এলে পর আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা খুশী হয়ে মাদ্রাজের জনজীবনে ক্রমে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

ব্যারিস্টার ই. এল. আয়্যার আর বি. পি. ওয়াদিয়ার সঙ্গে আমি হোমরুল আন্দোলনের সময় পরিচিত হয়েছিলাম। আয়্যার ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তিনি, রাম আয়্যার আর নরসিংহ আয়্যার হোমরুল লীগের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবী ব্রিটিশ জনগণকে জানাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা দিলেন। কিন্তু তাঁরা জিব্রাল্টারে পৌঁছুলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেখান থেকে তাঁদের আবার ভারতে পাঠিয়ে দিলেন।

ই. এল. আয়্যার ক্রিমিন্যাল কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। তাঁর বাড়ীতে সবসময় শ্রমিক নেতাদের ভীড় জমতো। তাদের সঙ্গে আয়্যার অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করতেন। যে কোন কেসে তাদের পক্ষে হাজির হবার জন্য তারা আয়্যারকে ধরতো, ফী'র ব্যাপারে আয়্যার কিছুই বলতেন না। যা তারা দিত তাই নিতেন। আয়্যারকে আমি স্নেহ করতাম বলে শ্রমিকদের কাজে আমি উৎসাহী হ'য়ে উঠেছিলাম।

লেবার ইউনিয়নগুলির ভালোভাবে সংগঠন করতে হবে বলে ঠিক করলাম। ওয়াদিয়া এই কাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে করছিলেন। তিনি তখন অ্যানি বেসান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজের অফিস ম্যানেজার ছিলেন। ট্রাম মজুর, রিক্সা মজুর, ঝাড়ুদার, মিল মজুর, তেল কোম্পানীর মজুর এমনি সব মজুরদের অনেক ইউনিয়ন তিনি মাদ্রাজে গড়ে তুলেছিলেন। এই সব মজুরদের জন্য একটা কেন্দ্রীয় বোর্ডও গঠন করা হ'ল। এই বোর্ডের কাজকর্ম চালানোর জন্য দরকার মতো নিয়মকানুনেরও প্রবর্ত্তন করা হ'ল। এই ব্যাপারে চক্কারা চেট্টী, শ্রীরামুলু, হরি সর্বোত্তম প্রভৃতিরা এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদেরই চেষ্টায় মাদ্রাজে মজুরদের সংগঠনগুলি খুব তাড়াতাড়ি গড়ে উঠল।

রিক্সা, ঝাড়ুদার আর মেথর মজুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিলাম আমি। ট্রাম কোম্পানীর আর তেল কোম্পানীর মজুরেরা তখন ধর্মঘট করেছিল। তাদের সমর্থনে অন্যান্য ইউনিয়নের মজুররাও ধর্মঘট করতে চাইল। প্রত্যেকদিন প্রায় সন্ধ্যেবেলায় এগমোরে আমার বাড়ীর উঠানে ঝাড়ুদারদের মিটিঙ্ চলতে লাগলো। একটা সাধারণ ধর্মঘট ডাকার পক্ষে মত খুব জোরদার হচ্ছিল। মজুরদের মধ্যে এই অস্থিরতা দেখে এবার সরকারের টনক নড়লো। তারা বুঝতে পারল যে একটা কিছু করা দরকার।

তখন মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন লর্ড উইলিংডন্। পরে তিনি ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন। তিনি শ্রমিকদের সমস্যার একটা সন্তোষজনক পথ বার করার জন্য ইউনিয়ন নেতাদের এক গোল টেবিলের বৈঠক ডাকলেন। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সত্যি করেই এটা একটা গোল টেবিল বৈঠক ছিল। একটা বিরাট গোল টেবিলের চারধারে আমরা বসলাম। ঝাড়ুদারদের ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট একজন ঝাড়ুদার গভর্নরের বাঁ পাশে একটা চেয়ারে বসেছিল। কূট রাজনীতিবিদ লর্ড উইলিংডন মজুরদের অভিযোগ এবং তাদের দরকারের ব্যাপারে খোঁজখবর করবার জন্য একটা কমিটি গঠন করলেন এবং সেই কমিটির সদস্যদের নামও ঘোষণা করলেন। কমিটির একজন সদস্যের ব্যাপারে মজুর নেতাদের আপত্তি ছিল। সে কথা তারা জানালে পর সভা ভেঙে গেল। এরপর যে ধর্মঘট হলো তা বেশ কিছুদিন চলেছিল। এই সময় মজুরদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা গেল তা আমাদের পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছিল।

ধর্মঘটের ফলে যে গণ্ডগোল হয়েছিল তাতে পুলিশ কয়েক জনকে অ্যারেস্ট করে। তাদের বিচার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে উঠল, ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ইউরোপীয়ান। লেবার ইউনিয়নের হয়ে আমি আসামীদের পক্ষে সমর্থন করে কোর্টে হাজির হয়েছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করেছিলেন যে মজুরদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে

আর বাড়তে দেওয়া হবে না। তিনি আসামীদের শাস্তি দিলেন। এতে মজুরদের শক্তি কমার বদলে আরো বেড়ে গেল।

এই সময় আমরা দুটো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলাম। একটা হচ্ছে নিও ফেবিয়ান্ সোস্যাইটি। তার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র বারোজন। জনগণের সমস্ত ব্যাপার ভাল ভাবে খোঁজ খবর ক'রে, তার ওপর পড়াশুনো ক'রে আমরা প্রবন্ধ লিখতাম। প্রত্যেক শুক্রবার সন্ধ্যে ৬টার সময় এক সদস্যের বাড়ী জড়ো হয়ে পূর্ব নির্ধারিত একটা বিষয়ের ওপর আমরা দু'তিন ঘণ্টা ধরে চর্চা আলোচনা করতাম, এর জন্যে প্রত্যেক সদস্যকে খুব ভালোভাবে পড়াশুনো করে তৈরী থাকতে হ'ত। আলোচনা চলার সময় তার 'নোট্স নেওয়া হ'ত। একদিনেই যে এ চর্চা শেষ হ'য়ে যেত তা নয়। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কখনো কখনো হয়তো দু'তিন মাস পর্যন্ত চর্চা চলতো। তারপর আমাদের মিলিত মতামত একটা বইয়ের আকারে বার করতাম। এমনি ভাবে আমরা দুটো বই বার করেছিলাম 'মণ্টেগু চেম্স্ ফোর্ড রিপোর্ট' ও—'মাদ্রাজ রাজ্যে ভোটাধিকারের প্রশ্ন'। এই দুইটি বই বিলেতের ফেবিয়ান্ সোস্যাইটির খুব প্রশংসা পেয়েছিল। চর্চার শেষে সদস্যেরা সকলে একসঙ্গে বসে আহার করতেন। কোনো প্রকার জাতিভেদ প্রথা আমরা মানবো না এই-ই ছিল আমাদের দৃঢ় নিয়ম। আমি যতদিন মাদ্রাজে ছিলাম ততদিন এই সোস্যাইটির কাজ চলেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করার জন্য গোপন ভাবে আর একটি সংগঠন আমরা গড়েছিলাম। এর সদস্যেরা দু' সপ্তাহ অন্তর যেখানে হোক এক সভায় মিলিত হতো। কি ভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা হ'ত। এর সদস্য ছিলেন মাত্র আট দশজন। এই প্রতিষ্ঠানটির আয়ু বেশীদিন টেঁকেনি।

আমি মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করার সময় একদিন ব্যারিষ্টার ডক্টর স্বামীনাথন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর আগমনে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তিনি মাদ্রাজ বারের একজন বড় ক্রিমিন্যাল অভিভাষক ছিলেন। কোর্ট আর বাড়ী ছাড়া ডক্টর স্বামীনাথন আর কোথাও যেতেন না। কেস আর মক্কেল এই ছিল তাঁর 'জীবনের সব। সেই ডক্টর স্বামীনাথনকে আমার বাড়ী আসতে দেখে আমি একটু ঘাবড়েও গেলাম। ডক্টর স্বামীনাথন আমার মনোভাব অনুমান করতে পেরে বললেন,

—আপনি হয়তো আমাকে এখানে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেছেন। একটা কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস বাচ্চাদের কেসের ব্যাপারটা তো আপনার জানা আছে। এই কেসের বিচার যদি এখানে হয় তাহ'লে আসামীদের সাজা হবে। তাই কেসটা আমি এই হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে সরানোর

ব্যবস্থা করছি। তার জন্যে পিটিশানও তৈরী করেছি। এর একটা অ্যাফিডাবিট চাই। সেটা এই হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করা একজন উকীলের হ'লে ভালো হয়। তার জন্যে কয়েকজন বড় বড় উকীলের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা অ্যাফিডাবিট দিতে খুব ইচ্ছুক নন। আপনি একটা অ্যাফিডাবিট দেবেন কিনা তা জানতে আমি আপনার কাছে এসেছি।

এই কেসটা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধনী জমিদার বালকদের পড়াবার জন্যে মাদ্রাজ কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের অধীনে 'জিউইংটন' বলে একটা জায়গা ছিল। একজন ইউরোপীয়ান এই জায়গাটার দেখাশুনো করতো আর বাচ্চাদের পড়াতো। একদিন কে যেন এই লোকটিকে গুলি করে হত্যা করে। এতে এই বালকদের মধ্যে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তু'জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। এই কেসের বিচার করবে মাদ্রাজ হাইকোর্ট, আর জুরীরা সকলে হবে মাদ্রাজ শহরের লোক। শহরের সর্বত্র এই কেস নিয়ে ভীষণ হৈ হৈ চলছিল। এই অবস্থায় জুরীদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত বিচার পাওয়া যাবে না বলে ডক্টর স্বামীনাথনের মনে হয়েছিল। ডক্টর স্বামীনাথন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে হাজির হ'য়েছিলেন। কেসটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে বম্বে বা অন্য কোনো হাইকোর্টে বিচারের জন্য গভর্নর জেনারেলকে তিনি একটা পিটিশান দেবেন ঠিক করেন। এর জন্য দরকার ছিল অ্যাফিডাবিটের। আর সেইজন্য তিনি আমার কাছে আসেন। আমি অ্যাফিডাবিট দিয়েও ছিলাম। গভর্নর জেনারেল আরজি অনুমোদন করেন। কেস বম্বে হাইকোর্টে সরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর আর একদিন ডক্টর স্বামীনাথন আমার বাড়ীতে আসেন।

—"অ্যাফিডাবিট দেবার জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি; আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম তাহ'লে ঐ রকম একটা অ্যাফিডাবিটে আমার সই দিতাম না। সই দেবার আগে আমি ভাবতাম—আমি একজন তরুণ ব্যারিস্টার। এই অ্যাফিডাবিট দিলে ভালোর চেয়ে আমার খারাপই হবে। ইংরেজ জজ এবং অন্যদেরও এটা ভালো লাগবে না। কেন মিছা-মিছি আমি তাদের বিরাগের পাত্র হবো।"

তারপর হঠাৎ উঠে ডক্টর স্বামীনাথন বল্লেন—"আপনার ভালো হবে"—বলে আমার কাঁধের ওপর তাঁর হাতটা একবার রেখে ধীরপদে বেরিয়ে গেলেন।

এই কেসে আসামীরা নির্দোষ বলে বম্বে হাইকোর্ট রায় দেয় এবং ছেলে তুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার পর একদিন ঐ জমিদার ছেলে দুটিকে নিয়ে ডক্টর স্বামীনাথন আমার বাড়ীতে আসেন।

—এই ছেলে দুটি সেই মামলার আসামী ছিল। কেসের বিচার যদি মাদ্রাজ হাইকোর্টে হ'ত তাহলে এদের মৃত্যুদণ্ড হ'তো। আপনার অ্যাফিডাবিটের জন্যই কেসটা এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এদের জীবন রক্ষা করার জন্যে যারা সাহায্য করেছে আপনি তাদের মধ্যে একজন। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে আমি তাদের নিয়ে এসেছি।

ডক্টর স্বামীনাথনের অন্তর থেকে বার হওয়া এই কথাগুলি আমাকে খুবই খুশী করেছিল।

বি. বি. এস. আয়্যার, সুরেন্দ্রনাথ আর্য, এস. দোরাইস্বামী, সব আমার বন্ধু ছিলেন। আয়্যার একটা আদর্শ জীবন যাপন করতে ভালোবাসতেন। তিনি একটা গুরুকুল স্থাপন করে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সেখানে বাস করতেন। 'তিরুক্কুরল' নামে বিশিষ্ট গ্রন্থটি তিনি তামিল থেকে ইংরিজীতে অনুবাদ করেন।

নদীতে স্নান করার সময় তাঁর মেয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনিও মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে তামিল সাহিত্যের খুব বড় একটা ক্ষতি হয়। আর সেই গুরুকুলও বেশীদিন টেঁকেনি।

সুরেন্দ্রনাথ আর্য ব্রাহ্মসমাজ আর শ্রমিক আন্দোলন দুটোর কাজই খুব উৎসাহের সঙ্গে করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি সবসময় প্রগতিশীল দলের দিকে থাকতেন। 1954 সালে তিনি মারা যান।

এস. দোরাইস্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন বড় উকীল ছিলেন। তিনি সবসময় পরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতেন। তাই তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। তাঁর প্র্যাকটিশ খুব ভালো হলেও তাঁর আগ্রহ ছিল আধ্যাত্মিক কাজকর্মে। হাজার হাজার টাকা রোজগারের পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি মনের শান্তি খোজার জন্য পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে যোগ দেন। বেশ কিছুদিন সেখানে তিনি ছিলেন। এরপর আশ্রম থেকে চলে এলেও আধ্যাত্মিক চিন্তায়ই তিনি তাঁর দিন কাটান। কয়েক বছর আগে আমি মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। টাকা পয়সা, নাম যশ কিছুই আর তাঁকে তখন আকর্ষণ করতে পারে নি। 'এ সবের অর্থ কি? এই জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে'—এই প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজছিলেন।

জীবনের যাত্রাপথে আমাদের অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারা আমাদের অজান্তে আমাদের স্বভাব চরিত্র, মতামত অনেক সময় বদলে দেয়। কারোর কারোর

কথা, তাদের কাজকর্ম চিরকাল আমাদের মনে গেঁথে যায়। কতরকমের ভাবনা চিন্তা, দর্শন, আদর্শ তাদের কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ কেউ বলে যে মানুষের সব কাজের পেছনে আছে তার স্বার্থ। এই স্বার্থ ই তাকে প্রেরণা শক্তি জোগায়। বেশীর ভাগ লোকের সম্পর্কে হয়তো এ কথা সত্যি। কিন্তু এর ব্যতিক্রম কিছু মহৎ ব্যক্তিও আছেন। তাঁদের সংখ্যা খুব কম। এঁদেরই আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। খুব সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে একটি লোকের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যে সমাজে সে বাস করে তার ইচ্ছা আকাঙ্খার সঙ্গে মিলিয়ে চলা সম্ভব। যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে বোঝা যাবে যে দু'পক্ষেরই মধ্যে কোথাও কিছু গোলোযোগ আছে। সমাজ ব্যক্তিগত মানুষের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবে, আবার সমাজের কল্যাণের কথা ভেবেই ব্যক্তি তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবে। তার মঙ্গলে সমাজের মঙ্গল, আর সমাজের মঙ্গলে তার মঙ্গল, এ বোধ এখনো মানুষের জাগেনি। দার্শনিকেরা যে আদর্শ জগতের কথা বলেছেন তা সাধারণ লোকের মুঠি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আদর্শকে পাওয়ার, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাই আমাদের জীবনে আনন্দ আর প্রেরণা জোগায়।

নয়

একটা নতুন আলোড়ন

হোমরুল লীগের আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে কতকগুলো শাসনসংস্কার করবেন বলে ঠিক করলেন। তখনকার ভারত-সেক্রেটারী মণ্টেগু এবং বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতবর্ষে এসে খোঁজ খবর করে যে রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন তা 1918 সালের নভেম্বর মাসে বার করা হয়। এই রিপোর্টের বিবরণ পড়ে ভারতবাসীরা দুই ভাগে ভাগ হ'য়ে গেল। রিপোর্ট অনুযায়ী শাসনসংস্কার এতটুকু সন্তোষজনক নয়, এই শাসনসংস্কারকে তারা গ্রহণ করতে পারে না বলে চরমপন্থীরা জানালো। নরমপন্থীরা বল্ল যে এই শাসনসংস্কারের কিছু কিছু গ্রহণযোগ্য, তাদের কিছুকাল পরীক্ষা করে দেখা হোক। তবে চরমপন্থীরাই ছিল সংখ্যায় অধিক। রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পর অনেকদিন ধরে দু'পক্ষের বাদপ্রতিবাদ, ময়দানে আর কাগজে বক্তৃতার ঝড় তুললো। একসঙ্গে কাজ করে আসা অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এখন বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ্ করতে লাগলো।

মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট মনোযোগ সহকারে পড়ে তার ভেতরকার রুজগুলো ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্য আমরা কয়েকজন নিউ ইণ্ডিয়া অফিসে প্রায়ই এসে মিলতাম। অ্যানি বেসান্ত, রামস্বামী আয়্যার, ই. এল. আয়্যার এবং আরো কয়েকজন এই গ্রুপে ছিলেন, আমিও ছিলাম। অ্যানি বেসান্ত, আর সি. পি. রামস্বামীর মতে শাসনসংস্কারগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কিন্তু আমরা কয়েকজন তাঁদের মতে মত দিতে পারলাম না। ক্রমে আমরা তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি একথা বেশ বুঝতে পারছিলাম।

ভারতবর্ষের সর্বত্র যখন এই বিরোধ দেখা দিল তখন মালাবারের কংগ্রেস এর থেকে বাদ পড়ল না। আমি মাদ্রাজে থাকলেও মালাবারের রাজনীতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র হারাইনি। তাই 1921 সালের এপ্রিল মাসে মাঞ্চেরীতে মালাবার মেলা কনফারেন্স ডাকা হ'লে আমার যাওয়া দরকার বলে কে. মাধবন. নায়ার যখন আমাকে জানালেন তখন তার কারণ বুঝতে আমার একটুও দেরী হ'ল না।

'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক কস্তুরী আয়েঙ্গার এই কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন, অ্যানি বেসান্তও এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। একটা অসুবিধাজনক

আবহাওয়ায় কনফারেন্স বসতে চলেছে তা যেদিকেই তাকানো যায়, দেখলে বোঝা যায়। কনফারেন্সের আগের দিন থেকেই দু'দলের লোকই তাদের দিকের লোক জোগাড় করার চেষ্টা করছিল।

খিলাফতের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে মনোভাব অবলম্বন করেছিল তাতে মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে যে শাসনসংস্কার করতে চলেছে তার সঙ্গে তাদের প্রতীক্ষিত সংস্কারের যে কিছু মিল নেই তা জানার পর রাজনৈতিক আবহাওয়া আর একবার ঘোলাটে হ'য়ে উঠলো। মালাবারে সহযোগী আর অসহযোগীদের মধ্যে একটা যুদ্ধ মাঞ্চেরীতে আরম্ভ হলো। প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিল। এত বেশী প্রতিনিধি আর কোনো কনফারেন্সে দেখা যায়নি। 28শে এপ্রিল বেলা 12টার সময় কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হয়। সেদিন সকাল 8টার সময় তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমি আর সি. পি. রামস্বামী আয়্যার বক্তৃতা দিই। শাসনসংস্কারের নানা দিকগুলো জনসাধারণকে বুঝিয়ে, আমরা বক্তৃতা দিই। 29শে এপ্রিল সকালে সভা আরম্ভ হ'লে পর দেখা গেল 1300 প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দিয়েছে। আবহাওয়া ততক্ষণে খুব গরম হয়ে উঠেছে। তর্কাতীত কতকগুলি প্রস্তাব পাশ হবার পর শাসনসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবটি কে. পি. রামন মেনন আনলেন।

—ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনের উপযুক্ত। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে ভারতের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে অবহেলা করা হয়েছে সেইজন্য এই শাসনসংস্কার এতটুকু সন্তোষজনক ও আশাজনক নয়। 'অসন্তোষজনক ও নিরাশাজনক' এই দুটি শব্দ প্রস্তাব থেকে তুলে নেবার জন্যে অ্যানি বেসান্ত একটা প্রস্তাব আনেন। নীলাম্বুরের ছোট রাজাসাহেব এই প্রস্তাব সমর্থন করেন, আর আমি বিপক্ষে বক্তৃতা দিই, বেশীর ভাগ প্রতিনিধিরা তাঁর বিপক্ষে দেখে অ্যানি বেসান্ত এবং তাঁর সহকর্মীরা সভা থেকে বেরিয়ে যান। প্রস্তাব ভোটে ফেলা হলে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়।

অ্যানি বেসান্তের এই ব্যবহার বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু এর জন্যে তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা একটুকু কমে নি। অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষের জন্য অনেক কিছু করে ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁর অক্ষয় স্থান থাকবে। মানুষের মত বদলে যায়। অ্যানি বেসান্তেরও গিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থ সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা সেই বিশাল হৃদয়ের সামনে মাথা নত না করে কি থাকা যায়?

দেশবাসীদের চমকে দিয়ে একটার পর একটা ঘটনা দ্রুতগতিতে ঘটে চলছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা ভারত তার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে

যাচ্ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড আর তার ফলে মিলিটারী শাসন বিদেশী শাসকদের নগ্ন রূপ দেশের লোকের সামনে ধরা পড়লো।

পাঞ্জাবে সৈন্যশাসন প্রবর্তন করার জন্য ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার সি. শঙ্করন্ নায়ার পদত্যাগ করেছেন জেনে দেশবাসী তাঁকে স্বাগত জানালো, কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে মাদ্রাজে ফেরার পথে শঙ্করন্ নায়ারকে পথের মধ্যে যে অভ্যর্থনা জানানো হলো তাতে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তুষ্টি আর ঘৃণাই প্রকাশ পেল।

দেশে যে সব ঘটনা ঘটছিল তাতে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কাজে ভালো করে মন দিতে পারছিলাম না। সংসারের দায়িত্ব আর রাজনীতি এই দোটানায় পড়ে আমার মন খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। স্ত্রী আর সন্তান ছাড়াও আমার মা ভাই বোনদের দায়িত্বও পড়েছিল। আমার দু' ভাই আর চার বোন ছিল, আর ছিল প্রচুর ধার দেনা শোধ করবার দায়িত্ব। যতক্ষণ না আমার দেনা আমি শোধ করতে পারি ততক্ষণ আমার আর অন্য কোন দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় এ চিন্তা আমার মনে অনেকবার উদয় হয়েছে। কিন্তু কি একটা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি আমাকে রাজনীতির দিকে পুনঃপুনঃ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার যদি বেশ কিছু টাকা থাকতো, একথা যে আমি কতবার ভাবলাম। টাকা পয়সা হাতে থাকলে আমার খুশীমতো জীবন আমি বেছে নিতাম। আমি জানি যে আমি না থাকলেও স্বাধীনতার সংগ্রাম খুব জোরের সঙ্গেই এগিয়ে যেতো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমার সাহায্য ছাড়া মিলবে না এরকম ভ্রান্ত ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু দেশের কাজে আমি একটা ভারী তৃপ্তি, ভারী আনন্দ অনুভব করতাম। আমার সেই অনুভবের পথে যে সব বাধা এসে জড়ো হয়েছিল তাদের আমি ঘৃণা করতাম, অভিশাপ দিতাম।

সি. রাজাগোপালাচারী এই সময় মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করছিলেন। হোমরুল আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। মাঝে মাঝে আমাদের দুজনের দেখা হত। তিনি আমাকে খুব সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করতেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা, জনগণের সেবা করার আকাঙ্খা দেখে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, জনগণের কাজে তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করার স্মৃতি এখনো আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেবার প্রেরণা আমি আর একজনের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি হচ্ছেন শ্রীরামলু। শ্রীরামলু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি খুব শিক্ষিত লোক ছিলেন, আর শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ

প্রভাব ছিল। শ্রীরামলু মাদ্রাজের সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। রোজ তিনি আমার বাড়ীতে আসতেন। পরিবারের খোঁজ খবর করতেন।

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছেন, জীবন একটা মৌচাকের মত। মৌমাছিরা নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাকে আনে। ফুলেদের গুণানুসারে মধু মেলে। কোন ফুলের মধুতে মিষ্টি কম, কোনোটায় বা মিষ্টি বেশি, কোন ফুলের গন্ধ থাকে, কোনটায় থাকে না। এমনি ভাবে নানা ফুলের নানা ধরনের মধুর মিশ্রণে আসল মধু আমরা পাই। জীবনও সেইরকম, নানা ধরনের লোক আমাদের জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, জানা, অজানা নানা লোকের দোষ গুণ আমাদের চরিত্রের ওপর, জীবনের ওপর, প্রভাব বিস্তার করে। এগুলি আমাদের চরিত্রকে কখনো উজ্জ্বল, কখনো স্তিমিত করে। আমরা হয়তো এসব কিছু জানতে পারি না, কিন্তু এটাই সত্যি।

দশ

প্র্যাকটিশ ছেড়ে জনসাধারণের কাজে

1920 সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। মহাত্মা গান্ধীর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের ফলে দেশের সর্বত্র একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলোকে পুনর্গঠিত করতে চাইল। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বরাজ, কিন্তু তার পথ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, একথাও কংগ্রেস ঘোষণা করলো। কংগ্রেসের এই ঘোষণার ফলে দেশের বেশ কিছু লোক চাকরী বাকরী ছেড়ে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। অনেক অভিভাষকেরা প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিল। ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলো। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানেরাও অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ ছিল। জাতিভেদের বিলোপ করা কংগ্রেসের লক্ষ্য জেনে সবরকম সম্প্রদায়ের লোকেরা এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হলো। খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের সহানুভূতি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীকে দৃঢ় করতে সাহায্য করলো। দেশের চারিদিকে অদ্ভুত এক উৎসাহ জেগে উঠলো। সারা দেশে একটা দৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠলো। লোকের মধ্যে আত্মত্যাগের একটা স্পৃহা দেখা দিল।

নাগপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জেনে এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এই উৎসাহের জাগরণ দেখে আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মন আমার তখন ভারী অস্থির। আমি যে কি করবো তা ভেবে না পেয়ে খুব চিন্তিত হ'য়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। এই সময় অনেকবার রাজাগোপালাচারী আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

'আজ আপনার জায়গা মালাবারে। কংগ্রেস একটা বিরাট সংগ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছে,—এই কথাগুলি রাজাগোপালাচারী আমাকে এক বার বলেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রেরণা পাবার দরকার আমার অবশ্য ছিল না। কিন্তু আমার ভাবনা ছিল আমার পরিবার নিয়ে। আমি দরিদ্র, আমি যদি আমার পরিবারের কোনো ব্যবস্থা না করে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিই তাহলে সেটা কি আমার পক্ষে হঠকারিতা নয়? আবার এর অন্য দিকটাও আমি ভাবলাম, ধরা যাক যে ভারতবর্ষ একটা স্বাধীন দেশ। ভারত আর

একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধেতে লিপ্ত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত পুরুষদের যুদ্ধেতে নামতে হবে এটা যদি ভারতবর্ষ ঠিক করে তাহ'লে তার থেকে কি আমি সরে দাঁড়াতে পারবো? কংগ্রেস হয়তো আমার ওপর জোর করতে পারে না কিন্তু তার এই আহ্বান কি আমি উপেক্ষা করতে পারি? কংগ্রেসের কাছে আমার কি একটা ঋণ নেই? এমনি ভাবে একটার পর একটা চিন্তা আমার মনকে খুব অস্থির করে তুললো।

মালাবারের রাজনৈতিক অবস্থা তখন বিশেষ ভালো ছিল না। নাগপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে মালাবারে কংগ্রেসের কাজকর্মে একটা নতুন জাগরণ আনলো। খিলাফত আন্দোলন এই জাগরণে আরো শক্তি জুগিয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের কাজ করার জন্য, কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর আর মালাবার নিয়ে একটা কংগ্রেস সংগঠন করা হয়। কে. মাধবন নায়ার এই নতুন কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছিল তা আরো বিপজ্জনক ভাবে বেড়ে যাবে বলে দেশের শাসনকর্তারা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। এই অস্থিরতা বন্ধ করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভাসমিতি সব বন্ধ করে দিলেন। মাদ্রাজের একজন প্রধান মুসলিম নেতা ইয়াকুব হাসান সাহেবের কালিকটের এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলো। সেটা ছিল 1921 সালের 15ই ফেব্রুয়ারী। গোপাল মেনন, মাধবন নায়ার আর ময়দীন কয়া এই সভায় যোগ দেবেন বলে ঠিক করাতে তাঁদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারী হ'ল। নিষেধাজ্ঞা মানবেন না বলে তাঁরা ঠিক করাতে তাঁদের অ্যারেস্ট করার জন্যে জেল ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টকে হুকুম দিলেন। একথা জানতে পেরে একটা বিরাট জনতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের চারিদিকে জড়ো হলো। অফিসের গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো। ব্যারাক থেকে গোরা সৈন্যদের বাইরে আনা হলো। পুলিশ ইয়াকুব হাসান এবং অন্যদের বেলা দুটোর সময় বন্দী করে নিয়ে এলো। এঁদের চারজনকে ছ' মাসের জন্য ভালো ব্যবহারের মুচলেকা দেবার জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তাতে রাজী হলেন না। তাই তাঁদের ছ'মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কান্নুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এই খবর বনে আগুন লাগার মত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দোকান বাজার সব বন্ধ হ'য়ে গেল। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এলো। অনেক উকীল কোর্টে যাওয়া বন্ধ করলেন। সরকারের এই অন্যায় আচরণের নিন্দে করে মালাবারে এবং তার বাইরেও অনেক জায়গায় জনসভা হ'ল।

—'নেতাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। শীঘ্র চলে আসুন'—এই টেলিগ্রাম কালিকট থেকে পেয়ে আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। সেইদিনই কালিকট রওনা হবো বলে ঠিক করলাম। রাজা-গোপালাচারীও আমার সঙ্গে আসবেন বলে বল্লেন, আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তখন মাদ্রাজে ছিল, আমি এক্ষুনি কালিকট রওনা হচ্ছি জানতে পেরে তারা খুব ঘাবড়ে গেল। আমার রাজনৈতিক কাজকর্মে তারা বাধা দিতে চায়নি, কিন্তু আমি এমনভাবে রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপ দিলে তাদের অবস্থা যে কি হবে সে কথা ভেবে তাদের উৎকণ্ঠিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সেই দিনের গাড়ীতেই রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে আমি কালিকট রওনা হলাম।

কালিকটের ঘটনা মালাবারের জনসাধারণকে যে খুবই উত্তেজিত করে তুলেছে তা পথে আসতে আসতে প্রতিটি রেলওয়ে ষ্টেশনে জনগণের ভীড় দেখে বুঝতে পারলাম। কালিকট রেলষ্টেশনে পুলিশ আর একটা বিরাট জনতা আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছিল। আমরা ষ্টেশন থেকে সোজা মাধবন নায়ারের বাড়ীতে গেলাম। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সব খবর জানতে পারলাম।

দু'দিন পরে আমরা কান্নুর জেলে গিয়ে আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁরা খুব খুশীই হলেন, পুলিশ আমাদের খোলাখুলি কথাবার্তায় কোনো বাধা দেয়নি। সে সময় জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা খুব কমই ছিল।

কালিকটে আসার পর আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেললাম। প্র্যাকটিশ বন্ধ করে জনগণের কাজে নামবো বলে ঠিক করলাম। মালাবারের কংগ্রেসের ভার আমি নিলাম। মাধবন নায়ারের বাড়ীতে কংগ্রেসের অফিস খুললাম। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করলাম। এমনি ভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল।

আমি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতির কাজে নেমেছি এ খবর আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা প্রথম জানতে পারে খবরের কাগজ থেকে। আমার আত্মীয়স্বজনেরা এ খবর কেমন ভাবে নেবে এই ভয় তাদের ছিল, আমারও ছিল। কালিকট থেকে যখন আমি পালঘাটে গেলাম, তখন আত্মীয়স্বজনদের মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমার এই ব্যবহারে তাঁরা কতখানি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে এমনি ভাবে রাজনীতিতে নামা তাঁরা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাঁদের এ সম্বন্ধে বলে কিছু লাভ নেই এ আমি জানতাম। আমার বক্তব্য শোনার বা আমার অবস্থা বোঝার ইচ্ছেও তাঁদের নেই। তাঁরা আমাকে সোজাসুজি কিছু না বলে মান্দত কৃষ্ণন নায়ার এবং দু' একজন মাননীয় ব্যক্তিকে আমাকে বুঝিয়ে বলার

জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে কৃষ্ণন নায়ারের ওপর আমার শ্রদ্ধা কতখানি। কৃষ্ণন নায়ার আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু একবার যখন পা বাড়িয়েছি তখন সেই পা আবার পেছনে টেনে নেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।

মাদ্রাজ থেকে আমার পরিবারকে তাড়াতাড়ি কালিকটে নিয়ে আসা ঠিক করলাম। সেখানে আমার কতকগুলো কাজ সারবার ছিল, তাই আমি মাদ্রাজ রওনা হলাম।

রাজাগোপালাচারী আমাকে রাজনৈতিক কাজে নামার অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি কালিকট রওনা হবার আগে তিনি মাদ্রাজে আমার বাড়ীতে দু'একবার এসে আমার অবস্থা সব খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কাজে নামার অবস্থা আমার নেই। তিনি আমাকে একটা চেক দিয়ে বলেছিলেন—এটা রেখে দিন। সে সময় এই চেকটি আমার খুবই কাজে লেগেছিল।

আইনের বই আর কোর্টের কেসগুলো বন্ধুবান্ধবদের হাতে দিয়ে আইন লঙ্ঘন আর দেশের সেবা করতে আমি মাদ্রাজ থেকে কালিকটে ফিরে এলাম।

এগার

অসহযোগ আন্দোলন

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে কংগ্রেসের শাখা স্থাপন করা আর তার সংগঠনের কাজে আমিই প্রথম পরিশ্রম করেছিলাম। এই কাজের খরচের জন্য রাজাগোপালাচারী আমাকে 1000 টাকা দিয়েছিলেন। আমি মাধবন নায়ারের বাড়ীতে আমার পরিবার সহ বাস করতে লাগলাম। কংগ্রেসের অফিস ছিল বাড়ীর একতলায়। আমার কয়েকজন উকীল বন্ধু ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে আমাকে উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করেছিলেন।

কয়েকদল ছাত্রও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেস সংগঠনের কাজে খুবই উৎসাহ দেখায়। খুব একটা সঙ্কটের সময় তারা যে ভাবে কংগ্রেসের কাজ করেছিল তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে করতে চাই। তিনি হচ্ছেন এ. কে. পিল্লা। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কেরলে কংগ্রেসের কাজ করতে তিনি এসেছেন। কিসের প্রেরণা পেয়ে তিনি এসেছেন এসব কথা তিনি খুব সহজভাবে হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন। এমনি ভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পিল্লা আমার খুবই বন্ধু ছিলেন। অনেকদিন তিনি খুব আন্তরিক ভাবে কংগ্রেসের সেবা করেছিলেন। এজন্য তাঁকে অনেক ক্ষতি, অনেক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে।

কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি কইলন থেকে 'স্বরাট' বলে একটা মালয়ালম কাগজ বের করেন। বেশ কিছু দিন পরে পিল্লা কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পার্টিতে যোগ দেন। শেষ দিকে আমাদের দুজনের রাজনৈতিক মতামত ভিন্ন হ'লেও আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের সময় একদিন এক যুবক কংগ্রেস অফিসে আসেন। তিনি বোম্বেতে ল' পড়ছিলেন। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে যোগ দিতে তিনি এসেছেন। এই ছাত্রটিই পরে তাঁর দেশ সেবার জন্য প্রচুর নাম করেছিলেন। তাঁর নাম কে. কেলপ্পন্।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুহম্মদ আবদুর রহমান আলিগড়ে পড়ছিলেন।

পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে তিনিও কালিকটে চলে এলেন। কংগ্রেসের জন্য ও খিলাফত আন্দোলনের জন্য তাঁর কাজ মনে রাখার মত। 'আল্ আমীন' নামে একখানি কাগজের মালিক আর সম্পাদক দুটোই তিনি ছিলেন। তাঁর নাম আর খ্যাতি যখন উচ্চ শিখরে তখন নিষ্ঠুর বিধাতা সেই দেশপ্রেমিককে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু কেরলের রাজনৈতিক কাজকর্মে গুরুতর একটা ক্ষতির সৃষ্টি করে।

কংগ্রেসের প্রচার কাজে কংগ্রেস কমিটির শাখা রাজ্যের সব জায়গায় স্থাপন করার কাজে আমাকে সপ্তাহে দু'তিনবার কালিকটের বাইরে যেতে হতো।

মুসলমানদের কংগ্রেসের আদর্শ বোঝানো, তাদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ানোর জন্যে মেয়েতু মৌলভী যা করেছেন তার কথাও এখানে বলা উচিত। তিনি খুব সহজ ভাষায় কংগ্রেসের আর খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হাজার হাজার মুসলমানদের বলে বুঝিয়েছিলেন। তখন থেকে আজ অবধি মৌলভী সাহেব দেশের সেবা করে আসছেন।

মোহম্মদ মুগালিয়ার আর একজন উৎসাহী কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম থেকেই তিনি কংগ্রেসের প্রচার কাজে নেমেছিলেন। মুগালিয়ার বক্তৃতা করতে উঠলে ঘণ্টা দুই ধরে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে রাখতে পারতেন। তখন মাইক বলে কিছু ছিল না, একথা যেন মনে থাকে।

কংগ্রেসের প্রচার কাজে একবার উত্তর মালাবারে যাবার পর সেখানে ভারী একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা গির্জার কাছে একটা ময়দানে সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মও তৈরী করা হয়েছিল। তার ওপর চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সাজানো। বহুলোক এই সভায় যোগ দিয়েছিল। সভার কাজ শেষ হবার পর প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে নেমে জানতে পারলাম যে একটা গভীর কুয়োর ওপর কাঠের তক্তা বসিয়ে প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছিল। তক্তাগুলো ভেঙে গেলে আমরা সবাই কুয়োর মধ্যে পড়ে যেতাম। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি যখন এ নিয়ে সভার সংগঠকদের বল্লাম, তারা তখন বল্ল—ওঃ কিছু না, তক্তাগুলো খুবই শক্ত। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই।

কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেনিং দেবার জন্য কেরল কংগ্রেস একটা স্কুল খুলেছিল। কেরলের নানা জায়গা থেকে ট্রেনিং নেবার জন্য কর্মীরা এই স্কুলে আসতো। তাদের তিন সপ্তাহের ট্রেনিং দেওয়া হতো। পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, কংগ্রেসের ইতিহাস, কংগ্রেসের কার্যাবলী, স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের জীবনী, এই সব বিষয়ে তাদের পড়ানো হতো। ইউ. গোবিন্দন নায়ার ছিলেন এই স্কুলের ম্যানেজার। মথুরদাস পুরুষোত্তম বলে একজন গুজরাটি চরখা বিভাগের চার্জে ছিলেন। সকাল

বেলা পড়াশুনো করা, দুপুরের পর মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং করা আর সুতোকাটা, এটাই ছিল কংগ্রেসের কাজ। ক্লাশ নেবার জন্য রোজ সকালে আটটার সময় আমি স্কুলে যেতাম। দু'ঘণ্টা ক্লাশ নেবার পর কংগ্রেস অফিসে ফিরতাম। অফিসে এবং স্কুলে গভর্নমেন্ট অফিসের মতো নিয়ম আর শৃঙ্খলা স্থাপন করা হলো। হাকিম আফজল খাঁ আর রাজাগোপালাচারী একদিন কংগ্রেস অফিসে এসে এর কাজকর্ম দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন।

কোচীন রাজ্য কংগ্রেসের প্রচারণার কাজে যখন আমি কোচীন যাই তখন দিন দুইয়ের জন্য আমি বেরুতীরুতীতে ছিলাম। এখানে আমি কেরল রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সংবিধান লিখে তৈরী করি। প্রথম সংবিধানে কংগ্রেস কমিটির কোন সভাপতি ছিলো না। তার বদলে সাতজনকে নিয়ে একটা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। এঁদের নির্দেশমত সেক্রেটারী কাজ করতেন।

1921 সালে ওট্টাপালমে প্রথম কেরল রাজ্য কংগ্রেস কনফারেন্স ডাকার প্রস্তুতি শেষ হয়। তার আগে মালাবার জেলা কনফারেন্স ডাকা হয়। ওট্টাপালম কমিটির সেক্রেটারী সি. রামুন্নী মেনন ওখানকার একজন উকীল ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি দেশের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। যে কাজের ভারই তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, তিনি তা শেষ করবেনই। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কাজ করতে তিনি ভালোবাসতেন। অনেকদিন পরে তিনি যখন 'মাতৃভূমি'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য আর একবার ভালো করে ফুটে উঠেছিল। তাঁর নানা গুণের জন্য তিনি কেরলের জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু দেশের অনেক ক্ষতি করেছে।

ওট্টাপালম কনফারেন্স সফল করার জন্য রামুন্নী মেনন খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমি মাঝে মাঝে কালিকট থেকে ওট্টাপালমে যেতাম। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর এই প্রথম কনফারেন্স বলে কেরলের নানা জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিয়েছিল। এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেছিলেন টি. প্রকাশম্। রাজনৈতিক কনফারেন্সের সঙ্গে খিলাফত্ কনফারেন্স আর ছাত্র কনফারেন্সও আহ্বান করা হয়।

ঘুমন্ত ওট্টাপালমে এই কনফারেন্স অদ্ভুত এক জাগরণ এনে দিয়েছিল। দু'দিন ধরে সারা ওট্টাপালম বক্তৃতা আর শ্লোগানে মুখরিত হ'য়ে ওঠে। এই সময় একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, যাতে লোকেদের উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর যেমন ক'রে হোক এই আন্দোলনকে চেপে

মেরে ফেলতে হবে এই ছিল শাসনকর্তাদের মনোভাব। হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছে এটা দেখা তাদের অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ তাই আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কি কি উপায় অবলম্বন করবে। রামুন্নী মেননকে কেমন ভাবে শিক্ষা দেবে তার সুযোগের অপেক্ষা করছিল তারা। কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে দুপুরের পর গোলমাল শুরু হলো। রামুন্নী মেনন আর ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন মাধব মেননকে পুলিশ লাঠির ঘায়ে আহত করেছে এ খবর পাওয়া গেল। রক্তাক্ত অবস্থায় রামুন্নী মেননকে একজন মুসলমান প্যাণ্ডেলে ব'য়ে নিয়ে আসার পর জনতা ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু তাদের সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম এই কথা মনে করে তারা পুলিশকে কিছু না বলে নিরস্ত হয়ে রইল।

অনেক লোকে বড় গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ওট্টাপালম ছেড়ে চলে গেল। সমস্ত ঘটনা অন্বেষণ করে একটা রিপোর্ট তৈরী করার ভার কনফারেন্স একটা কমিটিকে দিল। এই কমিটির আমিও একজন মেম্বার ছিলাম। আহতদের সঙ্গে দেখা করে প্রমাণ সংগ্রহ করে আমি কালিকটে ফিরে গেলাম। একমাসের মধ্যে রিপোর্ট বার করা হলো। এই রিপোর্টে আমরা বলেছিলাম যে শান্ত জনগণের ওপর পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠি চার্জ করেছে এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট হিচ্‌কক্‌।

এই রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর তার মানহানি করা হ'য়েছে বলে হিচ্‌কক্‌ আমাদের নামে মানহানির কেস করলেন। তখন আদালত বহিষ্করণ আন্দোলন চলছিল বলে আমরা আমাদের কেসের সওয়াল করতে যাইনি।

'ভারতবর্ষে ন্যায়ের নামে যে প্রহসন চলছে তাতে আমার বিশ্বাস নেই তাই এই কেসের সওয়াল করবো না' বলে আমি কোর্টকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। এই কেসে উঁচু আর নীচু দুই আদালতই হিচ্‌ককের অনুকূলে রায় দিয়েছিল। কিন্তু জনগণ আমাদের এই রিপোর্টকে সমর্থন করেছিল।

হিচ্‌কক্‌ একজন যোগ্য পুলিশ অফিসার ছিলেন। এরনাডে গণ্ডগোলের সময় দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পর তখনকার পুলিশ অফিসারদের চেষ্টায় তাঁর নামে একটা স্মৃতিফলক তৈরী করা হয়। এই নিয়ে পরে খুব গণ্ডগোল হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এইরকম ফলক রাখা দেশের পক্ষে অপমানজনক বলে সেটা সরিয়ে ফেলা হয়।

বৃটিশদের সময়ের ছবি, ষ্ট্যাচু, জায়গার নাম ইত্যাদি বদলে দেবার একটা আন্দোলন আমাদের দেশে সম্প্রতি হচ্ছে। ইতিহাসকে বদলে দেবার সাধ্য আমাদের নেই, তার

দরকারও নেই। বিদেশী শাসনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কিছু স্মৃতিচিহ্ন থাকলে ক্ষতি কি? আমাদের তা সতর্কতা মূলক বিজ্ঞপ্তি বলেই মনে করা উচিত।

গত বিশ্বমহাযুদ্ধে জাপানীরা সিঙ্গাপুর দখল করার পর বৃটিশ শাসনের অনেক স্মৃতি চিহ্ন নষ্ট করে ফেলেছিল। তাদের শাসনের সময় তারা অনেক ঘর বাড়ী প্রতিষ্ঠানের স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করে। যুদ্ধশেষে বৃটিশেরা আবার যখন সিঙ্গাপুরে ফিরে এল তারা জাপানীদের সব কিছু নষ্ট করে ফেললো। এমন করে আর কি ইতিহাস মুছে ফেলা যায়? যা ঘটেছে তার অস্তিত্বকে কি এমন করে বিলোপ করা যায়?

বারো

বিপদ সংকেত

ছ'মাস জেল ভোগের পর ইয়াকুব হাসান, মাধবন নায়ার, গোপাল মেনন, ময়তীন কয়া 1921 সালের 17ই আগস্ট বাইরে এলেন। কালিকটে আসার পথে প্রত্যেকটি রেল ষ্টেশনে তাঁদের বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হলো। এঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য কালিকট রেলষ্টেশনে এক বিপুল জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। ইয়াকুব হাসান সোজা মাদ্রাজে চলে গিয়েছিলেন। বাকী তিনজনকে শহরের রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হলো। নানারকম বাজনা, স্লোগান আর হর্ষধ্বনির সঙ্গে এই শোভাযাত্রা যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন জনতা নেতাদের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। বালাপুরে কংগ্রেসের অফিসে আসতে শোভাযাত্রার তিনঘণ্টা লাগে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কালিকটের সমুদ্রতীরে যে সভা হয় তাতে হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। সেদিন হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী যেন সবচেয়ে উঁচু তারে বাঁধা ছিল। আমি ক'দিন নেতাদের এই অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলাম বলে অফিসের কাজে দৃষ্টি দিতে পারিনি। এখন অফিসের কাজে একটু মন দিলাম। নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেবার বেশ কিছু দিন আগের থেকেই এরনাডের অস্বস্তিজনক অবস্থার ব্যাপারে কংগ্রেস অফিসে রিপোর্ট পাচ্ছিলাম। সেখানে কংগ্রেস আর খিলাফত্ কমিটিগুলোকে ভেঙে দেবার জন্যে পুলিশ খুব চেষ্টা করছিল। যে কোনো ছুতোয় পুলিশের খিলাফত্ অফিসে গিয়ে সেখানকার কর্মীদের মারধোর করা, অ্যারেস্ট করা যেন একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশের এই অত্যাচার কংগ্রেস ও খিলাফত্ কর্মীরা বেশ কিছুদিন সহ্য করেছিল। অহিংসার সীমা কোথায় তা জানতে না পেরে তারা যেন একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিল। আমি যখন এরনাডে যাই তখন পুলিশের এই অত্যাচারের ব্যাপারে তারা আমার কাছে অনেক অভিযোগ করে। পুলিশ আমাদের ওপর যতই অত্যাচার করুক না কেন অহিংসা আমাদের ব্রত, তার থেকে এক পা ব্যতিক্রম করলে চলবে না একথা আমি তাদের বলি। কিন্তু একটানা পুলিশের অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা জনগণের ছিল না। কর্মীদের রিপোর্ট থেকে আমি এ সব জানতে পেরেছিলাম।

কংগ্রেস কমিটিগুলোর সংখ্যা বাড়লে শাসনকর্তারা খুব বিচলিত হয় নি। যেটা তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না তা হচ্ছে খিলাফত কমিটিগুলোর শক্তি বর্ধন।

খিলাফত্ কমিটিগুলো একটা গণ্ডগোল করতে চলেছে এই ভয় তাদের জেগেছিল।

খিলাফত্ আন্দোলন কি তা পাঠকদের জানা উচিত। 'খলিফা' এই আরবী শব্দটিরও অর্থ প্রতিনিধি। ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অবতার মুহম্মদের স্বর্গারোহণের পর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা আর ধর্মের নেতৃত্ব একজন ব্যক্তির ওপরই ন্যস্ত ছিল। প্রথম খলিফাকে নির্বাচন করা হয়। পরে এই পদ আরবের রাজপরিবার বংশ পরম্পরায় লাভ করেন। তারপর তুর্কী সুলতান এই পদ পান। সুলতানের এই খলিফা উপাধি নেওয়া মুসলমানেরা অনুমোদন করে। খলিফা উপাধি পাওয়া ব্যক্তি নিজের শাসন চালাবার যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলমান রাজা হবেন এরকম একটা বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের ছিল। এ ছাড়াও খলিফার আর একটা দায়িত্ব ছিল সেটা হচ্ছে মুসলমানদের পুণ্যস্থানগুলো রক্ষা করা। দ্বিতীয় তুর্কী সুলতানের এই ক্ষমতা ছিল বলে মুসলমানেরা তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিয়েছিল। তুর্কীর সুলতানকে বৃটিশরাও খলিফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

খলিফার আদেশ 'আল্লা' আর মুহম্মদ অবতারের আদেশ বলে মেনে নেওয়া। এর বিরুদ্ধাচারণ করলে পরলোকে তাদের কোন সদ্গতি হবে না বলে মুসলমানদের বিশ্বাস। তাই খলিফার পদমর্যাদা আর প্রভুত্ব যাতে অভঙ্গুর থাকে তা দেখা সব মুসলমানের কর্ত্তব্য বলে তারা মনে করে। তেমনি ভাবে ইসলামের প্রধান কেন্দ্র আরব মুসলমানদের অধীনে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে বলে তাদের জেদ।

খিলাফত্ আন্দোলনের ব্যাপারে সমালোচনা করার সময় দুটো জিনিষ বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। প্রথম—খলিফার উপাধি আর প্রভুত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব সব মুসলমানের, দ্বিতীয়—ইসলাম ধর্মের কেন্দ্র আরব দেশ এবং সেখানকার পুণ্য স্থানগুলি অন্য ধর্মের অধিকারে যেন চলে না যায় তা দেখার দায়িত্বও তাদের। এই দুটি বিশ্বাস অনেককাল ধরে মুসলমানদের মনে শেকড় গেড়ে বসেছিল।

1914 সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় তুর্কীর সুলতান বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এতে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা খুব কাহিল হ'য়ে পড়ে। তারা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রজা। এই অবস্থায় বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করার কর্তব্য তাদের। আবার তুর্কীর সুলতান তাদের খলিফা। এই অবস্থায় খলিফার বিরুদ্ধেও তারা কিছু করতে পারে না। খলিফার পদমর্যাদা আর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব তাদের। ভারতের মুসলমানদের এই উভয় সঙ্কটের কথা ভালো করে জেনেই বৃটিশরা তাদের সাহায্য পাবার উপায় খুঁজে বার করলো।

মুসলমানদের পুণ্যস্থানগুলি তারা ধ্বংস করবে না, তাদের যুদ্ধ তুর্কী সরকারের সঙ্গে। সুলতানের সঙ্গে নয়। ইউরোপীয় কোন সরকারের অধীনে না থেকে নিজের অধিকার চালানোর ক্ষমতা খলিফার থাকা উচিত বলে মুসলমানেরা যে মনে করে তাকে বৃটিশ সরকার শ্রদ্ধা করে। এই কথাগুলি বৃটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের ভাইসরয় বলেছিলেন। এর ফলে মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচুর মিলেছিল।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। বিজয়ী বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের কথা রাখবার কোন উৎসাহ দেখালো না। 1920 সালের জুন মাসে প্যারিসে যে চুক্তি হলো তাতে তুর্কী সুলতানের ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা কেটে ছেঁটে অনেক ছোট করে ফেলা হল। তুর্কী সাম্রাজ্যের অনেক অংশ অন্যের করতলগত হ'ল। সুলতানের হাতে নামমাত্র ক্ষমতা রইল।

খলিফার এই অপমানে ভারতীয় মুসলমানেরা খুবই ক্ষুব্ধ হলো। খলিফার পুরোনো পদমর্যাদা আর ক্ষমতা তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে বলে তারা দাবী জানালো। আবেদন নিবেদন করে যখন কোন ফল হলো না তখন তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তারা আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হলো। কংগ্রেস তাদের সাহায্য করবে বলে কথা দিল। এমনি ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত্ আন্দোলনও শুরু হলো। দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের মতো খিলাফত্ কমিটিও স্থাপন করা হ'ল।

খিলাফত্ ব্যাপারটা যে কি এ সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমানের ধারণা ছিল না। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আঘাত দিয়েছে তাই মুসলমানেরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না এইটেই ছিল সাধারণ মুসলমানের ধারণা। আর তাই তারা এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্যে তারা যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত একথা দেশের শাসন কর্তারা বেশ ভালো ভাবেই জানতো। তাই মুসলমান অধ্যুষিত এরনাডে খিলাফত্ আন্দোলনের শক্তিকে ভেঙে ফেলতে হবে এ সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছিল।

খিলাফত্ আন্দোলনকে ভেঙে ফেলবার জন্যে মালাবারের মুসলমানদের নিয়ে শাসনকর্তারা একটা দল গড়লো। এই দলটি বলতে লাগলো খিলাফত এবং কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেওয়া মুসলমানদের ধর্মবিরুদ্ধ। 1921 সালের 24শে জুলাই পোন্নানীতে একটা খিলাফত্ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিপক্ষ দলটি এর বিরুদ্ধে আর একটা পাল্‌টা সভার আয়োজন করলো। এতে দেশের শাসনকর্তারা তাদের সাহায্য করেছিল। খিলাফত্ আন্দোলনকে ভেঙে চুরমার করে দেবার যে

কোনো একটা ছুতোর অপেক্ষা করেছিল পুলিশ কিন্তু সেদিন খিলাফত্ কর্মীদের অসীম ধৈর্য আর স্থিরবুদ্ধি একটা বিরাট গোলমালকে পরিহার করতে পেরেছিল।

তখন পোন্নানীর কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন কেলপ্পন। তিনি গান্ধীবাদী নির্ভীক এক কর্মী। অনেক সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করেছেন।

পোন্নানীর ঘটনার পর তিরুরাঙ্গাডিতে একটা জনসভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম বলে মনে আছে। ওখানকার খিলাফত্ এই সভা ডেকেছিল। পুলিশের আচরণে উত্তেজিত না হয়ে অহিংসা থেকে এক পা না নাড়া জনগণের কর্তব্য বলে আমি সেখানকার সম্মিলিত জনতার কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম।

সে সময় এরনাডে তালুক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন এম. পি. নারায়ণ মেনন। এরনাডের অবস্থা খুব ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দু' তিনবার তিনি কালিকটে এসে এরনাডের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছে বলে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে কিছু লোক যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে সেকথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। এই কথাগুলি মনে রেখেই তিরুরাঙ্গাডির সভায় জনগণকে সম্পূর্ণ অহিংস আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমার এই আবেদনে ফল হবে কিন্তু পরে যে সব ঘটনা ঘটলো তাতে আমার বিশ্বাস যে কতখানি ভুল তার প্রমাণ হয়।

তেরো

মালাবার বিক্ষোভের আরম্ভ

1921 সালের 19শে আগস্ট মালাবার খিলাফত্ কমিটির সেক্রেটারী মুহম্মদ আবদুর রহমান রাত প্রায় দশটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কংগ্রেস অফিসে আসেন। কতকগুলো খুব জরুরী ব্যাপার আমাকে জানাতে তিনি এসেছিলেন। পুলিশ আর সৈন্য নিয়ে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন একঘন্টা আগে কালিকট থেকে রওনা দিয়েছে একথা তিনি আমায় জানালেন। তারা যে কোথায় গেছে সে খবর তিনি বলতে পারলেন না। হয়তো পুকোট্টুরে গেছে এইটুকু শুধু তিনি বলতে পারলেন। কিছুদিন আগে পুকোট্টুরে বেশ গোলমাল হয়েছিল তাই পুলিশ আর সৈন্য সেখানে গেছে বলে আবদুর রহমান অনুমান করেছিলেন। পুলিশ পুকোট্টুরে যদি অ্যারেস্ট করতে আরম্ভ করে তাহলে লোকদের শান্ত থাকতে বলার জন্যে তাঁকে সেখানে যেতে হবে বলে আবদুর রহমান বল্লেন। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ কিছুক্ষণ ভেবে আমি এখন যাবো না বলে ঠিক করলাম। সৈন্যেরা যে কোথায় গিয়েছে ঠিক নেই। পুকোট্টুরে গেলেও তাদের পৌছোনোর আগে আমি সেখানে পৌছোতে পারবো না। তাই তক্ষুণি রওনা হবার কোনো দরকার নেই বলে মনে হল। ঠিক ঠিক খবর পেলে পরের দিন সকালে আমাকে জানাবার জন্যে আমি আবদুর রহমানকে বল্লাম।

20 তারিখে দুপুরের পর কালিকটে নানারকম খবর আসতে লাগলো। এরনাডে খুব গণ্ডগোল হয়েছে। সৈন্যেরা বহু লোককে গুলী করে মেরেছে। বিক্ষোভকারীরাও বেশ কিছু সৈন্যকে মেরে ফেলেছে। সৈন্যেরা এখন কালিকটে আসছে ইত্যাদি খবর শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। সঠিক খবর জানার জন্যে হাজার হাজার লোক কংগ্রেস অফিসে আসতে লাগলো। সন্ধ্যের সময় খবর পাওয়া গেল যে গণ্ডগোল হয়েছে তিরুরাঙ্গাডিতে। বিক্ষোভকারীরা সৈন্যদের ওখান থেকে হটিয়ে দিয়েছে। সেখানে মারপিট হত্যা চলছে। খবর পাওয়া মাত্র সমস্ত শহর ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। দোকান বাজার সব বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেল। সন্ধ্যা হবার আগে লোকে বাড়ী ফিরতে লাগলো। জোরে কথা বলতে পর্যন্ত লোকে ভয় পেয়ে গেল।

সেদিন প্রায় রাত একটার সময় কিসের যেন একটা শব্দ বাড়ীর নীচে শুনতে

পেলাম। উঠোনে যেন কিছু লোকের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। উঠে বারান্দা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি উঠোনে সাত আটজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। 'কে ?' জিজ্ঞেস করলে পর বল্ল, আমরা এরনাড থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে কতকগুলো জরুরী কথা বলার আছে। আমি নীচে নামলে পর একজন আমাকে তাদের মধ্যেকার অপর দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে বল্ল—আমরা চেরুবান্নুর থেকে আসছি আর এই দুজন তিরুরাঙ্গাডি থেকে এসেছে ওখানকার খবর দিতে।

লোক দুটি আমাকে জানালো যে সৈন্যেরা সেদিন ভোরবেলা তিরুরাঙ্গাডিতে গিয়ে লোকদের অ্যারেস্ট করেছে। মসজিদ ঘিরে ফেলেছে, কয়েকজন লোককে গুলী করে হত্যা করেছে। কিছু লোকে সৈন্যদের বাধাও দিয়েছে। কালেক্টর তমাস আর পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট হিচ্ককও মারা গেছে। তবে এ খবরটি ঠিক নয়।

সব কিছু জানানোর পর তারা জিজ্ঞেস করলো আমরা এখন কি করবো?

আমি বল্লাম—আপনারা এখন কিচ্ছু করবেন না। বাড়ী ফিরে যান। আমি সকালেই তিরুরাঙ্গাডি যাব। ওখান থেকে ফিরে এসে কি করবো ঠিক করবো।

"কাল সৈন্যেরা আসবে। আমাদের তাদের বাধা দেওয়া উচিত। গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড্ তৈরী করলে হয় না?"

—"অমন করলে আবার অন্যরকম গোলমাল শুরু হতে পারে। আপনারা এখন এরকম কিছু করবেন না"—বলে আমি তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। সকাল বেলায় কি করবো না করবো ভেবে ঠিক করে শুতে গেলাম, কিন্তু ঘুম হ'ল না।

21শের সকাল বেলা। গোলমালের খবর জানার জন্যে লোকেরা কংগ্রেস অফিসে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। নানারকম গুজব শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক লোক এসে আমাদের বিক্ষোভের জায়গায় না যাওয়ার উপদেশ দিল।

সকালে আমি আমার তিন চারজন বন্ধুর সঙ্গে তিরুরাঙ্গাডি রওনা হলাম। রাস্তায় কুণ্ডোট্টি বলে একটা জায়গায় একজন মুসলমান নেতা তাঙ্গলের বাড়ীতে নামলে বহু লোক সেখানে এসে জড়ো হলো। এখানে জানতে পারলাম যে সেদিন সকালে তিরুরাঙ্গাডির থেকে বিক্ষোভকারীদের একটা বিরাট দল মাঞ্চেরীর দিকে রওনা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা সেখানে পৌছোনোর আগে আমাদের সেখানে পৌছোতে হবে বলে আমরা ঠিক করলাম।

গাড়ীতে যেতে যেতে রাস্তায় বিরাট বিরাট গাছ কেটে ব্যারিকেড্ তৈরী করা হয়েছে দেখতে পেলাম। আমরা গাড়ী থামাতে কয়েকজন লোক ছুটে এসে জানালো যে মাঞ্চেরী অবধি সারা রাস্তায় এমনি ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে তাই মাঞ্চেরী

অবধি গাড়ী নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মাঞ্চেরী যাবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরা কুণ্ডোটিতে ফিরে এলাম, গাড়ী সেখানে রেখে আমরা পায়ে হেঁটে তিরুরাঙ্গাডি রওনা দিলাম।

তিরুরাঙ্গাডি পৌঁছোতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছিল। রাস্তা ভালো ছিল না। খেতখামার ঝোপঝাড় উঁচুনীচু টিলা সব পার হ'তে হয়েছিল। পথে বহুলোকের ভীড় দেখলাম। অনেক জায়গায় তারা আমাদের ডাবের জল, চিঁড়ে গুড় খাইয়েছিল। তিরুরাঙ্গাডির কাছাকাছি এলে পর আমাদের একটা নদী পার হ'তে হলো। নদীর অপর পারে বহু লোক ভীড় করে আছে দেখতে পেলাম। এই সব লোকদের হাতে নানারকম অস্ত্রও দেখলাম। নৌকো থেকে নেমে আমরা গোলমালের জায়গায় রওনা হ'লে তারাও আমাদের পেছন পেছন চললো।

পথে যেতে যেতে আগের দিনের ঘটনার কথা সব শুনলাম। যেখানে যেখানে গণ্ডগোল হ'য়েছিল সে জায়গাগুলোও আমাদের দেখান হ'ল। আমাদের একটা বিরাট বাড়ীতে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হয়, বাড়ীর ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি নীচে জড়ো হওয়া লোকগুলিকে দেখলাম। তিরুরাঙ্গাডি যে দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তাতে সহানুভূতি জানিয়ে শান্তি রক্ষা করার জন্য আমি অনুরোধ করলাম। আমার উপদেশ শোনার মত মনের অবস্থা যে তাদের নেই তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। তবে দু'একজন কর্মী আমার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিশ্বাসেই আমি ঐটুকু বলেছিলাম। 20শে আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিলাম :

19শে আগস্ট রাতে সৈন্য আর পুলিশে ভরা একটা স্পেশ্যাল ট্রেন তিরুরাঙ্গাডির দিকে রওনা হয়। পরদিন ভোরে তিরুরাঙ্গাডির পথে তারা রওনা হয়। ফেরীঘাটে তারা সৈন্যদের পাহারা দিতে রাখে। সকাল পাঁচটার মধ্যেই সব প্রস্তুতি শেষ হ'লো। তিরুরাঙ্গাডির মস্‌জিদ, খিলাফত্ অফিস আর কয়েকজন নেতার বাড়ী সৈন্যেরা ঘিরে রাখল। সকাল হ'লে পর পুলিশ সমস্ত কিছু সার্চ ক'রে খিলাফত্ অফিসের রেকর্ডগুলো সব নিয়ে গেল। কাউকে কাউকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে যায়। গোলমাল কিন্তু তখনো পর্যন্ত হয়নি। ঘটনাগুলোর খবর যখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো তখনই গোলমাল শুরু হলো। তিরুরাঙ্গাডির মস্‌জিদ সৈন্যেরা ঘিরে ফেলেছে, মস্‌জিদে গুলী চলেছে, মুসলমানদের বাড়ী থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, কাউকে কাউকে গুলি করে হত্যাও করেছে ইত্যাদি খবর খুব দ্রুত পরপর গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। এ সব জায়গার মুসলমানেরা সব এসে তিরুরাঙ্গাডিতে জড়ো হ'ল। বিরাট এক জনতা

পুলিশ ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লো। পুলিশ আর সৈন্য তাদের পথ রোধ করলো। 'তোমাদের কি চাই?' পুলিশ জিজ্ঞেস করলে পর "বন্দীদের ছেড়ে দাও" বলে আলি মুসালিয়ার বল্লেন। আলি মুসালিয়ার মসজিদের মোল্লা ছিলেন। ওখানকার মুসলমানদের ওপর তাঁর খুব প্রভাব ছিল।

"তোমরা আর এগিও না, বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে"-এ কথা হেড কন্‌স্টেবল্ বললে পরে জনতা সেখানে বসে পড়লো! আধ মিনিটের মধ্যে এই জনতার ওপর গুলি চালনার আদেশ মিলিটারী দিল। বন্দুকের শব্দ—আহতদের আর্তনাদ, রক্ষা পাবার জন্য লোকদের ছোটাছুটি সমস্ত কিছু মিলিয়ে সে জায়গাটা যেন একটা ছোটখাট যুদ্ধভূমিতে পরিণত হলো। সৈন্যদের এই প্রবঞ্চনায় ক্রুদ্ধ জনতা তাদের হাতে যা অস্ত্র ছিল তাই দিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করলো। বন্দুকের গুলি উপেক্ষা ক'রে তারা এগিয়ে চললো, হেড্ কনস্টেবল্ আর দুজন গোরা সৈন্য মারা গেল। সৈন্যেরা এবার ভয় পেয়ে পেছন ফিরলো।

তিরুরাঙ্গাডির আশপাশ থেকে আসা লোকেরা এই ঘটনার পর ফেরার পথে গভর্ণমেণ্ট অফিস, পুলিশ ষ্টেশন, রেলওয়ে ষ্টেশন, আদালত সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। রেলের লাইন উপড়ে তুলে ফেললো, তার কাটলো। তারা তখন সব কিছু করতে প্রস্তুত।

তিরুরাঙ্গাডির ঘটনা জানতে পেরে সেখানকার মিলিটারীকে সাহায্য করার জন্য মালাপুরম থেকে দুই লরী ভর্তি পুলিশ আর মোটর গাড়ী বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় আটকে ফেললো। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল, পুলিশদেরও কয়েকজনকে মেরে ফেলো।

তাদের আর রক্ষা নেই জানতে পেরে পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট হিচ্‌কক আর কালেক্টর তমাস সেই রাত কোনরকমে পুলিশ ষ্টেশনে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা কালিকট রওনা হলো। পথে একটা বিরাট জনতা তাদের অনুসরণ করে। পুলিশ আর মিলিটারী তাদের গুলি করতে করতে চললো।

এই সব খবর জানতে পেরে মসজিদে গিয়ে আলি মুসালিয়ারের কাছ থেকে সব খবর জানার আগ্রহ হ'লেও হাতে সময় ছিল না বলে সে ইচ্ছে পরিত্যাগ করতে হলো। সেই রাতেই আমরা কালিকটের পথে রওনা দিলাম।

পথে একটা জায়গায় অনেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। তারা আমাদের গাড়ী থামাতে বলল। গাড়ী থেকে নেমে দেখি যে ওখানে একটা ছোট পুল ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে। আমরা সকালবেলা ঐ পথ দিয়ে গিয়েছি

একথা এই লোকগুলি জানতো। সন্ধ্যে অবধি তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আমাদের গাড়ী দেখতে না পেয়ে আমরা অন্যপথে ফিরে গেছি ভেবে পুল ভেঙে দিয়েছে। কালিকটে নদীপথে ফিরে যাবার জন্য তারা তক্ষুণি আমাদের একটা ছোট্ট নৌকো ঠিক করে দিল। পরদিন সন্ধ্যে পাঁচটায় আমরা কালিকটে পৌছোলাম।

আমার কোনো খবর না পেয়ে আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। আমাদের ফিরতে দেখে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ইতিমধ্যে কালিকট এবং আরো কয়েকটি জায়গায় মিলিটারী শাসন চালু হয়ে গেছে।

চোদ্দ

বিক্ষোভস্থলে যাত্রা

তিরুরাঙ্গাডির ঘটনা আমাদের বিচলিত করেছিল। ওখান থেকে ফিরে আসার পর আমাদের প্রধান চেষ্টা হলো যাতে বিক্ষোভ আর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে না পড়ে তা দেখা। এরনাড এবং অন্যান্য জায়গায় মিলিটারী-শাসন জারী হওয়ার ফলে সেখানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতাও ছিল না। সরকারের বিনানুমতিতে সেখানে যাবার উপায় ছিল না। তাই সেখানে যাবার অনুমতি চেয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তমাসকে একটা চিঠি আমি লিখলাম।

—"এরনাডে যে সব ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য আপনার মতো আমিও খুব দুঃখিত। আমি আর আমার কয়েকজন কর্মী বিক্ষোভের জায়গাগুলিতে গিয়ে শান্তি স্থাপন করতে চাই। তার সব সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আপনার এবং মিলিটারী শাসনকর্তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের অনুমতি পেলেই এরনাডে রওনা হবো ভাবছি।"

এই চিঠি ম্যাজিষ্ট্রেটকে পৌঁছে দেওয়া অত সহজ ছিল না। সামরিক শাসন চালু ছিল বলে কারোরই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সামরিক শাসনকর্তাদের কাছে যাওয়া সহজ ছিল না। গোপাল মেনন ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করছিলেন। তিনি ঐ চিঠি তমাসের কাছে নিয়ে যাবেন বলে বল্লেন। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর গান্ধী টুপি দেখলে ওপরওয়ালারা তখন খুবই চটে যেতেন। কিন্তু গোপাল মেনন এই পোষাকেই তমাসের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা দিলেন। এই দৌত-কার্য নির্বাহ করার জন্য গোপাল মেনন যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সব গুণের জন্যই তিনি পরে নানা রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে কাজ করে নাম করেছেন।

তমাসের উত্তর পেতে দুদিন লাগলো।

—"আপনার চিঠি পেলাম। আপনাদের প্রচারণার কুফল আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং যে আগুন আপনারা জ্বালিয়েছেন সে আগুন নিভোবার চেষ্টা আপনি করতে চান জেনে আমি খুশী হয়েছি। বিক্ষোভের জায়গাগুলিতে খুশীমতো ঘুরে বেড়াবার জন্য আমি এবং মিলিটারী শাসনকর্তারা আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। আপনার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।"

চিঠির দ্বিতীয় লাইনটা পড়ে আমার একটু রাগ হলো। আমি তক্ষুনি তার একটা জবাব লিখে পাঠালাম। জবাবটা এইরকম—"আপনার চিঠি পেলাম, বিক্ষোভের জায়গাগুলি সন্দর্শন করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে এবং কম্যাণ্ডিং অফিসারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু গোলমালের কারণ আমাদের প্রচারণার ফল বলে আপনি বলেছেন। আমি তার প্রতিবাদ করছি। গোলমালের কারণ কে তা নিয়ে তর্ক করার সময় এটা নয়। আমি 24 জন কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে কাল সকালে এরনাড রওনা হচ্ছি। আমরা ওখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার আগে মিলিটারী যেন সেখানকার জনতাকে উত্তেজিত না করে। তাহ'লে আমাদের যাওয়া একেবারে বিফল হবে। আশা করি আপনারা এ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সেইমতো মিলিটারীকে নির্দেশ দেবেন।"

26শে আগস্ট সকালবেলায় আমরা 24 জন দুটো ঘোড়ার গাড়ী করে কালিকট থেকে রওনা হ'য়ে ফারোক ব্রিজের কাছে এলাম। ব্রিজের কাছে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। একজন সার্জেণ্টকে দেখে তার কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্রটা দেখালাম। সার্জেণ্ট এ চিঠি নিয়ে টটেনহ্যাম বলে এক মিলিটারী অফিসারের কাছে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে টটেনহ্যাম উপস্থিত হয়ে আমাদের সকলকে এক এক করে গুণে 'Pass 24 non-co-operators from Calicat Taluk to Ernad Taluk along the Feroke bridge' বলে ঐ চিঠির ওপর লিখে দিলেন।

ব্রিজ পার হ'য়ে ওপারে পৌছোনোর পর আমার হঠাৎ সন্দেহ হ'লো ফিরে আসার সময় এই পাশ দেখালে হবে কিনা। আমি আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য আবার ফারোক ষ্টেশনে গিয়ে টটেনহ্যামকে জিজ্ঞেস করতে ঐ পাশ যথেষ্ট বলে তিনি আমাকে বললেন। টটেনহ্যাম আমাকে দেখে কোনোরকমে তাঁর ক্রোধ সংবরণ করেছিলেন তা তাঁর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছিলাম। আমি বেরিয়ে আসার সময়—"বিক্ষোভ-কারীদের সঙ্গে আপনাকেও ফাঁসি দেওয়া উচিত" বলে তিনি বল্লেন।

"দরকার হ'লে আমি খুশী মনেই ফাঁসির মঞ্চে উঠবো" আমি বল্লাম। তাতে তিনি হেসে বল্লেন—"আমি ঠাট্টা করছিলাম।" আমি বল্লাম—"আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।"

খদ্দরের সার্ট আর গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে আমরা দুজন করে ফারোক থেকে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। রাস্তায় খুব কম লোক আমরা দেখতে পেলাম। আশপাশের বাড়ীগুলোও সব খালি খালি মনে হলো।

ফারোক থেকে চার পাঁচ মাইল পূবে পৌছোলে পর দূরে ভাঙা চোরা একটা কুটির থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। আমরা তিরুরাঙ্গাডি যাচ্ছি তা তারা বুঝতে

পেরেছিল। কালিকট থেকে সৈন্য বা পুলিশ এলে সে খবর বিক্ষোভকারীদের জানিয়ে দেবার জন্য রাস্তায় লোকেরা এখানে ওখানে লুকিয়ে ছিল সেটা আমরা পরে জানতে পারলাম। এই দুজন তাদেরই কেউ হবে। পথে যেতে যেতে আমরা 8/10 টা লরী আর মোটর করে সৈন্যদের বিক্ষোভের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখতে পেলাম। দূর থেকে আমাদের দেখে মিলিটারী ভেবে ভুল করে বিক্ষোভকারীরা আমাদের গুলি করে মেরে ফেলতে পারে একথা তারা আমাদের জানালো। তাই তাদের মধ্যে থেকে একজন তক্ষুনি আমাদের আসার খবর বিক্ষোভকারীদের দিতে গেল।

ফেরীঘাটে পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তা ভোলার নয়। কংগ্রেস আর খিলাফত পতাকা নিয়ে দুটো বড় নৌকোয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আলি মুসালিয়ারের লোকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা আমাদের খুব সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলো। তারা জানালো যে তিরুরাঙ্গাডি এবং কাছাকাছি জায়গাগুলোতে বৃটিশ শাসনের অবসান হয়েছে। আলি মুসালিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী তার লোকেরা সেখানে শাসন চালাচ্ছে। এদের মধ্যে মুসালিয়ারের মন্ত্রী লবকুট্টিও ছিলেন।

নদী পার হ'য়ে ওপারে পৌঁছোতেই আলি মুসালিয়ারের একশ'র বেশী সৈনিক আমাদের স্বাগত জানাল। তারা ছাড়াও আরো বহু লোক জড়ো হয়েছিল। আমাদের দেখে রাস্তার দু'পাশের ঘন জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। লবকুট্টি সকলকে কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিরুরাঙ্গাডির খিলাফত্ অফিসে পৌঁছে দেখি সেখানেও একদল ভলান্টিয়ার দাঁড়িয়ে আছে। আমি, গোপাল মেনন আর মম্বতু মৌলভী ওপরে উঠে আলি মুসালিয়ারের ঘরে ঢুকলাম।

আলি মুসালিয়ার একটু পরে এলেন। তাঁর সঙ্গে দু'তিনজন লোক ছিল। আমরা উঠে তাঁকে অভিবাদন করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। একটু পরে তাঁর কাছ থেকে তিরুরাঙ্গাডির সব ঘটনা শুনতে পেলাম।

আলি মুসালিয়ারের বয়স তখন প্রায় পঁয়ষট্টি বছর। ফর্সা, লম্বা, পাতলা চেহারা। তাঁর হুকুম মানার জন্যে যে কতলোক তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল!

আলি মুসালিয়ারের কাছে সব শুনে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—এখন তাহ'লে কি করবেন বলে ভাবছেন?

তিনি আমাকে পালটা প্রশ্ন করলেন—কি করবো বলুন?

এই রকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে বিবেককে ফাঁকি দিয়ে উপদেশ দেওয়া অত সহজ নয়। আমার আগমনের উদ্দেশ্যে যে এই তা হয়তো তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন।

—আমি যা বলছি তাতে আপনি ভুল বুঝবেন না, এই ভূমিকা করে আমি তাঁকে আমার অভিমত জানালাম।

—যা হয়ে গেছে সে বিষয়ে আর বেশী কথা বলে লাভ নেই। অপ্রত্যাশিত ভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। এরপরও যদি আমরা আবার গণ্ডগোলের জন্য তৈরী হই তাহ'লে আমাদের খুব বড় একটা বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে। আমাদের আসার পথে আমরা বহু সৈন্যকে গাড়ী ক'রে আসতে দেখেছি। তারা এসেই যদি গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে তাহ'লে যে কি হবে তা তো বুঝতেই পারছেন। যদি সে রকমটি না চান তাহ'লে সরকার যেসব লোকদের ধরতে চায় তাদের মিলিটারীর কাছে সমর্পণ করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। তাহ'লেই তিরুরাঙ্গাড়ি এবং এখানকার লোকদের বাঁচানো সম্ভব হবে। আত্মসমর্পণকারীদের অবশ্য শাস্তি হবে। তবে তারা এইভাবে ত্যাগ করলেই তবে অন্যদের বাঁচানো সম্ভব হবে। আপনি একথা আপনার লোকদের বুঝিয়ে বলুন। এইই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

আলি মুসালিয়ার সব শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেখানে জড়ো হওয়া লোকগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে আমাকে বল্লেন—আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই। আমাদের কর্ত্তব্য এক্ষুনি অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবো। লবকুট্টি আর কুঞ্জলবির সঙ্গে দেখা করে তাদের এই কথা বললে ভালো হয়।

আমরা তাঁকে বল্লাম যে তাই করবো। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য যে কি তা অনুমান করে কিছু লোক গোপনে কি সব বলাবলি করছে। তাই সেখানে বেশীক্ষণ থাকাটা বিপজ্জনক একথা আমাদের জানিয়ে আলি মুসালিয়ার মসজিদে চলে গেলেন। আমরাও ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

খিলাফত্ অফিসের সামনে কুঞ্জলবি দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে একটা তলোয়ার, কাঁধে একটা তলোয়ার। সে আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। আলি মুসালিয়ারের সৈন্যদের ক্যাপ্টেন ছিল কুঞ্জলবি। বিশে আগস্ট তিরুরাঙ্গাড়ির গণ্ডগোলে যে দুজন গোরা সৈন্য মারা যায় তাদের মেরেছিল কুঞ্জলবি। সেদিনকার সব ঘটনা আমি কুঞ্জলবির কাছ থেকেই শুনলাম। সব শুনে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'আপনি এখন কি করবেন?' 'আত্মসমর্পণ করার কথা আপনি আমাকে বলবেন না। সাহেবরা যদি আমাকে পায় তাহ'লে আমাকে অমনি মারবে না, আমাকে বাঁটনা বাটার মতো থেঁতো করবে। আমি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই মরবো'—এই কথাগুলি কুঞ্জলবি আমাকে খুব বিনয়ের সঙ্গেই বল্ল।

—'ঠিক আছে তাই করুন। কিন্তু তিরুরাঙ্গাডির অবস্থা তাহ'লে কি হবে বুঝতে পারছেন তো? মিলিটারী যদি মসজিদে গুলি করে?'

—আপনি যদি এখানে থাকেন তাহ'লে ঐ গুলির একটাও মসজিদে লাগবে না—কুঞ্জলবি উত্তর দিল। তার বিশ্বাসও তাই।

এরপর আত্মসমর্পণের কথা আর কুঞ্জলবির কাছে বলে কোনো লাভ নেই বলে আমার মনে হলো। আলি মুসালিয়ার তাকে বুঝোতে পারতেন কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে রাজী ছিলেন না। এই অবস্থায় গোলমাল সে চলতে থাকবে তা বোঝা গেল।

ওখানকার সাবরেজিস্ট্রার করুণাকর মেননের গর্ভবতী পত্নী আর বাচ্চারা গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছে শুনে তাদের ওখান থেকে যে ক'রে হোক রক্ষা করতে হবে একথা আমি কুঞ্জলবিকে বললাম। সে তক্ষুণি এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে দিল।

ফেরীঘাট পার হ'তে আমাদের রাত আটটা বেজে গেল। নৌকো করে অপর পারে যাবার সময় মসজিদ থেকে মুসলমানদের সম্মিলিত প্রার্থনা সেই ঘন অন্ধকারে কি যে একটা অনুভূতি আর আবেগে আমার মনকে ভরিয়ে দিয়েছিল তা বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে মশালের আলো দেখা যাচ্ছিল। গাছে গাছে হাজার হাজার জোনাকীরা তাদের আলো জ্বালিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলছে। অসহ্য একটা বেদনার ভার আমার মনকে নীচে গভীর নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কত রকমের ভাবনা যে দ্রুত আমার মনের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। নৌকো থেকে নেমে কাছেই একটা বাড়ীতে সে রাতে আমরা বাস করলাম। পরের দিন সকালে আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম।

করুণাকর মেননের স্ত্রীকে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে আমাদের সঙ্গের লোকেরা বয়ে নিয়ে চললো। দশ মাইল দূরে একজন নায়ারের বাড়ীতে দুপুরে আমরা আহার করলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার যাত্রা আরম্ভ করে সন্ধ্যাবেলায় আমরা কালিকটে পৌছোলাম।

পনের

বিক্ষোভের ব্যাপ্তি ও শক্তি

26শে আগস্ট কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে কালিকট থেকে তিরুরাঙ্গাড়ি যাবার সময় সৈন্যদের ট্রাকে করে বিক্ষোভ স্থানে যেতে দেখেছি বলে বলেছি। তাদের পেছনে রিজার্ভড্ পুলিশও ছিল। এদের গন্তব্য ছিল তিরুরাঙ্গাড়ি। সৈন্য আর পুলিশ যে আসবে তা আলি মুসালিয়ার ও তাঁর সহকর্মীরাও বুঝতে পেরেছিলেন।

আলি মুসালিয়ার তাঁর অধিকৃত জায়গাগুলি থেকে মহিলা আর বাচ্চাদের ভেতরে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ যেন অনাবশ্যক দাঙ্গাহাঙ্গামা না করে। হিন্দুদের ওপর যেন কোনরকম অত্যাচার না করা হয়, হত্যাকারী, হাঙ্গামাকারীকে উচিত মতো শাস্তি দেওয়া হবে বলে আলি মুসালিয়ার ঘোষণা করেছিলেন। যতদিন তাঁর অধিকার ছিল ততদিন এই সব জায়গায় দাঙ্গাহাঙ্গামা লুঠতরাজ খুব কমই ছিল, কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা রইল না।

প্রস্তুতি সব শেষ করে পুলিশ আর সৈন্য 30শে আগস্ট তিরুরাঙ্গাড়িতে এসে উপস্থিত হল। এসেই তারা মসজিদের সামনে তাদের ছাউনী পাতলো। পরিখা তৈরী করে বন্দুক সাজিয়ে যুদ্ধের জন্য তারা তৈরী হ'ল। আলি মুসালিয়ার এবং আরো অনেকে মসজিদের ভেতর ছিলেন। 31শে আগস্ট সকালে মিলিটারী গুলি করতে শুরু করলো। মসজিদের ভেতর থেকে বিক্ষোভকারীরা সৈন্যদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। এমনিভাবে দু'পক্ষের গুলি ছোঁড়া বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল। মসজিদের তিন ভাগ সৈন্যরা ঘিরে রেখেছিল। দুপুর হ'লে পর কয়েকজন লোক পাগলের মতো হয়ে মসজিদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের সঙ্গে কুঞ্জলবিও ছিল। হাতে তলোয়ার আর ছুরি নিয়ে তারা সৈন্যদের সম্মুখীন হল। কয়েকজন সৈন্যকে তারা তলোয়ার আর ছুরির ঘায়ে জবাই করলো। সৈন্যেরা কিন্তু এদের ধরতে পারলে না, তারা ছুটে মসজিদের উত্তর ভাগে একটা জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে লুকোলো।

মসজিদের মধ্যে যারা ছিল তারা এর পরেও গুলি চালাতে লাগলো। বুলেট প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। আর যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে বিক্ষোভকারীরা সাদা পতাকা উড়িয়ে তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী বলে জানালো। আলি মুসালিয়ার

তার লোকজনদের নিয়ে মসজিদের বাইরে এসে আত্মসমর্পণ করলেন। এমনিভাবে তিরুরাঙ্গাডির যুদ্ধ শেষ হ'ল। আলি মুসালিয়ার এবং অন্যান্যদের বন্দী করে পরের দিন তিরুর রেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

এই ধরনের বিক্ষোভ শুধু তিরুরাঙ্গাডি নয়, এরনাড, ভল্লুনীড, পোন্নানী, কালিকট এবং আরো কতকগুলো জায়গায় হ'য়েছিল। সেই সব জায়গায় কিছুদিনের জন্য বৃটিশ শাসনের অবসান হ'য়েছিল। এই সব জায়গায় তখন যে অরাজকতা চলেছিল তা বলায় নয়।

বিক্ষোভকারীরা যখন পোন্নানী ট্রেজারী লুট করতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন পথিমধ্যে কেলপ্পনের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কেলপ্পন তাদের এর থেকে বিরত হবার জন্য আবেদন জানালেন। তাঁর দেহের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে না গেলে ঐ রাস্তা দিয়ে তারা যেতে পারবে না বলে তিনি রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁর নামেই পরে পুলিশ বাড়ীতে আগুন দেওয়ার দোষারোপ করেছিল। মাঞ্চেরী এবং পেরিন্তল্মান্নাতে বিক্ষোভকারীদের একটা বড় দল গভর্নমেণ্টের ট্রেজারী লুট করে নিয়েছিল, পুলিশ ষ্টেশন আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্রও তারা লুট করেছিল। গভর্নমেণ্ট অফিসের সব রেকর্ড তারা নষ্ট করে। এই ধরনের ব্যাপার আরো কয়েক জায়গায় ঘটে। জেলে আর লক্আপে রাখা চোর ছ্যাঁচড়দেরও সব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মাঞ্চেরীর রাজপ্রাসাদের লোকেরা বিক্ষোভকারীরা সেদিকে আসছে শুনে আগের থেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। নীলাম্বুর রাজপ্রাসাদে রাজার দেহরক্ষী আর বিক্ষোভ-কারীদের মধ্যে মারামারিতে রাজার দেহরক্ষীদের কয়েকজন মারা যায়।

বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায় কুঞ্জ আহম্মদ হাজীর। পঞ্চান্ন বছরের হাজী আলি মুসালিয়ারের আত্মীয় এবং শিষ্য ছিলেন। তিরুরাঙ্গাডিতে যা ঘটে গেল তা দেখে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন। মাঞ্চেরীতে এক জনসভায় হিন্দুদের ওপর কোনো অত্যাচার করা হবে না, যারা মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি বলেছিলেন। এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন বলে এম. পি. নারায়ণ মেননের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। এর জন্য মিলিটারী কোর্টে তাঁকে 14 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। নারায়ণ মেনন ছিলেন এরনাডের কংগ্রেস সেক্রেটারী। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার জন্য তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে যে কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন তার পুরস্কার স্বরূপ এই শাস্তি তিনি পেলেন। তখন পুলিশ যে সব অন্যায় করেছিল তার একটি অতি উত্তম উদাহরণ নারায়ণ মেননের এই কঠিন শাস্তি।

মহম্মদ হাজীর সঙ্গেকার বিক্ষোভকারীরা পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর চেকুট্টিকে গুলি করে মেরে তার মাথা কেটে উঁচু করে ধরে মাঞ্জেরীর কয়েক জায়গায় শোভাযাত্রা করে নিয়ে গিয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা এইভাবে পুলিশকে একটি ভালোমত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। এই ব্যাপারে তারা হিন্দু মুসলমানে কোনো তফাৎ রাখেনি।

পূকোট্টুর বলে আর একটা জায়গায়ও খুব গণ্ডগোল হ'য়েছিল। কালিকট থেকে মালাপুরমের পথে পূকোট্টুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি রমণীয় স্থান পূকোট্টুর। তিরুরাঙ্গাডির ঘটনার কথা জানতে পেরে এখান থেকে বিক্ষোভকারীদের একটা বিরাট দল তিরুডাঙ্গাডির পথে রওনা হ'লে কে. মাধবন নায়ার আর আবদুর রহমান তাদের পথে আটকে আবার পূকোট্টুরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। 21শে আগস্ট এটা ঘটেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে পূকোট্টুরের অবস্থা আবার বদলে গেল। পাহাড় জঙ্গল আর উঁচু নীচু টিলায় ভর্তি এই জায়গাটি আত্মগোপনের পক্ষে ছিল উত্তম। বহু বিক্ষোভকারী ওখানে লুকিয়ে আছে বলে মিলিটারী খবর পেয়েছিল। মিলিটারীকে বাধা দেবার জন্য বিক্ষোভকারীরাও সারা রাস্তা ধরে বড় বড় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরী করেছিল।

26শে আগস্ট সকালবেলায় মিলিটারী পূকোট্টুরে এল। রাস্তায় কাউকে দেখতে না পেয়ে জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য করে তারা গুলি ছুঁড়ল। বিক্ষোভকারীরাও এর পালটা জবাব দিল। নানাদিক থেকে সৈন্যদের তারা আক্রমণ করলো। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিক্ষোভকারীদের সৈন্যরা দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। গুলি বারুদ ফুরিয়ে গেলে পর বিক্ষোভকারীরা তাদের রণকৌশল বদলালো। তারা 'নহরে'র শব্দ করল। যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হ'তে জনগণকে জানানোর জন্যে মসজিদে বিরাট ড্রাম বাজানোকে 'নহর' বলা হয়। হাজার হাজার লোকেরা এই আওয়াজ নিয়ে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, পাথর দিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করলো—বর্ষার পর শত সহস্র পতঙ্গের মত অসংখ্য লোক হাজারে হাজারে বেরিয়ে এল। কত লোক যে গুলিতে মরলো। পরে জানা গিয়েছিল যে প্রায় তিনশ' লোক এই সংঘর্ষে মারা যায়! সৈন্যদেরও খুব ক্ষতি হল। পূকোট্টুরের এই সংগ্রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয়।

লোকেদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করবার জন্য পূকোট্টুরের সর্বত্র অসংখ্য মিলিটারীতে ভরে গেল। বিক্ষোভকারীরা জঙ্গলে আর পাহাড়ে লুকিয়েছিল। তাদের আত্মগোপনের জায়গা দেখিয়ে দেবার জন্য মিলিটারী স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য চাইল। যারা মিলিটারীকে সাহায্য করেছিল বিক্ষোভকারীদের রাগ তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। এই সময়েই হিন্দুদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ হয়।

বিক্ষোভকারীরা জঙ্গলের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধকৌশল অভ্যাস করছিল একথা শোনা গিয়েছিল। তারা কাছাকাছি জায়গাগুলোতে গিয়ে খাবারদাবার অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করে আনতো। লুকিয়ে থাকা বিক্ষোভকারী নেতাদের খবর দেবার জন্য তারা গুপ্তচরের ব্যবস্থাও করেছিল। পুলিশ আর অন্য সৈন্যদের হার মানতে হয়েছিল। শেষে সরকারকে গুর্খা সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। তাতে সরকার যে সময় নিয়েছিল তার মধ্যে বিক্ষোভকারীরা তাদের কাজকর্ম আরো একটু গুছিয়ে নিয়েছিল।

চেম্_শেরী তাঙঙ্ল ও তাঁর সহকর্মীরা পাণ্ডিকাট্ট বলে আর একটা জায়গায় বিদ্রোহের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। 1921 সালের নভেম্বর মাসে গুর্খা সৈন্যরা পাণ্ডিকাট্ট বাজারে ছাউনি পাতলো। তাঙঙ্লের প্রায় হাজার দুয়েক লোক বাজারের কাছে এসে সৈন্যদের ঘিরে ফেললো। ভোর প্রায় চারটের সময় তারা গুর্খাদের ঘিরে ফেলেছিল। তাদের অনেককে গুলি মেরে হত্যা করে, বাজারের পাঁচিল ভেঙে তার মধ্যে বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ল। সৈন্য হিসাবে গুর্খাদের নাম কে না জানে। মারকাটে তাদের সমকক্ষ খুব কম সৈন্যই আছে। জঙ্গলের যুদ্ধেও তারা বেশ নাম করেছে। বিক্ষোভকারীদের এই সব ট্রেনিং না থাকলেও তারা গুর্খা সৈন্যদের চেয়ে কম সাহস দেখায় নি। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষের ঘোর যুদ্ধ চলেছিল। প্রায় দুশ'র মত বিক্ষোভকারী এই গণ্ডগোলে মারা যায়। সৈন্য কত মারা যায় তা জানা যায়নি।

বিক্ষোভের সময় আরো কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল। এরনাড্ তালুকের একটা গ্রাম কোন্নারা। এই গ্রামের তাঙঙ্ল ঐ জায়গার মুসলমানদের প্রধান ছিলেন। মসজিদে সৈন্যরা ঢুকেছে এই খবর পেয়ে তাঙঙ্লের লোকেরাও গুলি চালাতে লাগলো। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। দু'পক্ষেরই খুব ক্ষতি হ'লো। সকাল হবার আগে তাঙঙ্ল তাঁর বাকী লোকদের নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে কালিকটের একটা পাহাড়ে কিছুদিন লুকিয়ে রইলেন। সেখানেও সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হ'লো। অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং তাঁর লোকদের মৃত্যু হওয়ায় তাঙঙ্ল ছদ্মবেশে অনেক দিন অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পরে তাঁকে অ্যারেস্ট করা হয়। মিলিটারী কোর্টে তাঁর বিচার হবার পর কোয়ম্বত্তুর জেলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

তিরুরাঙ্গাডির বিক্ষোভে কুঞ্জলবি এবং অন্য কয়েকজন বিক্ষোভকারী দুজন সৈন্যকে মেরে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। কিছুদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তারা কায়মঙ্গলের কাছে একটা মন্দিরে গিয়ে লুকোয়। সৈন্যেরা এ খবর পেয়ে সেখানে তাদের মুখোমুখি হয়। এই সংঘর্ষে কুঞ্জলবি মারা যায়। কুঞ্জলবি আমাকে

বলেছিল যে সে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মরবে। সেই ভাবেই সে মরলো। লবকুট্টি পরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

বিক্ষোভের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস আমি এখানে লিখতে বসিনি। বিক্ষোভের সময়ের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা এবং তাতে যারা ভাগ নিয়েছিল সেই সব নেতাদের সম্বন্ধে একটা ছোট্ট বিবরণ এটা। প্রায় 220টি গ্রামে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। এর এই ব্যাপ্তি, শক্তি আর স্থায়িত্বের কথা ভাবলে মালাবারের অন্যান্য বিক্ষোভের মধ্যে এর যে একটা প্রধান স্থান আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সৈন্যরা এই বিক্ষোভ দমন করতে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তা অবর্ণনীয়। তারা স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের কেটে ফেলেছে, বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সারা গ্রামে অত্যাচার চালিয়েছে। মিলিটারী আসার খবর পেয়ে যখন প্রাণ ভয়ে ভীত লোকেরা দৌড়ে পালাচ্ছিল তখন সৈন্যেরা তাদের বন্যজন্তুর মত হত্যা করে মেরে ফেলে। অপরাধী, নিরপরাধী, শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে কতদিন যে লুকিয়ে কাটিয়েছে তার হিসেব নেই।

সেই সময় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার ক্রূরতায় সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল।

1921 সালের 10ই নভেম্বর বিক্ষোভকারীদের নব্বুই জনকে বন্দী করে একটা ওয়াগনে করে কোয়ম্বত্তুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওয়াগনটি ছিল একটা লোহার বাক্সের মতো। তাতে বাতাস আলো কিছুই প্রবেশ করার উপায় ছিল না। সৈন্যরা বন্দুকের গুঁতোয় কয়েদীদের এর মধ্যে ঠেলে ঢুকোয়। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে গরম আর তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে তার ভেতরকার হতভাগ্য লোকগুলির করুণ চীৎকার সারা পথে শোনা যায়। তারপর আস্তে আস্তে তা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ওয়াগনের দরজা খুললে পর এক ভীষণ দৃশ্য দেখা গেল। ঠেসাঠেসি করে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে খামচে, কামড়ে ধরে চোখ গোল হয়ে বেরিয়ে আসা জিভ বার করা মৃত এবং অর্ধমৃত মানুষগুলি মল মূত্রে ভেসে পড়ে আছে। 64 জন ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বাকীরা মৃতপ্রায়।

অসহায় বন্দীদের ওপর এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কথা শাসনকর্তারা জনগণের কাছ থেকে চেপে রাখতে চেষ্টা করলেও পরের দিনই আমরা এখবর জানতে পেরেছিলাম। এই খবর মাদ্রাজের কাগজগুলিতে দেবার জন্যে আমরা কালিকট থেকে একজন কংগ্রেস কর্মীকে মাদ্রাজে পাঠালাম।

মালাবারে ছ'মাসেরও বেশী মিলিটারী শাসন জারী ছিল। বিক্ষোভকারীদের বিচারের জন্য একটা স্পেশ্যাল কোর্ট তৈরী করা হয় এবং এর জন্য বিশেষ আইনকানুনও করা হয়। বহু বিক্ষোভকারীকে ফাঁসি দেওয়া হলো। অনেককে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বহু লোককে দশ থেকে চোদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিক্ষোভের নেতাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিক্ষোভকারীদের শাস্তি দেবার সময় বিক্ষোভ শান্ত করার জন্য যে সব নেতারা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরও শাস্তি দেওয়া হ'ল। এঁদের মধ্যে ছিলেন কেলপ্পন, নারায়ণ মেনন। ময়তু মৌলভী, আবদুর রহমান, হাসান কয়া মোল্লা।

এখানে কে. ভি. বালকৃষ্ণ মেননের কথা একটু বলা উচিত। বালকৃষ্ণ পোন্নানীতে কংগ্রেসের কাজ করতেন। কংগ্রেসের নির্দেশ মতো পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে তিনি জনসাধারণের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। বিক্ষোভের প্রথমেই তাঁকে বন্দী করে কান্নুর জেলে রাখা হয়েছিল। তিনি সেখানেই অসুস্থ হ'য়ে মারা যান। কংগ্রেসের আদর্শ কাজে রূপ দেবার চেষ্টায় যাঁরা মালাবার থেকে বীর মৃত্যু বরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেকার প্রথম শহীদ তিনি। কেরলের কংগ্রেস কর্মীদের তাঁর নাম মনে রাখা উচিত।

অনেক মাস ধরে বিক্ষোভের ফলে কত লোক যে মারা যায় তার ঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি। দশ হাজারের কম নয় বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না। ছ'মাস পরে বিক্ষোভ থামলেও এই বিক্ষোভ যে ক্ষতি করেছিল তার পূরণ হ'তে অনেকদিন লেগেছিল।

ষোল

বিক্ষোভের পর

একটা ভয়ানক ঘটনার সাক্ষী যারা তারা যখন সেই ঘটনার বিবরণ দেয় তখন তাদের অজান্তে তাদের নিজের অভিপ্রায়, আবেগ সব কিছু এই বিবরণের মধ্যে এসে যায়। তখন আর সেটা এই ঘটনার প্রকৃত ছবি হয় না। ঘটনার অনেকদিন পরে সবরকম আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে যদি নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে সমস্ত ব্যাপারটা দেখা যায় তখন সেই ঘটনার অন্য একটা ছবি ফুটে ওঠে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, সম্পূর্ণ সত্যকে তার নগ্ন রূপে বাইরে বের করা সম্ভব নয়। এটা ইচ্ছে করে করা হয় না। আমাদের অজান্তে এরকম অপরাধ হয়ে পড়ে।

মালাবারের বেশ কয়েকবারের আন্দোলনের কথা ইতিহাসে বিশেষ করে লোগনের 'মালাবার ম্যানুয়েলে' বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব আন্দোলনের কারণগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। ইতিহাস লেখার সময় সেগুলোর সমালোচনা করা হলেও এই বইয়ে তার কোনো স্থান নেই। তবুও 1921 সালের আন্দোলনের কারণ যে কি ছিল তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। এই আন্দোলন পুলিশের অত্যাচারের ফলে গড়ে উঠেছিল। খিলাফত্ আন্দোলনকে পিষে মেরে ফেলার জন্য শাসনকর্তারা যে অকথ্য অত্যাচার করেছিল সেইটাই হচ্ছে এই আন্দোলনের প্রধান কারণ। এটা জমিদার আর তার রায়তের গণ্ডগোল বা মসজিদ নিয়ে বাদানুবাদ সেসব কিছু নয়। পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অহিংসা ধর্ম দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অত্যাচারকে অত্যাচার দিয়ে রোখার জন্য দেশবাসীরা দাঁড়িয়েছিল। এই আন্দোলন যেন বিদেশী শাসনকর্তাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল। এইটাই ছিল প্রধান কারণ। আন্দোলনকারীদের অন্য ধর্মের লোকেদের ওপর অত্যাচার করা বা মেরে ফেলার কারণ অন্য।

বিক্ষোভ যখন আরম্ভ হয় তখন বিক্ষোভকারীরা হিন্দুদের কোনো ক্ষতি করেনি। এরপর সৈন্যরা এসে যখন বিক্ষোভকারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগলো, তখন সমস্ত ব্যাপারটা অন্য রূপ নিল। বিক্ষোভকারীদের ধরার জন্য তারা হিন্দুদের সাহায্য চাইল। হিন্দুরা যদি মিলিটারীর আদেশ অমান্য করে তাহ'লে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে বলা হল। সৈন্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খুঁজে বের করার সময়

বিক্ষোভকারীরা প্রতিশোধ নেবার জন্য হিন্দুদের আক্রমণ করতো। এমনি ভাবে এই বিরোধ খুব শীঘ্রই সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিল। আর তখনই বিক্ষোভের জায়গাগুলিতে হিন্দুদের রক্ষা পাওয়া মুশকিল হ'য়ে উঠলো।

শাস্তির ভয়েই সাধারণ লোকে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে না। কিন্তু যেখানে কোনো শাসনব্যবস্থা নেই, যেখানে শুধু অরাজকতা ও অবাধ স্বাধীনতা, সেখানকার অবস্থার কথা কেউ কিছু বলতে পারে না। বিক্ষোভ আরম্ভ হবার কিছু পরে এইরকম অবস্থা এরনাড্ ও অন্যান্য জায়গাগুলোয় দেখা দেয়।

সরকারের ওপর তাদেয় ঘৃণার জন্যে বিক্ষোভকারীদের বেশীর ভাগ সরকারী শাসনকর্তা আর তাদের সাহায্যকারীদের ওপর তাদের আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শুধু এই ধরনের লোক ছিল না। হত্যা, মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা করা, জোর করে ধর্ম বদলানো এমন সব লোকও এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিল। সাধারণ সময়ে যে সব খারাপ কাজের কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না, সেই সব খারাপ কাজ আবেগ আর উত্তেজনার মুহূর্তে আমরা করে ফেলি। তখন দয়া, করুণা, ন্যায় অন্যায়, মান, সম্মান সব কিছুর কথা ভুলে যাই। আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা পশুটা এই সব অবসরে তার নগ্নরূপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যে কোন দেশেই জনতা গণ্ডগোলের সময় এই সব নীচ কাজ করে। বিক্ষোভের সময় এরনাড্ এবং অন্যান্য জায়গায় ঠিক এইটিই ঘটেছিল।

বিক্ষোভের রাশ টেনে ধরা অসম্ভব জেনে আমাদের পরের চেষ্টা হয়েছিল বিক্ষোভের জায়গাগুলো থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের থাকার এবং খাবার ব্যবস্থা করা। হাজার হাজার লোক তখন কালিকটে এসেছিল। আমাদের আবেদনের ফলে ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য আমরা পেয়েছিলাম। গান্ধীজী টাকা তোলার জন্যে সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছিলেন।

শরণার্থীদের থাকার জন্য তিন চারটে জায়গার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। রোজ তাদের আহার্য হিসেবে আমরা চাল বিলি করতাম। আহত ও রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সকাল থেকে দুপুর অবধি কংগ্রেস অফিসে রোজ একটা বিরাট জনতা এসে বসে থাকতো। প্রায় ছ'মাস ধরে এই শারণার্থীদের দেখাশোনা আমরা করেছিলাম। আমরা একটা রিলিফ ফাণ্ড খুলেছিলাম। তার থেকে বিক্ষোভের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সব লোকের পরিবারদের দরকার মত সাহায্য করা হয়েছে। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিল।

ভারত সেবা সঙ্ঘের নেতৃত্বেও ক্যাম্প খোলা হ'য়েছিল। শরণার্থীদের জন্য অনেক

কাজ তারাও করেছে। বিক্ষোভ শেষ হবার অনেকদিন পর পর্যন্ত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুনরুদ্ধারের কাজ চলেছিল।

শরণার্থীদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা মিলিটারী এবং বিক্ষোভকারীদের দ্বারা অত্যাচারিত হ'য়। কংগ্রেস এই সমস্ত শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা ঠিক মতো জেনে তাদের অভিজ্ঞতা সমস্ত লিখে রাখার চেষ্টা করে।

বিক্ষোভের জায়গাগুলোতে গিয়ে অনেকে দেখে এলো ঠিক ব্যাপারটা কি ঘটেছে। তারা এবং যারা ব্যাপারটা সঠিক জানে না তারাও সকলে মিলে প্রকৃত বাপারটার রং ঢং বদ্‌লে এমন করে বলতে আরম্ভ করলো যে তা শুনে লোকের এই বিক্ষোভ সম্বন্ধে নানারকম উলটো ধারণা জন্মালো। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে সমস্ত ব্যাপারটা অন্য ভাবে দেখতে আরম্ভ করলো। সত্যের সম্মুখীন হবার ইচ্ছা কারোরই ছিল না। বিক্ষোভকারীরা কেউ কেউ অন্য ধর্মের লোকেদের জোর করে ধর্ম বদলিয়েছে এই অভিযোগে খবরের কাগজে তীব্র বাদপ্রতিবাদ বেরোতে লাগল। কেউ কেউ ধর্ম বদলানোর ব্যাপারটার প্রতিবাদ করলো, কেউ কেউ আবার তাকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করলো। এই বাদ প্রতিবাদে কংগ্রেস একটি কথাও বলেনি। সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করা কংগ্রেসের কাজ ছিল।

—"বিক্ষোভের জায়গাগুলিতে ধর্ম বদলানোর কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে সে সম্বন্ধে কংগ্রেস সেক্রেটারী হয়তো কিছু বলতেন, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি বলে ধর্ম পরিবর্ত্তনের কথা একেবারেই বাজে কথা" এমনি ভাবে লেখা একজনের একটি চিঠি হিন্দু পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এর উত্তর সকলেই কংগ্রেস সেক্রেটারীর কাছে আশা করেছিল। কেরল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে আমার আর চুপ করে থাকা চলল না। আমার জানা কতকগুলি ব্যাপার আমি তখন বাইরে প্রকাশ করলাম। জোর করে ধর্ম বদলানোর খবর কেউ কেউ কংগ্রেস অফিসে এসে বলেছিল। সেটা আমি প্রকাশ করলাম। এটা পড়ে যে কেউ কেউ রেগে যাবেন এ আমি ভালো করেই জানতাম। 'হিন্দু' পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশ হবার পরের দিন যে ঘটনা ঘটেছিল তার কথা এখানে বলছি।

রাত প্রায় ন'টার সময় আমি আর আমার পরিবারের লোকেরা খাওয়া দাওয়ার পর কংগ্রেস অফিসের ওপরে বসেছিলাম। জ্যোৎস্না রাত। হঠাৎ উত্তর দিক থেকে একটা ঢিল এসে জানলার ওপর পড়লো। শব্দ শুনে চমকে উঠে ব্যাপারটা কি দেখতে ঘরের ভেতর যাবার সময় আর একটা ঢিল এসে বাড়ীর ওপর পড়ল। এমনি ভাবে চার পাঁচটা ঢিল পড়লো। নীচের অফিস থেকে চাতুকুট্টি নায়ার ছুটে এলো। 'কে' জিজ্ঞেস

করতে তার উত্তরে দুমাদুম ঢিল পড়তে লাগলো। একটু দূর থেকে দুটো তিনটে লোক একটা জায়গা থেকে ঢিল ছুঁড়ছে বলে মনে হলো। প্রায় মিনিট দশেক এমনি ভাবে ঢিল পড়তে লাগলো। ইতিমধ্যে আমাদের চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে পাড়া প্রতিবেশীরা বাইরে আসায় লোকগুলো ছুটে পালিয়ে গেল।

পরের দিন ডাকে আমার নামে কতকগুলো বেনামী চিঠি এল। জোর করে ধর্ম বদলানো হয়েছে বলে আমি কাগজে যে লেখা ছেপেছি তাতে আমাকে গালাগালি দিয়ে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে। তাতে আমাকে মেরে ফেলা হবে বলে ভয় দেখানোও হ'য়েছিল। সত্যি কথা বলে যে লেখা আমি লিখেছিলাম তাতে যে লোকে ক্ষুব্ধ হ'তে পারে তা জানার সুযোগ আমার ঘটলো।

এর বেশ কিছুদিন পরে রাজাগোপালাচারী কালিকটে এলেন। জনসভা করার ওপর তখনও নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। হিন্দুমুসলমান মৈত্রীর বন্ধন আবার দৃঢ় করার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজাগোপালাচারী এসেছিলেন।

রাজাগোপালাচারী কালিকটে আসার দিন সন্ধ্যাবেলায় কালিকটের সমুদ্রতীরে একটা জনসভা ডাকা হ'লো। রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে আমিও এই জনসভায় গেলাম। আমরা সভায় উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্দেশ্যে লোকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করলো। রাজাগোপালাচারীর পর আমি বক্তৃতা দিতে উঠলে মিনিট পাঁচেক তারা আমাকে একটা কথা পর্যন্ত বলতে দিল না। রাজাগোপালাচারী লোকেদের কাছে চুপ করে থাকার আবেদন জানালেও কোনো ফল হ'ল না। আমি কিন্তু ছাড়লাম না। বল্লাম।

—ধর্ম পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে 'হিন্দুতে' আমার একটা চিঠি পড়ে আপনারা ক্ষুব্ধ হ'য়ে এরকম ব্যবহার করছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে গালাগালি দিলে যা ঘটেছে সেটা মিথ্যে হ'য়ে যায় না। এ ঘটনা সত্যি হলে আর যেন এরকম ঘটনা না ঘটে সেইটাই দেখা প্রকৃত দেশপ্রেমিক আর সমাজসেবীর কর্ত্তব্য। আমি লোকেদের মুখ থেকে শুনে কিছু লিখিনি। যারা এমনিভাবে ধর্মপরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে তাদের দেখে সমস্ত কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে তা কাগজে লেখা উচিত বলে মনে করে এই কাজ আমি করেছি। এর জন্যে আমি অনুতাপ করছি না। আপনাদের এইরকম মনোভাব আমাকে সত্যিই বড় ব্যথা দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু লোকের এরকম হীন মনোভাবকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা উচিত।

আমার এই বক্তৃতার সময় খুব গোলমাল হচ্ছিল, মাঝে মাঝে আমার বক্তৃতা থামানোর চেষ্টা চলছিল। আমি আমার যা বলার ছিল তা একরকম প্রায় বলে শেষ

করলাম। যারা গোলমাল করছিল তারা অবশ্য আমার বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হ'লো না, তবে আমি আমার বক্তব্য খোলাখুলি বলতে পেরে খুশীই হলাম।

এর আগে আর এর পরে এই ধরনের কত অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। জনগণের কাজে যাঁরাই নেমেছেন তাঁদের সকলেরই এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। এর জন্যে আমাদের কারোর ওপরই রাগ করার বা দুঃখিত হবার কারণ নেই। কাউকে দোষ দেবারও দরকার নেই। এইসব কাজে অন্যদের বিরোধিতা ও ভুল ধারণা এড়ানো যায় না। এ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা ভালো করে জানি। কেউ আমাদের ঘৃণা করবে, কেউ ভালোবাসবে, কেউ বিরোধিতা করবে, সাহায্য করবে। এ সব উপেক্ষা করে অন্তরের ভেতর থেকে যে নির্দেশ আসছে তাকে অনুসরণ করলে, এগিয়ে গেলে ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকে। যদি একবার ভুল হ'য়ে যায়, তাহলে সে ভুলের সমাধানের পথ আমাদের খুঁজে বের করা সম্ভব।

ঠিক এমনি ভাবে যখন সৈন্যদের দোষগুলি, তাদের নৈতিক অবনতির কথা বলা হয়েছিল তখন গভর্ণমেণ্ট তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিল। মিলিটারীর অকথ্য অত্যাচারের বলি যারা হয়েছিল তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ঘটনা আমি রেকর্ড করে রেখেছিলাম। ফারোকের কাছে এক গর্ভবতী মুসলমান মহিলাকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মারা, একটি মুসলমান বালকের হাত পা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা, এই দুটি ঘটনা আমার কাছে ক্যাম্পে থাকা এই দুটি শরণার্থী বলেছিল।

বিক্ষোভ শেষ হবার বেশ কিছুদিন পরে সরোজিনী নাইডু কালিকটে এসেছিলেন। বিক্ষোভের সব খবর জানাবার সঙ্গে মিলিটারীর নিষ্ঠুরতার কথাও তাঁকে বল্লাম। উপরোক্ত এই ঘটনা দুটোর কথাও বল্লাম। সরোজিনী নাইডু বম্বে যাওয়ার পথে মাদ্রাজে নেমেছিলেন। সেখানে সমুদ্রতটে মিলিটারীর এই অত্যাচারের কথা তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন।

এর দু'দিন পরে মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট একটা প্রেস নোটে বল্লেন যে সরোজিনী নাইডুর কথায় কোনো সত্যতা নেই। মিলিটারীর অত্যাচারের কথাটা একেবারেই মিথ্যা। জনসাধারণকে ভুল ধারণার বশবর্তী করার জন্য ইচ্ছে ক'রেই একথা গুলো সরোজিনী নাইডু বলেছেন। তিনি যদি একথা গুলি প্রত্যাহার না করে নেন তাহ'লে তাঁর বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা প'ড়ে আমি হিন্দু পত্রিকায় এই ভাবে একটা উত্তর লিখে পাঠাই।

মালাবারের ঘটনার ব্যাপারে মিসেস নাইডু মাদ্রাজের জনসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা মিথ্যে বলে গভর্ণমেণ্ট বলেছেন। কিন্তু তাঁর একটি কথাও মিথ্যে নয়। এই সব

ঘটনার বিবরণ সরোজিনী নাইডুকে আমিই জানিয়েছি। যদি সরকার মনে করেন যে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন তাহ'লে আমার নামে তাঁদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, মিসেস নাইডুর নামে নয়। যে দু'টি লোক মিলিটারীর অত্যাচারের ভুক্তভোগী হয়েছে তাদের জবানবন্দী আর ফটো পাঠাচ্ছি। এটা দয়া করে ছাপাবেন এই অনুরোধ।

হিন্দু পত্রিকা এই চিঠিটি ছেপেছিল। এরপর গভর্ণমেণ্টের আর কোনো উত্তর দেওয়ার ছিল না।

দেশে মাঝে মাঝে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছিল তাতে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছিলাম। মনে খুব কষ্টও পেয়েছিলাম। "এই সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশ ছেড়ে যাবে না। এক বিষবৃক্ষের মতো এই সাম্প্রদায়িকতা তার কঠিন শেকড় গেড়ে বসেছে। একে উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও তা আবার গজিয়ে উঠবে এরকম কথা অবশ্য অনেকে বলেন। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। ভারতে নানা ধর্মের লোকের বাস। প্রত্যেকের নিজের নিজের ধর্ম বিশ্বাস পালন করা বা প্রচার করা কোনোটাতেই ভারত কোনোদিন বাধা দেয়নি। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিই হচ্ছে সহিষ্ণুতা। যদি আজ ভারতে এই সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক খারাপ হ'য়ে থাকে তা হচ্ছে দু'শ বছরের বিদেশী শাসনের ফল। সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে চলেছে কিন্তু আমাদের পুরোনো ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব নয়? যাদের মনে দয়ামায়া নেই সেসব লোক কি করে ধর্মকে ভালোবাসতে পারে? যাদের সহিষ্ণুতা নেই তারা নিজেদের মার্জিত, সভ্য বলে মনে করে কি ক'রে? এক ধর্মের লোক যদি অন্য ধর্মের লোকেদের ভালোবাসা আর বিশ্বাসের চোখে না দেখে তাহ'লে তারা সংস্কৃতির বড়াই করে কি ক'রে?

ঈশ্বর আর মানুষের সম্পর্ক এক এক সময়ে এক এক মহান ব্যক্তির চিন্তার বিষয় হয়েছে। এই সব দার্শনিক চিন্তা সমস্ত মানব সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হিসেবেই দেখা উচিত। উপনিষদে বলা হয়েছে—নানা রঙের গাভী হয় কিন্তু তাদের দুধ সাদাই হয়। 'ধর্মপ্রচারকদের গাভীর মত এবং দুধকে জ্ঞানের মতো ভাবতে শেখো' উপনিষদের এই উপদেশ এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত।

কতকগুলো মৌলিক সত্যের ওপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তা আমাদের ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হ'তে সাহায্য করে। ধর্মের নামে এই পৃথিবীতে কত শত যুদ্ধই না হ'য়ে গেছে। কত অত্যাচারই না ধর্মের নামে হয়েছে। 11শ শতাব্দী থেকে 14শ শতাব্দী অবধি ক্রিশ্চান আর মুসলমানেরা ধর্মের নামে অবিরত যুদ্ধ করেছে। 16শ আর 17শ শতাব্দীতে ক্রিশ্চান ধর্মের দুটি ভাগ প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং ক্যাথলিক সমানে

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লড়াই করেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও তেমনি ধর্মের নামে কত ঝগড়া কত দাঙ্গাহাঙ্গামাই না হ'য়েছে।

ধর্মচক্রবর্তী অশোক তাঁর এক অনুশাসনে বলেছেন,—সমস্ত ধর্মই কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধার যোগ্য। যদি কেউ অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে তাহ'লে সে নিজের ধর্মকেই ওপরে তোলে, অন্য ধর্মেরও মহিমা বাড়ায়। এই ভাবেই সে অন্য ধর্মের সেবা করে।

এই মত কাজ করলে মানুষের সমাজে কত পরিবর্তনই না হত। এর জন্য কি আমাদের চেষ্টা করা উচিত না?

সতের

রাজনীতির কাজে মন্দগতি

মালাবার বিক্ষোভের পরে বেশ কিছুদিন মালাবারে কোনোরকম রাজনৈতিক কাজ করার উপায় ছিল না। কংগ্রেসের ওপর লোকের বিরোধিতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। দেশের হর্তাকর্তারা এর ওপর বলতে লাগলো, খিলাফত্ আন্দোলনে অংশগ্রহণ ক'রে কংগ্রেস দেশে বিপদ ডেকে এনেছে। কোনো কোনো হিন্দু নেতারা যে সব কংগ্রেস কর্মীরা খিলাফত্ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তারা সমাজের শত্রু ব'লে গালাগালি দিলে, মালাবারের সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের ধরে জেলে পোরা উচিত বলে তারা অভিমত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি। এদিকে মুসলমানরাও অভিযোগ করলো যে কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য যারা তাদের উস্‌কে দিয়েছিল তারা মিলিটারী আর পুলিশের অত্যাচার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। এই সব কথা শুনে তখন আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের খুবই খারাপ লেগেছিল। কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেও কেউ কেউ ভুলে গিয়েছিল। বন্ধুরা দেখলেও যেন দেখেনি এমন ভাব করতো। কেউ কেউ আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত ভয় পেত। কোনো দরকারে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যত তাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় করতে পারলে বাঁচে বলে মনে হতো। বেশ কিছু কংগ্রেস কমিটি অকেজো হ'য়ে পড়ল। অনেক কংগ্রেস কর্মীদের বন্দী করা হলো। অনেকে কংগ্রেস ছেড়ে দিল। যারা বাকী রইল তাদের রোজকার খরচ জোটানোই মুশকিল হ'য়ে পড়ল। ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় অসহযোগ আন্দোলনের ফলে যে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তাতে মালাবারের কংগ্রেস কর্মীদের ওপর লোকের রাগ আরো বেড়ে গেল।

এই সময় রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ কালিকটে আসেন। বিক্ষোভের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে তিনি এসেছিলেন। কালিকটে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না, এমন মানুষ ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। বাঙালীদের মত ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে কালো লম্বা দাড়ি, হাতজোড় করা আর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তাঁর সেই স্বর্গীয় রূপ শান্তি আর সৌহার্দ্যের প্রতীক্ বলে মনে হয়েছিল। শুভ্র, উজ্জ্বল, কলঙ্কহীন এক চরিত্র। যেখানে সাধারণ লোকের কষ্ট হচ্ছে, যেখানে দাসত্বে, অজ্ঞানের অন্ধকারে মানুষের আত্মা হাহাকার করছে,

যেখানে মানুষ অত্যাচারিত, নির্যাতিত, সেখানেই অ্যাণ্ড্রুজ দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হ'তেন। জন্মে বৃটিশ হলেও ভারতবর্ষকে তিনি তাঁর মাতৃভূমি বলে মেনে নিয়েছিলেন। ভারতের নানা জায়গা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল, মালয়, মরিশাস প্রভৃতি দেশগুলিতে ভারতবাসীরা কেমন ভাবে রয়েছে, তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানার জন্যে, তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। যাতায়াতের খরচ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া সব ভগবান জুটিয়ে দেবেন। তাঁর ধর্ম হচ্ছে মানুষের সেবা করা, একথা অ্যাণ্ড্রুজ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে থাকতেন। সেখানে তিনি অধ্যাপকের কাজ করতেন। মহাত্মা গান্ধীর অসুস্থতার সময় অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। অ্যাণ্ড্রুজ এক সপ্তাহ কালিকটে থেকে বিক্ষোভের সব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নানা লোকের সঙ্গে দেখা ক'রে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কলকাতায় ফিরে গেলেন। আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—'পথ খরচের পয়সা আপনার আছে?'—"দু'টাকা আছে" ব'লে উত্তর দিলেন। তা শুনে রিলিফ ফাণ্ড থেকে তাঁর পথ খরচের জন্য আমি 200 টাকা দিলাম। সেদিন বেলা চারটের সময় শরণার্থীদের শিবিরে যাবার সময় "পয়সা কড়ি সাবধানে রেখেছেন তো?" আমি খোঁজ করলে পর অ্যানণ্ড্রুজ সাহেব খুব চমকে গেলেন।

—টাকাটা টেবিলের ওপর রেখেছি। বেচারী চাকরটা দেখলে যে কি প্রলোভনেই না পড়বে। চলুন আমরা ফিরে যাই।

আমরা গাড়ী ঘুরিয়ে ফিরে এসে দেখি টাকাটা টেবিলের ওপরই রয়েছে। টাকাগুলো বাক্সে রেখে চাবি দিয়ে আবার আমরা শিবিরে ফিরে গেলাম।

নিজের স্বার্থ না দেখে অপরকে ভালোবাসতে পারে এমন লোক কি পৃথিবীতে হয় নাকি? এমন সন্দেহ যদি কারো হয় তাহ'লে তাদের অ্যাণ্ড্রুজকে দেখা উচিত। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন, তখন আমার ছেলে উন্নিকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। উন্নি পরে শান্তিনিকেতনে দু'বছর পড়েছে।

বিক্ষোভ থেমে গেলেও তার জের তখনো থামেনি। আমার ওপর কালিকট মিউনিসিপ্যালিটির সীমার বাইরে যাবার নিষেধাজ্ঞা জারী করা হ'য়েছিল। চৌরীচোরার ভয়ানক ঘটনার পর গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। গান্ধীজীকে অ্যারেস্ট করা হলো। সারা দেশে একটা অনিশ্চিত অবস্থা। অসহযোগ আন্দোলনকে আবার বাঁচিয়ে তোলা অসম্ভব বলে অনেকে ভেবেছিলেন। গান্ধীজীকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে, তাঁর সেই ভাবে বিচার হবে এই খবর আমাদের মধ্যে

একটা ভীষণ আশঙ্কা জাগিয়ে তুললো। বিচারের আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমার ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকতে কালিকট ছাড়ার উপায় ছিল না। আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমার ওপর নিষেধাজ্ঞার সময় শেষ হ'য়ে আসছিল। আবার নিষেধাজ্ঞা জারী করার আগে কালিকট ছাড়া যায় কিনা আমি ভাবতে লাগলাম।

বোম্বের অনেক ব্যবসাদার সে সময় কালিকটে ছিল। কালিকট থেকে মাল নিয়ে জাহাজ মাঝে মাঝে বোম্বে যেত। হাজী রঙ্গিলা বলে একজন ব্যবসাদারকে আমার ইচ্ছের কথা গোপনে জানালাম। তিনি কথা দিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন। তাঁর জাহাজ শুকনো নারকোল নিয়ে যাচ্ছিল। মাল নিয়ে জাহাজ রওনা হবার আগে তিনি আমাকে জানালেন। আমার ওপর নিষেধাজ্ঞার অর্ডার সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে হাজির হ'লাম। হাজী রঙ্গিলা আমার জন্য একটা ছোট নৌকো নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার আগে আমরা জাহাজে চড়লাম। রাতে জাহাজ ছেড়ে পরদিন তালা শোরীতে জাহাজ কিছুক্ষণের জন্য থামলো। রঙ্গিলা আমার সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রেখেছিল। এমনি ভাবে পাঁচ দিন যাত্রার পর আমি বোম্বে পৌঁছোলাম। সেখানে রঙ্গিলার অতিথি হয়ে একদিন ছিলাম। পরের দিন আমি আমেদাবাদ গেলাম।

সেখানে গিয়ে পরের দিনই আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলাম। অনেক সর্বভারতীয় নেতারাও সেখানে এসেছিলেন। সেদিন আমি সবরমতী আশ্রমে ছিলাম। পরের দিন বিঠল ভাই প্যাটেল এসে আমার খোঁজ খবর করলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে আমি কয়দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। গান্ধীজীর কেসের দিন পড়েছিল 10ই মার্চ। এই মামলার বিচার আদালতে না হ'য়ে মুসাবারি বাংলোয় হয়েছিল। চারিদিকে অসংখ্য সৈন্য পাহারা বসানো হ'য়েছিল। বিরাট একটা জনতা বাংলোর কাছে এসে ভীড় জমিয়েছিল। জজ আসার একটু আগে গান্ধীজীকে সেখানে নিয়ে আসা হ'ল। হাঁটুর ওপর ধুতি পরা, হলের মধ্যে সেই কৃশকায় মানুষটিকে দেখবামাত্র সেখানকার লোকেরা সব উঠে দাঁড়ালো। গান্ধীজী একটা চেয়ারে বসলেন।

ঠিক বেলা 12টার সময় জজ এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মামলার বিচার আরম্ভ হ'লো। গান্ধীজীর অপরাধের একটা বিবরণ তাঁকে পড়ে শোনানো হ'লো। তিনি এই সব অপরাধে অপরাধী একথা গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই আদালতকে বল্লেন। তাঁর বক্তব্য তিনি একটি লিখিত জবানবন্দীতে জজের কাছে সমর্পণ করলেন।

বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের নগ্নরূপ এই সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেটমেণ্টে দেখানো হয়েছিল।

গান্ধীজী যখন এটি পড়ছিলেন তখন তাঁর গলার স্বর, মুখের ভাব আজো আমি ভুলতে পারি না। —'এই আদালত যে আইন চালু করতে চাইছে তা অন্যায়। আমি নিরপরাধী। যদি একথা বিচারক এবং অন্যান্যেরা মনে করে তাহলে এই অন্যায় কাজে তারা যেন ভাগ না নেয়। আর এই দেশের নিয়ম কানুন, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি এ দেশের ভালোর জন্যে করা হয়েছে আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাজকর্ম অপরাধজনক একথা আদালত যদি মনে করে তাহ'লে আমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হোক। এই দুটোর একটা না করে আদালতের পক্ষে এখন অন্য কোনো কাজ করা উচিত নয়' বলে গান্ধীজী তাঁর ষ্টেটমেণ্ট শেষ করলেন।

দু'মিনিট সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। জজ সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে বললেন—

—আপনার দেশের কোটি কোটি লোক আপনাকে একজন দেশপ্রেমিক বলে মনে করে। দেশের কাজে আপনার বিরুদ্ধপক্ষও আপনাকে একজন কর্মযোগী মহাপুরুষ বলে মনে করে। আপনাকে আমি কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘনের দোষে দোষী এবং সরকার বিরোধী কাজে লিপ্ত বলে দেখছি। বালগঙ্গাধর তিলককে যেমন এই অপরাধে ছয় বছরের বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আপনাকেও সে রকম দিলে সেটা যে খুব বেশী শাস্তি হবে তা আমি মনে করি না। দেশের অবস্থার পরিবর্তন হলে সরকারের যদি আপনার শাস্তি কম করার সুযোগ হয় তাহ'লে আমার চেয়ে বেশী খুশী কেউ হবে না।

জজ তাঁর জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আদালত ভাঙলো। মহাত্মাজীর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তাঁর সহকর্মীরা এগিয়ে গেলেন। আবেগে আর উত্তেজনায় নেতাদের অনেকে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সান্ত্বনা দেবার গান্ধীজীর প্রচেষ্টার কথা আমার এখনো মনে আছে। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে তিনি বল্লেন—'আমি সব ব্যবস্থা করেছি। তার জন্যে উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই।' আমার খরচের জন্য প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা গান্ধীজী আমাকে পাঠাতেন। সেই কথা তিনি এখন বল্লেন। এ সময় এ কথাও তিনি মনে করে রেখেছিলেন।

গান্ধীজীকে নিয়ে যেতে গাড়ী এল। তিনি তাতে চড়লেন, সঙ্গে সরোজিনী নাইডুও। যতক্ষণ দেখা যায় আমরা গান্ধীজীর গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই মামলার বিচার আমি 'The great trial' বলে আমার একটা ইংরিজী বইয়ে লিখেছি। স্বর্গত টি. প্রকাশম্ এই বই লিখতে আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই বইয়ের একটা কপিও আমার কাছে নেই।

সব শেষ হয়ে গেল, স্বাধীনতার যুদ্ধও শেষ হ'য়ে গেল, এমনি কথা অনেকে বলতে

লাগলো। এটা যে স্বাধীনতা যুদ্ধের আরম্ভ, শেষ নয়, সে কথা তারা বুঝতে পারেনি।

বোম্বে থেকে ফিরে এসে কংগ্রেস অফিস মাধবন্ নায়ারের বাড়ী থেকে কাল্লাই রোডের আর একটা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করলাম। আমার থাকার জন্য আর একটা বাড়ী নিলাম। সে বছর 1922 সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভা হয় গয়ায়। এই সভায় যোগ দেব বলে ঠিক করলাম। চাতুকুট্টি নায়ারও আমার সঙ্গে এলেন।

গয়ার পথে আমরা কলকাতায় নেমে তিনদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। শান্তিনিকেতনের সবকিছু অ্যাণ্ড্রুজ আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখালেন। ছেলেমেয়েদের প্রভাত সঙ্গীত, গাছের তলায় বসে তাদের পড়াশুনো, তাদের খেলাধূলো, আমোদ প্রমোদ, সবকিছু আমাদের কাছে খুব নতুন নতুন লাগছিল। লম্বা চুল আর লম্বা দাড়ি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি তাঁর পা পর্যন্ত লম্বা জোব্বা প'রে কখনো কখনো সে দিক দিয়ে হাঁটতেন। তখন ছেলেমেয়েরা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিত। সে দৃশ্য দেখতে এত ভালো লাগতো। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জায়গায় ব'সে ধ্যান করতেন সে জায়গাও আমরা দেখলাম।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ের যে স্মৃতি এখনো আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে তা হচ্ছে এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বসে তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ।

বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন। পাশে একটা বেতের চেয়ারে আমি। তাঁর ঘরে টেবিলের ওপর রাখা একটা হ্যারিকেনের আলো বারান্দায় এসে পড়েছিল। চারিদিক অন্ধকার ছিল বলে তাঁর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর নরম গলার আওয়াজ বেশ সুন্দর শোনা যাচ্ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনতে খুবই ভালো লাগছিল। শান্তিনিকেতন, সেখানকার বিদ্যাশিক্ষার কথা, বাংলার নৃত্যকলা ইত্যাদির বিষয়ে তিনি বলছিলেন। আধঘণ্টা ধরে এই সম্ভাষণ চলেছিল। পরের দিন আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি।

মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে, অ্যানি বেসান্তের ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে থাকার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এদের প্রত্যেকটি তাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমায় আকৃষ্ট করেছিল।

সবরমতী আশ্রমে যাঁরা থেকেছেন তাঁরাই জানেন, নিত্য কর্ম পালন, কঠোর নিয়ন্ত্রণ এর একটা বৈশিষ্ট্য। সকাল চারটের সময় উঠে সম্মিলিত প্রার্থনা, তারপর একটার পর একটা কাজ নিয়ম মতো করে যাওয়া, এই হচ্ছে সবরমতী আশ্রমের কাজ। আশ্রমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকলেও একটা শিল্পীসুলভ সৌন্দর্য তৈরী করার চেষ্টা এখানে

ছিল না। নানা বিষয়ে নানা বই পড়া, কৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলাপ আলোচনা করা, এসব দিকে আশ্রমের অধিবাসীরা তাঁদের সময় ব্যবহার করতেন না। হাতের কাজেই তাঁরা বেশী মনোযোগ দিতেন। তাঁরা সেখানে গ্রাম সেবার ট্রেনিং লাভ করেছিলেন। সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস রেখে জনসাধারণকে প্রাণমন দিয়ে সেবা করা এই ব্রতই ছিল সবরমতী আশ্রমের অধিবাসীদের।

অ্যানি বেসান্তের ব্রহ্ম মন্দির স্থাপিত করা হ'য়েছিল আডায়ারে অতিসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে। এখানকার সুন্দর সুন্দর গৃহগুলি, লাইব্রেরী, রঙীন ফুলে ভরা বাগান এই জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নানা জায়গা থেকে পণ্ডিত আর দার্শনিকেরা আডায়ারে এসে সমবেত হতেন। আডায়ারের সমস্ত পরিবেশ তাই কৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতায় ভরা। অ্যানি বেসান্তের সময় এই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের যা নাম ছিল এখন হয়তো তা নেই, তবু এই ঐতিহ্য এখনো সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য অন্যরকম। এখানে কলা, শিল্প, সৌন্দর্য এদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সূক্ষ্ম চারুকলার শিক্ষা দেওয়া হয়। বাইরের থেকে নৃত্যশিল্পীরা এসে মাঝে মাঝে তাদের নৃত্য প্রদর্শন করায়। ছাত্রছাত্রীরা এখানে অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথও কয়েকবার এদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এখানে বিদ্যা শিক্ষার একটা বড় অংশ কলা শিক্ষা। কলাবিদ্যায় এক একজনকে কৃতবিদ্য করে তোলাই শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা বিশ্বাস করে কলাবিদ্যাহীন জীবন অর্থহীন।

এক একটা প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ আর চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া। ওপরের বর্ণিত এই তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। শান্তিনিকেতন থেকে আমরা গয়ায় গেলাম। কেরলের প্রতিনিধিদের থাকার জন্য গয়ায় একটা বিশেষ শিবির খোলা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী জেলে থাকায় এখন কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কি, তাই নিয়ে সকলে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল।

কংগ্রেসের প্রোগ্রামে পরিবর্ত্তন আনা নিয়ে গয়ায় খুব তীব্রভাবে বাদানুবাদ চলেছিল। কংগ্রেসের দুটো মতের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যে খুবই কঠিন এটা ক্রমে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। একদলের মতে—দেশবাসী এখন আর একটা বড় অসহযোগ আন্দোলনের জন্য তৈরী নয়, আইন লঙ্ঘন এখনকার মতো বাদ দিয়ে আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ এর মধ্যে থেকেই আরম্ভ করা হোক। অপর দলের মতে গান্ধীজী যে পথ দেখিয়েছেন তার থেকে এক চুল সরার দরকার নেই। গয়ায় এই দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

সে বছর কংগ্রেস সভাপতি হ'য়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সর্বত্যাগী মানুষটির জীবন দেশপ্রেমিকদের মনে অদ্ভুত একটা প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। সে সময় তিনি মাসে কত টাকা যে উপার্জন করতেন তার কোন হিসেব ছিল না, কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের লক্ষ্য ছিল সরল জীবনযাপন আর দেশসেবা। চিত্তরঞ্জন তাঁর অদ্ভুত বাগ্মিতা, অতুলনীয় নেতৃত্ব এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে যে আন্দোলনেই নামতেন সে আন্দোলন নবজীবন পেত। কংগ্রেসের প্রোগ্রামে যাঁরা পরিবর্ত্তন আনতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের দলে। সভাপতির সুদীর্ঘ ভাষণে কংগ্রেসের কাজের কৌশল বদলানো উচিত বলে তিনি বলেছিলেন।

যাঁরা কংগ্রেসে কোনো পরিবর্ত্তন আনতে চাননি তাঁদের নেতা ছিলেন রাজা-গোপালাচারী। যাঁরা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা বল্লেন যে গান্ধীর ইচ্ছা এবং উপদেশানুসারে কংগ্রেস যে সমস্ত প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে সেগুলো যদি তাঁর অনুপস্থিতিতে উপেক্ষা করা হয় তা'হলে সেই মহান্ নেতার কাছে একটা বিরাট অপরাধ করা হয়। পরিবর্ত্তনবাদীরা বল্লেন যে সময়োচিত পরিবর্ত্তন আনলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম আরো এগিয়ে যাবে। কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠরা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ তখন তাঁর সমর্থকদের নিয়ে স্বরাজ্য পার্টি গড়েছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এই দলের আর একজন নেতা ছিলেন। স্বরাজ্য পার্টির আদর্শ পরে দেশের মধ্যে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল।

গয়ায় নিঃস্বার্থ দেশনেতাদের দেখার পর আমার মনে নানা চিন্তার উদয় হয়েছিল। দেশের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এইসব দেশ-নেতাদের চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কোন্ প্রেরণায়, কোন্ শক্তিতে তারা এমনিভাবে সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন, সে কথা ভাবতে গেলেই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো। বড় বড় কাজ অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবনের কথা ভুলে গিয়ে দেশসেবার জন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছেন—এই সেবার ফল যে শুধু পুলিশের অত্যাচার আর নির্যাতন তা সব জেনেও তাঁরা বার হয়েছেন। এই সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকদের কাহিনী সকলকে অভিভূত না করে পারে না।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর আমরা তীর্থ পরিভ্রমণে বেরোলাম। কাশী, প্রয়াগ, গয়া ইত্যাদি জায়গা ঘুরে দেখলাম। এই সব জায়গার অপরিচ্ছন্নতা, কুষ্ঠরোগী, ভিক্ষুক, তাদের নোংরা বেশভূষা দীনহীন চেহারা দেখে আমার খুবই কষ্ট হ'য়েছিল। পাণ্ডাদের

পয়সার জন্যে কাঙ্গালপনা দেখেও আমার খুব খারাপ লেগেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের এই শেকড়গাড়া নোংরা কুসংস্কার, আচার বিচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে যে কতদিন লাগবে একথা এখন আমি প্রায়ই ভাবি। আচার বিচারের অর্থ আর তার প্রয়োজনীয়তা না বুঝে তাদের অন্ধের মত অনুসরণ করা দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিতে বেশী ভেদ নেই।

উত্তর ভারত থেকে দেশে ফেরার আগে আমি বুদ্ধগয়া দেখতে গেলাম। বুদ্ধের পবিত্র নামের সঙ্গে জড়ানো একটি পুণ্যস্থান এটি। প্রতিদিন পৃথিবীর কতদিক্ থেকে কত লোক যে এই পুণ্যস্থান দর্শন করতে আসে। সিদ্ধার্থ এখানকার বোধিবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যান করতে করতে বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই বোধিবৃক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত আবেগে সমস্ত মনটা ভরে যায়। 2500 হাজার বছর আগে এই বৃক্ষের তলায় ধ্যাননিরত একাগ্রচিত্ত সেই স্বর্গীয় পুরুষটিকে আমি যেন এখন আমার মানসচক্ষে দেখতে পেলাম। আজ হাজার হাজার বছর ধরে কত শত মানুষ তাঁর কাছ থেকে শান্তি আর আনন্দ পেয়েছে। কতলোকের জীবনধারা বদলে গেছে, কত লোক তাঁর বাণীতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত মহৎ কাজ করেছেন। আজ পৃথিবীতে বুদ্ধের মতকে কোটি কোটি লোকে অনুসরণ করছে। করুণার প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধকে আমি আর একবার আমার নমস্কার জানালাম। এই সব মহাপুরুষেরা যদি না জন্মাতেন তাহ'লে এই পৃথিবীর অবস্থা কি হতো? বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, মুহম্মদ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছাড়া এ পৃথিবীর কথা চিন্তা করাও অসম্ভব।

আঠার

মাতৃভূমি পত্রিকার জন্ম

যে কোনো আন্দোলনকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে সবচেয়ে আগে দরকার একটি সংবাদপত্রের। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কালিকটে চারটি মালয়ালম কাগজ আর দুটো ইংরাজী কাগজ ছিল। 'কেরল পত্রিকা', 'মনোরমা', 'কেরলসঞ্চারী' ও 'মিতবাদী' এই চারটে ছিল তখনকার মালয়ালম কাগজ। সব কাগজগুলোই ছিল সাপ্তাহিক।

কুঞ্চিরাম মেনন 'কেরল পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি একজন নামকরা সম্পাদক ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের নাম পর্যন্ত শুনতে পারতেন না। তার কাগজে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আর অসহযোগীদের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত আক্রোশ ঢেলে দিতেন।

অত শক্ত ভাষায় না হ'লেও 'মনোরমা' কাগজটিও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে বের হ'লেও পরে মনোরমা সপ্তাহে তিনদিন করে বেরোচ্ছিল। কুঞ্চিকৃষ্ণ মেনন ছিলেন তার প্রথম সম্পাদক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই কাগজের ভার হাতে নিলেও মনোরমার নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

'কেরলসঞ্চারী'ও এই ধরনের পত্রিকা ছিল। সরকার বিরোধী কোনো খবর এর সম্পাদক গোবিন্দ নায়ার ছাপাতে পছন্দ করতেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি থাকলেও বাইরে তিনি তা দেখাতেন না।

'মিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক সি. কৃষ্ণন্ বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে না থাকলে ভারত অরক্ষিত একটি গৃহের মতো হ'য়ে দাঁড়াবে। তাঁর এই বিশ্বাসের ছাপ মিতবাদী পত্রিকায় ফুটে উঠতো।

ইংরাজী 'ওয়েস্টকোস্ট স্পেকটেটর', 'ওয়েস্টকোস্ট রিফর্মার' এই দুটি সাপ্তাহিক কাগজ কালিকট থেকে বের হ'তো। সুব্বারাও যতদিন স্পেকটেটর সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন ততদিন কাগজটি ভালোই চলেছিল। দেশের সমস্ত অবস্থা নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করতো এই কাগজটি। কিন্তু কাগজের এই নীতি তাঁর মৃত্যুর পর বদলে গেল। 'রিফর্মার' সাপ্তাহিকটির কোনো একটি বিশেষ মত ছিল না।

'মাতৃভূমি' যখন বার হয় তখন আরো দুটি সাপ্তাহিক দেশীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে

বার হ'য়েছিল। একটি হচ্ছে 'স্বরাট্' পত্রিকা, কুইলন্ থেকে এ. কে. পিল্লার পরিচালনায় বার হচ্ছিল। আর একটা সাপ্তাহিক 'যুব ভারত' পালঘাট থেকে কৃষ্ণস্বামী আয়্যার বার করেছিলেন। এই সাপ্তাহিকটির আকার গান্ধীজীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র মত ছিল। দেশীয় আন্দোলনের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এই সাপ্তাহিকটা বার করা হ'য়েছিল।

কৃষ্ণস্বামী আয়্যার প্রকৃতই গান্ধীবাদী ছিলেন। খাদির প্রচার আর অস্পৃশ্যতা নিবারণে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা অতুলনীয়। ওলভাকোটে হরিজনদের জন্য তিনি যে শবরী আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন তা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। "যুব ভারত"-এর প্রচার বেশী না হলেও গান্ধীজীর আদর্শ আর অসহযোগ আন্দোলনের বাণী জনসাধারণকে বোঝানোর জন্যে এই সাপ্তাহিকটি অনেক কাজ করেছে।

কংগ্রেসের প্রোগ্রাম বা কংগ্রেস কর্মীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কিছু লেখা কালিকটের কাগজগুলিতে দিলে তারা তা ছাপতে চাইত না। কোনো অভিযোগের উত্তর দিয়ে কিছু লিখে পাঠালে তারা তা গায়ে লাগাতো না। আমাদের বক্তব্য বিশেষ ভাবে ছেপে তা বিতরণ করার সুযোগসুবিধাও ছিল না। প্রেসের লোকেরাও এই সব ছাপাতে ভয় পেত। এই সব কারণে কখনো কখনো ত্রিচুর বা অন্য কোনখানে কংগ্রেসের কার্যাবলী ছাপানো হতো। কিছুদিন পরে এতেও অসুবিধা দেখা গেল। তারপর একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন কিনে তাতে কপি করে তা বিতরণ করবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই সময় একটা কাগজ বার করার প্রয়োজনীয়তা আমরা খুবই অনুভব করছিলাম।

প্রথমে আমরা 'নবীন কেরলম্' বলে একটা কাগজ বার করবো ঠিক করলাম। হোমরুল আন্দোলনের সময় অ্যানি বেসান্তের পরিচালনায় 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে যে কাগজ বার হ'ত 'নবীন কেরলম্' তেমনিভাবে অসহযোগ আন্দোলনের মুখপত্র হবে বলে আমরা ঠিক করেছিলাম। এই সময়েই মালাবার বিক্ষোভ শুরু হ'য়েছিল। তাই কাগজ বের করা তখন সম্ভব হ'ল না।

বিক্ষোভের পর গোপাল মেনন আর কুণ্ণুন্নি মেনন মাদ্রাজে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা 'নবীন কেরলম্' নামে একটি সাপ্তাহিক বার করলেন।

মালাবার বিক্ষোভের পর দেশের অবস্থা একটু শান্ত হলে একটা কাগজ বের করার আলোচনা আবার আমরা করতে লাগলাম। আমার আর মাধবন নায়ারের আবার ওকালতির কাজে ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না। বিপুল উদ্যমে কংগ্রেসের কাজ করার সময়ও সেটা ছিল না। তাই বেশ কিছুদিন ধরে একটা কাগজ বার করবার যে ইচ্ছে

আমাদের মনে ছিল তা এখন আরো প্রবল হ'ল। যে করেই হোক্ একটা কাগজ বার করবো বলে আমরা ঠিক করলাম।

মাধবন্ নায়ারের ভাই কেশবন্ নায়ার তখন কালিকটে প্র্যাকটিশ করছিলেন। তিনি আমাকে একদিন বল্লেন—আমরা যে কাগজ বার করবো ভেবেছিলাম, সে কাগজ ইতিমধ্যে বার হ'য়ে গেছে। এখন আর 'নবীন কেরলম্' নাম দেওয়া যাবে না। একটা ভালো দেখে নাম বের করতে হবে।

আমি বল্লাম—একটা নাম ভেবে রেখেছি, কিন্তু সেটা এখন বলবো না। সব কিছু ঠিক হ'য়ে যাবার পর বলবো। 'নবীন কেরলম্' বার হবার পর আমি অন্য কতকগুলো নাম ভেবে রেখেছিলাম—'দেশোদ্ধারিণী', 'স্বাধীনতার ডাক', 'অরুণোদয়' ইত্যাদি কিন্তু 'মাতৃভূমি' নামটা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য নামগুলো সব বাতিল ক'রে দিলাম। 'মাতৃভূমি' নামটা যখন কেশবন্ নায়ারের কাছে বল্লাম, তখন তাঁর এই নামটা খুবই পছন্দ হলো। এরপর মাতৃভূমি কোম্পানী রেজিষ্টার্ড করতে বেশী সময় লাগলো না।

পাঁচ টাকার শেয়ারে কুড়ি হাজার শেয়ার হোল্ডার অর্থাৎ একলক্ষ টাকার মূলধনের ওপর 1922 সালের 15ই ফেব্রুয়ারী মাতৃভূমি কোম্পানী কাজ আরম্ভ করলো। কে. মাধবন্ নায়ার ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। টাকা পয়সার হিসেব তিনি ঠিকমতো রাখতে পারতেন এবং কাজকর্মে ছিল তাঁর প্রচুর উৎসাহ। তবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং ম্যানেজার একজনের হওয়া সম্ভব নয় বলে এবং ম্যানেজার হিসেবে মাধবন নায়ারের কাজ অত্যন্ত দরকার বলে আমি পরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের পদ গ্রহণ করি।

কোম্পানী তো রেজিষ্টার্ড হলো, কিন্তু এই শেয়ার কেনার লোক পাওয়া খুব সহজ হ'লো না। কংগ্রেসের আদর্শ দেশের লোকের কাছে তুলে ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের সমর্থন আর সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে কাগজ বের করছি একথা আমরা কোম্পানীর স্মারক লিপিতে বলেছিলাম। কাজেই এই রকম কোম্পানীর শেয়ার নিতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করলো। যাদের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহানুভূতি ছিল তারা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তারা নানা ছুতোয় শেয়ার কিনতে রাজী হ'ল না। কত কথা যে তারা বল্ল।—'এসব কিছুই বেশী দিন চলবে না। এরকম কত কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হ'তে দেখলাম। এর গতিও সেই একই হবে। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে বেকার কতকগুলো লোক শেয়ার জোগাড় করতে এসেছে। এ কোম্পানীর শীঘ্রই লালবাতি জ্বলবে। তবে এঁরা কষ্ট করে এসেছেন কিছু না দিয়ে ফেরালে ভালো দেখায়-না।' এমনি সব বলে কেউ কেউ দুটো তিনটে শেয়ার কিনলেন। অবশ্য এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন। মালয়ালম কাগজ সম্পর্কে যাঁদের খুব

নীচু ধারণা এমন ক'জনের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। 'এই রকম বোকামি কি কেউ করে নাকি?'—এই ছিল তাদের মনোভাব। 'ইংরিজী কাগজ বের করবে বল্লে তার মানে বোঝা যায়। একটা মালয়ালম কাগজ বের করার জন্য কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করা, তার শেয়ার সংগ্রহ করা, এসব কি কেউ করে নাকি?'—এমনি তাদের কথাবার্তার ভাব। মালয়ালম কাগজ বার করা সম্বন্ধে একজন রসিক কবি যা বলেছিলেন তা আমার এখন মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন—'যাদের টাকা নেই, যারা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছে, যাদের কাজ নেই, যারা পরভৃতিকার মতো অপরের ওপর নির্ভর করে আছে, আর পরীক্ষাতে যারা ফেল করেছে এমনি পাঁচ রকমের লোক মিলে এই কাগজের সম্পাদক হ'তে চলেছে।'

কোম্পানীর জন্যে শেয়ার সংগ্রহ করতে যাবার সময় আমরা শেয়ারের অংশীদারদের বলেছিলাম যে তাঁরা যে টাকাটা দিচ্ছেন সেটা যেন তাঁরা চাঁদা হিসেবে দিচ্ছেন বলে মনে করেন। বম্বে, মাদ্রাজ, মালাবার, কোচীন এই সব জায়গায় শেয়ার সংগ্রহ করতে আমরা ঘুরেছিলাম। শেয়ার সংগ্রহ করার সময় অনেক মজার মজার অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। আমি আর মাধবন্ নায়ার একবার এক বন্ধুর কাছে শেয়ার জোগাড় করতে গেছি। এই বন্ধুটি আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বেশ ধনীও ছিলেন। তাই তাঁকে দশটা শেয়ার বিক্রী করবো বলে ভেবেছিলাম। নদী, জঙ্গল, ঝোপঝাড়, ধানখেত ইত্যাদি পার হ'য়ে একদিন দুপুরের শেষে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। বন্ধুর কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা আশা করা যায় তা তাঁর কাছে পেলাম না। হয়তো তিনি জানতে পেরেছিলেন আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যটা কি। আমি ভেবেছিলাম তাঁকে দশটা শেয়ার বিক্রী করবো কিন্তু তাঁর রকম সকম দেখে দুটো শেয়ার নেবার কথা বল্লাম। 'দেখি, ভেবে দেখি' বলে তিনি উত্তর দিলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে তখন বিদায় নিলাম। মাধবন্ নায়ারের মুখে রাগ আর হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ চলার পর মাধবন্ নায়ার মৌনতা ভঙ্গ করে বল্লেন:

—এমন সব বন্ধুদের কাছে আর যাবার ইচ্ছে আপনার আছে?

আমি শুধু বল্লাম— এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের আরো হবে।

ত্রিশ বছর পরে আমার এই বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়েছিল 1953 সালে আমার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে। তিনি আমাকে দেখেই, 'তোমার সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি বলতো? কতদিন ধরে ভাবছি যে তোমার সঙ্গে দেখা করবো'— বলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপরের প্রশ্ন—আচ্ছা আমাদের সর্বশেষ দেখা কবে হয় বলতো?

আমি বল্লাম,— আমি আর মাধবন্ নায়ার যখন তোমার কাছে মাতৃভূমির শেয়ার বিক্রী করতে গিয়েছিলাম তখন। মনে আছে? সেই আমাদের শেষ দেখা।

আমার একথা শোনার পর তাঁর মনে নিশ্চয়ই কতকগুলো অস্বস্তিকর স্মৃতি জেগে উঠেছিল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি কিছুই বল্লেন না।

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এই অভিজ্ঞতাটা হ'য়েছিল আমার এক ঘনিষ্ঠ ধনী নায়ার বন্ধুর কাছ থেকে। আমি আর টি. আর. কৃষ্ণস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এক ঘণ্টার বেশী আমরা নীচে অপেক্ষা করলাম। তিনি ওপরে ছিলেন। আমরা অধৈর্য হয়ে বাড়ীর ভৃত্যটিকে দেখতে পেয়ে তাকে বল্লাম যে আমরা ঐ বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, এ কথা তাকে একটু জানাতে। ভৃত্য এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল—

—"তিনি এখন চান করতে বেরোচ্ছেন। চান ক'রে মন্দিরে যাবেন। মন্দির থেকে ফিরতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আর একদিন আসতে তিনি বলে দিলেন।" আমরা আর একটি কথাও না বলে সেখান থেকে ফিরে এলাম। দু'দিন পরে ভদ্রলোকের স্নান, আহার, দিবানিদ্রা ইত্যাদি সারার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার ভালো সময় মনে করে বেলা চারটের সময় তাঁর বাড়ীতে গেলাম। আধঘণ্টার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি নীচে নেমে এলে পর আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে জানালাম।

—এ বছরের বাজেট আমার তৈরী হ'য়ে গেছে, শেয়ার নেবার কথা পরের বছর ভেবে দেখবো'—বলে তিনি বল্লেন।

—আমরা একটা খুব বেশী শেয়ার আপনাকে নিতে বলছি না, এই দশ পনেরটা নিলেই হবে।

—বাজেটের বাইরে কোন খরচ সাধারণতঃ আমি করি না।

বসে থেকে কোনো লাভ নেই দেখে আমরা উঠে পড়লাম। পরের বছর বাজেটে তিনি মাতৃভূমির শেয়ারের টাকাটা রেখেছিলেন কিনা জানতে পারিনি। এর দুবছর পরে যখন মাতৃভূমির কাটতি বেশ ভালো হচ্ছে তখন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়।

'কাগজ তো বেশ ভালোই চলছে— না? আমি নিয়মিত এই কাগজ পড়ছি—' একথা গুলো বলতে ভদ্রলোকের এতটুকুও বাধলো না।

শেয়ার না নিলেও ভদ্রলোক মাতৃভূমি পড়ছেন বলে আমি নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিলাম। কারোর কারোর অভদ্র ব্যবহার দেখে মনে হয়েছে শেয়ারের জন্য টাকা জোগাড় করতে না বেরোলেই হতো। তখন আমাদের মনে রাগ, দ্বেষ, হীনতা,

আক্রোশ, হতাশা কতরকমই যে কষ্ট গিয়েছে। এর আগে একটা কোম্পানীর শেয়ার জোগাড় আমি কখনোই করিনি, এর পরেও না।

কিছু টাকা পয়সা জোগাড় হবার পর একটা প্রেস কিনবো ঠিক করলাম। কেশব মেননের 'এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া প্রেস' নামে একটা ছাপাখানা আমরা তাঁর কাছ থেকে 15,000 হাজার টাকায় কিনলাম। সব দামটা একসঙ্গে দেবার মত পয়সা আমাদের ছিল না। সেদিনকার সেই ছোট্ট বাড়ীটা থেকে আজকের মাতৃভূমির এই বিরাট বাড়ীটি হয়েছে।

হাতে যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে তো প্রেস কেনা হ'লো, এখন কাগজ কেনার পয়সা চাই। টাকা জোগাড় না করে কাগজ বার করাটা খুবই সাহসের কাজ, আবার কাগজ বের না হ'লে টাকা জোগাড় করাও মুশকিল। তাই যেমন করে পারা যায় কাগজ বের করতেই হবে এইরকম কেউ কেউ বল্ল, শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ডাইরেক্টার বোর্ডের মিটিঙ-এর কথা আমার মনে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে টাকা জোগাড় করবার চেষ্টা আমরা করবো, কিন্তু তার জন্য কাগজ বার করতে দেরী করলে চলবে না। সম্পাদকের পদ আমি গ্রহণ করলাম। 1923 সালের 17ই মার্চ কাগজ প্রকাশ করার দিন ঠিক করলাম। এই দিনটি ঠিক করার একটা বিশেষ কারণ ছিল। 1922 সালের 18ই মার্চ গান্ধীজীকে ছ'বছরের জন্য সাজা দেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীকে শাস্তি দেবার এক বছর পূর্ণ হবার দিন মাতৃভূমি প্রকাশ করা ঠিক হবে বলে আমার মনে হ'য়েছিল। 18ই মার্চ ছিল রবিবার। তাই প্রথম কপি 17ই শনিবার বের করার ঠিক করেছিলাম। মাতৃভূমি প্রথম প্রথম সপ্তাহে তিনবার বেরোতে লাগল—মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার।

মাতৃভূমির প্রথম কপি আমার মানস চক্ষে আমি দেখেছিলাম। মাধবন্ নায়ার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এ নিয়ে অনেকবার আলোচনাও করলাম। আমার প্রথম সম্পাদকীয় লেখা তাদের পড়িয়ে শোনালাম। তারপর তা কাটছাঁট করে সুন্দর করা হ'ল।

16ই মার্চ সকালবেলা আমরা সবাই কাগজের অফিসে এলাম। মাধবন্ নায়ার আর আমার ঘর পাশাপাশিই ছিল। হাসিখুশী মাধবন্ নায়ার নীচে গিয়ে কম্পোজিটারদেয় কাজকর্ম দেখে ওপরে আসতেন। সকলের মধ্যে তিনি যেন উৎসাহের আমেজ ছাড়িয়ে দিচ্ছিলেন! কাল কাগজ বের হবে এখনো পর্যন্ত কিছুই তার ঠিক হয়নি এমনি অভিযোগ করে অচ্যুতন উকীল একটা লাঠি হাতে নিয়ে এদিক থেকে ওদিক বিচলিত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কর্মীরা, সাহায্যকারীরা, দর্শকেরা এমনি

বহু লোক সেদিন মাতৃভূমির অফিসে ভীড় ক'রেছিল। সন্ধ্যাবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর আবার আমি মাতৃভূমির অফিসে গেলাম।

দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমি এদিক ওদিক ঘুরছিলাম। ভোর চারটে তখন। চাতুকুট্টি মেশিন ঘোরাতে লাগল। আমরা বেশ কিছুক্ষণ তা দাঁড়িয়ে দেখলাম। কাগজের পাতাগুলো একসঙ্গে ভাঁজ করে প্রথম কপি মেশিনম্যান চাতুকুট্টি আমার হাতে দিল। আমি খুলে দেখলাম। এমনি ভাবে মাতৃভূমির জন্ম হ'লো।

মাতৃভূমির এই কপি নিয়ে আমি বাড়ী চল্লাম। সকাল হ'য়ে এসেছে। দু'একটা দোকান খুলেছে। সকালের গাড়ী ধরার জন্য লোকেরা খুব দ্রুত হাঁটছে। মাল নিয়ে গ্রামের ভেতর থেকে আসা গরুর গাড়ীগুলো একটার পর একটা লাইন করে আস্তে আস্তে চলছে। গাড়ীটানা গরুগুলো আর গাড়োয়ানগুলো একই ভাবে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। এরা কি মাতৃভূমির জন্মের কথা জানতে পেরেছে? এই চিন্তা আমার মনে একবার খেলে গেল।

বাড়ী পৌছে সকলকে ডেকে উঠোলাম। তাদের মাতৃভূমি দেখালাম। যেন একটি শিশু জন্মেছে এমনি ভাবে মাতৃভূমির প্রথম কপিটি দেখে তাদের আনন্দ হ'ল। আগের দিন সারাদিন আর সারারাত কঠিন পরিশ্রম করার ফলে খুব ক্লান্ত লাগছিল। সকাল হ'লেও আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম, মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ভুলে গিয়ে সুখনিদ্রায় ডুবে গেলাম।

উনিশ

সংবাদপত্রের শিক্ষানবিসি

পরের দিন সকালে মাতৃভূমি খুলে তার ভেতরের সব কিছু আর একবার খুঁটিয়ে দেখলাম। সম্পাদকীয়টা আর একবার পড়লাম। 'দেশের জনসাধারণের মঙ্গল মাত্র লক্ষ্য করে, সত্যকে অস্বীকার না করে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা জাতের জন্য এই কাগজ আমরা বার করিনি একথা মনে রেখে, মৌলিক অধিকারে সব মানুষই সমান এই বিশ্বাস নিয়ে স্বাধীনতার সমরে নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে আমরা কারোরই পেছনে নেই'—এই অংশটা পড়ার সময় কেরলীয়দের উদ্দেশ্য করে একটা পবিত্র পণ কি নয় বলে আমার মনে হ'লো। এই পণ পূর্ণ করতে মাতৃভূমি কোন ঔদাস্য বা ভীরুতা দেখায় নি। মাতৃভূমির দীর্ঘকালের ইতিহাসই এর সাক্ষী দেবে।

কাগজের নীতি আর উদ্দেশ্য কি তা বল্লেও সেটা কাজে পরিণত করা যে অত সহজ নয় এ অভিজ্ঞতা আমার প্রায়ই হয়েছে। মাতৃভূমি পক্ষপাতহীন কাগজ, মাতৃভূমির কারোর ওপরই বিদ্বেষ নেই, তাই মাতৃভূমির পাতায় সমালোচনা নির্ভয়ে এবং পক্ষপাতহীন ভাবে করা যাবে এইটেই আমার ইচ্ছে ছিল। জনসাধারণের যা জানা উচিত তার রং না বদলে তাদের সামনে রাখবো এই রকম আমি ভেবেছিলাম। মাতৃভূমি বার হবার দু'দিন আগে আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে একটা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে লোকে মাতৃভূমির আগমন প্রতীক্ষা করছে। একথাটা আমার প্রায়ই মনে হ'তো।

পত্রিকায় সমালোচনা করার ব্যাপারে গান্ধীজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া আমাদের আদর্শ ছিল। কাগজের রিপোর্টগুলি যাতে পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ হয় সেই মতো রিপোর্টারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কাগজের ব্যাপারে আমাদের কারোরই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কুন্তুণ্ণি মেনন মাতৃভূমিতে যোগ দেবার আগে অন্য দু'একটা কাগজে কাজ করলেও কাগজ বার করবার ব্যাপারে তাঁর খুব একটা অভিজ্ঞতা ছিল না। কিডাবো আর মাধব মেননেরও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। রাবুণ্ণি মেনন ছিলেন কাগজের সহ-সম্পাদক। তিনি খুব ভালো ইংরিজী লিখতেন। তখন পর্যন্ত মালয়ালমে একটা লেখাও তিনি লেখেননি। তাহ'লেও অল্প দিনের মধ্যে খুব সুন্দর মালয়ালম তিনি কারোর সাহায্য ছাড়াই লিখতে পেরেছিলেন।

এমনিভাবে কাগজের ব্যাপারে আমাদের খুব অভিজ্ঞতা কারোরই ছিল না, কিন্তু মাতৃভূমিকে একটা ভালো কাগজ হিসেবে চালানোর উৎসাহ আর ইচ্ছে আমাদের প্রবল ছিল। তাই আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা কিছু না ভেবে মাতৃভূমির জন্য কাজ করতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত ছিলাম। মাতৃভূমি প্রথম প্রথম বার হবার সময় এটার খুব দরকার ছিল।

রাতে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে অসুবিধে এবং অর্থব্যয় দুটোই হয় বলে ম্যানেজার কয়েকবার অভিযোগ করেছিলেন কিন্তু সহ-সম্পাদক রাবুন্নি মেনন তাতে গা লাগাতেন না। তিনি একটানা রাত 10টা অবধি কাজ ক'রে যেতেন। কখনো কখনো রাত দু'টো অবধিও কাজ করতেন।

মাতৃভূমির শৈশবে যে দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে হ'য়েছিল তার থেকে আমরাও কেউ বাদ পড়িনি। প্রতিদিন যে টাকা পাওয়া যেত তা কাগজ কেনার ষ্ট্যাম্প কেনার আর প্রেসের জন্য খরচ হ'য়ে যেত। এই সব খরচের পর আমাদের নিজেদের জন্য অল্প কিছু পাওয়া যেত। প্রায়ই খালি হাতে বাড়ী গেলে সেখানকার খরচ কি ভাবে চলবে সে সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পেতাম না। দু'তিনদিনের কথা হ'লে কিছু নয় কিন্তু বেশ কিছুদিন যদি এ ভাবে চলে তাহ'লে মন যে হতাশা আর নিরুৎসাহে ভরে যায় তা বলা বাহুল্য। এর সঙ্গে যোঝা খুব সহজ কথা নয়। অফিসে বসে কাজ করার সময় মাঝে মাঝে রান্নাঘরের কথা মনে হতো। তখন কলম হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতাম। তখন মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে, যে কোনও ভালো কাজের প্রারম্ভে বাধা বিঘ্ন থাকবেই। তবুও প্রায়ই যখন এমনি ভাবে বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'তো তখন এই সব দার্শনিক চিন্তা মন থেকে মুছে যেত। তখন মুখে একটা হাসি থাকলেও ভেতরটা ধূধূ করে জ্বলতো। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত এই দুঃখ কষ্ট কাগজ চালানোর ব্যাপারে এতটুকু বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। কাগজের প্রত্যেকটি সংখ্যা নির্ধারিত দিনেই বেরিয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাটি আগামী সংখ্যার চেয়ে ভালো করতে হবে, সব ভুলে গিয়ে এই আলোচনাই আমরা করেছি।

কিছুদিন পরে আমরা ঠিক করলাম, শুধু খবর দেওয়া নয়, যাতে পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমন চেষ্টাও মাতৃভূমি করবে। এর উপযুক্ত লেখাও আমরা ছাপিয়ে ছিলাম। এ ছাড়া 'পৃথিবী এবং এর মানুষেরা', 'কেউ কেউ, কিছু কিছু অভিযোগ এবং অভিপ্রায়' ইত্যাদি লেখাগুলোয় তখনকার দিনে এক নূতনত্ব ছিল। পাঠকরা এই লেখাগুলি খুবই পছন্দ করতো। সত্য, সমতা, স্বাধীনতা এই মুদ্রাবাক্যগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ওপর লেখা থাকতো।

মাতৃভূমির আদর্শগুলিকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টায় দেশের শাসনকর্তা এবং তাদের সমর্থকদের সঙ্গে মাতৃভূমিকে সবসময় লড়াই করতে হয়েছে। এর অনেক উদাহরণ মাতৃভূমি কাগজের ইতিহাসে আছে। এই সময় অর্থ, বাধাবিঘ্ন, দুঃখকষ্ট, সুবিধা অসুবিধা কোনো কিছুর কথা না ভেবে আমাদের আদর্শকে সামনে রেখে যে কাজ আমরা করেছিলাম সে কথা ভাবলে গর্বে আমাদের মন ভরে ওঠে।

একবার একজন সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন—'মুখে যা বলা যায় না, কাগজেও তা লেখা যায় না' কিন্তু ঘৃণা ও বিদ্বেষ না জাগিয়ে পক্ষপাতহীন নির্ভীক সমালোচনা করলে কাগজের প্রভাব বাড়ে এ অভিজ্ঞতা হ'তে আমার বেশী দেরী হ'ল না।

মাতৃভূমি বার হবার একবছর পরের একটি ঘটনার কথা এখানে বলব। কে. এম. নায়ার সেই সময় কাউন্সিল অফ স্টেটের মেম্বার ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়ান তখন আর একজন প্রার্থী গোপাল মেনন, নায়ারকে ভোট না দেবার কারণগুলো দেখিয়ে আমাদের একটা লেখা পাঠিয়েছিলেন, আমরা সেটা ছাপিয়েছিলাম। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল কাউন্সিল অব্ স্টেটে লবণের ওপর কর নিয়ে তর্কাতর্কির পর যখন ভোট নেওয়া হয় তখন নায়ার সেখানে ছিলেন না! এটা দেশের লোকের কাছে তাঁর একটা গুরুতর অপরাধ। জনগণের কল্যাণের ব্যাপারে তাদের অনুকূলে ভোট দেবার সময় সভায় না থেকে তিনি ভোটারদের বিশ্বাস হারিয়েছেন।

মাতৃভূমিতে এই চিঠি ছাপানো হ'লে পর কে. এম. নায়ার আমাদের এমনি ভাবে একটি চিঠি দিলেন:

—আপনাদের কাগজে একটি চিঠিতে আমি লবণ করের ব্যাপারে সরকার পক্ষে ভোট দিয়েছি এই মিথ্যে কথা এবং জনসাধারণের মনে কতকগুলো ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেবার জন্য আরো কতকগুলো কথা বলা হয়েছে। কয়েকজন ভোটার এটা পড়ে ভুল বুঝে আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। এটা খুবই গুরুতর ব্যাপার। তাই এই চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের কাগজে ছাপানো চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে যে সব দোষারোপ করা হ'য়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা একথা প্রমাণ সহ দেখানো আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে আপনাদের প্রকাশিত চিঠি প্রত্যাহার করে নিয়ে আমার প্রতি যে ভুল করা হয়েছে তার জন্যে ক্ষমা চাওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। যদি তা না করেন তাহ'লে এই চিঠি ছাপানোর জন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে আমি উচিতমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এর উত্তর আপনারা আমার উকীলের কাছে পাঠাবেন।

এই চিঠি তিনি অন্য আরো দুটো কাগজেও পাঠিয়েছিলেন। এই কাগজ দুটো

গোপাল মেননের চিঠিটা ছাপিয়েছিল। এই কাগজ দুটো সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে তা তাদের কাগজে ছাপালো। মাতৃভূমি কিন্তু এসব কিছুই করলো না। আমাদের কাগজ যে নীতি গ্রহণ করেছে তা যে সম্পূর্ণ ঠিক সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কেসের ভয়ে মাতৃভূমি তার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে কাগজে ছাপানো চিঠি প্রত্যাহার করে নেবে বা মাপ চাইবে এই দুটোর কোনটার জন্যেই প্রস্তুত ছিল না। একথা আমি নায়ারের উকীলকে জানিয়ে চিঠি দিলাম। সেই চিঠিটা মাতৃভূমিতে ছাপা হয়েছিল। সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

—1923 সালের 9ই অক্টোবর মাতৃভূমিতে ছাপানো একটা চিঠির ব্যাপারে আপনার মক্কেল কে. এম. নায়ার যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন আমরা তা পেয়েছি। গোপাল মেননের চিঠি আমাদের মিথ্যা বা অবাস্তব বলে মনে হয় নি। গোপাল মেননের চিঠিতে যে অভিযোগ মিঃ নায়ারের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেই অভিযোগগুলি খণ্ডন করে মিঃ নায়ার যদি তা আমাদের কাগজে প্রকাশ করতেন তাহ'লে আমরা অবশ্যই তা ছাপাতাম। তিনি যখন তা করেননি, তখন আমাদের কাগজে ছাপানো গোপাল মেননের চিঠি প্রত্যাহার করে নেওয়া বা চিঠি ছাপানোর জন্যে মাপ চাওয়া কোনোটার জন্যেই আমরা প্রস্তুত নই।

এর পর মিঃ নায়ার বা তাঁর উকীলের কাছ থেকে আমরা কোনো চিঠি পাই নি। আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কেসও দেওয়া হয় নি। এই সব দেখে অন্য দুটি কাগজ ভাবলো যে তাদের ক্ষমা না চাইলেই হতো। এই ঘটনায় মাতৃভমির মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি এ নিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন এবং এবং মুখেও জানিয়েছিলেন।

একজনকে ছোট করে অন্যজনকে বড় করা, এক সম্প্রদায়ের নিন্দে করা, অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা করার ব্যাপারে মাতৃভূমি কাগজে কিছু ছাপা হবে না এই বিশ্বাস জনসাধারণের মনে ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। এই ঐতিহ্যই মাতৃভূমি আজ পর্যন্ত রেখে আসছে।

দুটো কারণে অনেক সময় সম্পাদককে বিপদে পড়তে হয়। সে দুটোর একটা হচ্ছে নাম আর খ্যাতির লোভে কাগজে একটু জায়গা খুঁজে বেড়ানো কিছু লেখকের দৌরাত্ম্য। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাস্তব ঘটনাগুলোকে নিজেদের স্বার্থের জন্য লুকিয়ে রাখা এবং তা না ছাপানোর জন্যে সম্পাদকের কাছে আবেদন জানানো। এ বিষয়ে দু'একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলব।

একদিন দুপুরে কিছু রসীদ আর হিসেবের বই নিয়ে একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা

করতে এলেন। রসীদগুলো আর হিসেবের বই তিনি টেবিলের ওপর খুলে রাখলেন। একজন মন্ত্রী তাঁদের অঞ্চল পরিদর্শন করতে এলে তাঁর অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করেছিলেন। মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মাতৃভূমিতে যে রিপোর্ট ছাপা হ'য়েছে তাতে তাঁর নাম নেই বলে তিনি অভিযোগ জানাতে এসেছেন। এই আগমন উপলক্ষে সমস্ত ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করেছিলেন তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি রসীদ আর হিসেবের বই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। রাগে এবং হতাশায় ভরা তাঁর মুখখানি দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হলো।

—'আমার বিষয়ে কাগজে কিছু একটু লিখুন। আমার নাম কাগজে ছাপা হবে বলে নেতাদের কথামত এইসব খরচ করেছি'—তিনি খুব বিনীতভাবে বল্লেন। রিপোর্টারদের কাছে খোঁজ করবো বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিলাম। এই বেচারী লোকটি সব খরচ করেছেন একথা মাতৃভূমির রিপোর্টারের জানা ছিল না। জানা থাকলেও লেখা যেত না। তিনি টাকা পয়সা সব খরচ করলেন আর নাম পেল অন্যেরা।

আর একটা ঘটনা হচ্ছে, সম্প্রতি উত্তর ভারতের একটি দেবমন্দিরে বিনোবাজী হরিজনদের সঙ্গে ঢুকতে চেষ্টা করলে কেউ কেউ তাঁকে আঘাত করেছিল বলে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল সে কথা হয়তো পাঠকদের মনে আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম। এই চিঠির বক্তব্য হচ্ছে যে বিনোবাজীকে আঘাত করা হয়েছে এখবর কাগজে পড়ার পর চিঠির লেখক আহার করা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর চোখে ঘুম নেই। এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন এই খবরটা কাগজে ছাপলে তিনি বাধিত হবেন। এর সঙ্গে তিনি একটি ফটোও পাঠিয়েছিলেন, যাতে চিঠির সঙ্গে সেটা ছাপানো হয়। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর তাঁর চিঠি কাগজে না দেখে যে তাঁর কতটা আশাভঙ্গ হ'য়েছিল তা আমি বেশ অনুমান করতে পেরেছিলাম। তিনি নিশ্চয়ই কাগজ আর কাগজের সম্পাদককে একই ভাবে শাপ দিয়েছিলেন।

নাম এবং খ্যাতির মোহ সব মানুষেরই আছে। কারোর কারোর এর জন্য এত বেশী মোহ যে তা যেন তারা চেপে বন্ধ করে রাখতে পারে না। অবশ্য মানুষকে কাজে আকৃষ্ট করার একটা বড় প্রেরণা হচ্ছে এই খ্যাতির মোহ, কাগজের লোকেদের এটা জানা থাকা ভালো। মানুষের এই আগ্রহকে সন্তোষজনক ভাবে রূপ দেওয়া তাদের উচিত। তবে মানুষের অহঙ্কার, হামবড়াই ভাব বাড়াবার দায়িত্ব তাদের নয়।

নিজেদের সম্বন্ধে কিছু খবরের কাগজে দেখার যাদের খুবই ইচ্ছে তাদেরই মধ্যে আবার কিছু কিছু ব্যাপার লুকিয়ে রাখার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এইরকম অনেক ঘটনার কথা আমার জানা আছে। একটার কথা এখানে শুধু বলবো।

আমাকে জরুরী একটা খবর দেবার জন্য আমার এক বন্ধু একটি লোককে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইনি একজন মান্যগণ্য লোক। তাঁর ছেলেকে পুলিশ একটা কেসে ধরে, পরে জামীনে ছেড়েছিল। এই খবর কাগজে বেরোলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর হবে। এই খবর অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য যেন প্রকাশ না করা হয়, এই অনুরোধ জানাতে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। এতবড় একজন মানীলোকের পুত্র একটা নীচ কাজে ধরা পড়েছে এ খবর কাগজে বের হলে তাঁর কতখানি যে সম্মান হানি হবে আমি তা বেশ ভালোই বুঝতে পারলাম, কিন্তু এই খবর চেপে রাখার উপায়ও আমার ছিল না। এই কথা আমি তাঁকে জানালাম।

কাগজে কোনো খবর ছাপানো উচিত কি উচিত না তা ঠিক করার জন্য দুটো জিনিষ দেখতে হয়। একটা হচ্ছে খবরটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, আর একটা হচ্ছে খবর হিসেবে তার প্রাধান্য আছে কিনা। এই খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না এবং ভদ্রলোকের পদমর্যাদার কথা ভাবলে খবরটির যে প্রাধান্য আছে সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই সেই খবর পাঠকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখাটা একেবারেই ঠিক নয়। আমি যে কি করবো তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিনা আমি জানি না। জার্নালিস্টদের এই ধরনের কতকগুলো অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যাবার কোনো উপায়ই নেই।

যতই সাবধান হওয়া যাক না কেন, ছাপানোর অযোগ্য কিছু খবর আর মতামত কখনো কখনো কাগজের পাতায় বেরিয়ে যায়। এ সব খবর ছাপানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগও সম্পাদকদের নেই। এটা সত্যিই খুব দুঃখের কথা!

মাতৃভূমির সম্পাদকের কাজ করার সময় কেরল কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হিসেবেও আমি কাজ করছিলাম। কিন্তু মালাবার বিক্ষোভের পরে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ করার খুবই অসুবিধা ছিল, খুশী মতো ঘুরে বেড়ানোর বা সভা করার সুবিধা ছিল না। শুধু তাই নয় বিক্ষোভের সময় জনসাধারণের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হ'য়েছিল তার থেকে তারা তখনও মুক্ত হয় নি। এ সব সত্ত্বেও কেরল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসাবার সিদ্ধান্ত আমরা নিলাম। 1923 সালের 6ই মে পালমাটিতে এই অধিবেশন বসে। তখন মাতৃভূমি প্রকাশ হবার ছ' সপ্তাহ মাত্র কেটেছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই অধিবেশনের সভানেত্রী হ'য়েছিলেন। আলি সহোদরদের মা, রাজাগোপালাচারী, দেবদাস গান্ধী এঁরা সব এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা ওলাভাকোট্টু আমার বাড়ীতে ছিলেন। অধিবেশনের প্যাণ্ডেল বাঁধা হ'য়েছিল একটা ধানখেতের উপর। সভার দিন দূরের পাহাড়গুলি দেখে

সরোজিনী নাইডু বলে উঠলেন— বাঃ কি সুন্দর দৃশ্য! এই অপূর্ব দৃশ্য দেখলে কার মনে না কবিত্বের সঞ্চার হয়?

সেদিন সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা একটি কবিতার আকারে বেরিয়েছিল। কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন। তখনকার প্রধান সমস্যা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধের সমালোচনা করে, ভারতবর্ষের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ তাঁর সহজসিদ্ধ বাগ্মিতা দিয়ে শ্রীমতী নাইডু করেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সরোজিনী নাইডুর জায়গা খুবই উঁচুতে। তাঁর বাগ্মিতা মাত্র এর কারণ নয়। তাঁর অটল দেশপ্রেম, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার, সমস্যাগুলোকে পক্ষপাতহীন ভাবে বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণগুলির জন্য সরোজিনী নাইডু ভারতবাসীর অতি শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। যে কোনও জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর মনের সৌম্যভাব নষ্ট হ'ত না। মহাত্মা গান্ধী সবরমতী জেলে থাকার সময় সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জেল গেটে পৌঁছোনোর পর বিরাট দরজার একদিক মাত্র জেলরক্ষী খুলে রেখেছিল। এইটাই সাধারণ নিয়ম।

—এর মধ্যে দিয়ে মহিলারা কি ক'রে যাবে? দরজা সমস্তটা খোল—সরোজিনী নাইডু এ আদেশ দিলে পর জেলরক্ষক জেলের নিয়মকানুন তখনকার মত ভুলে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল।

এই অধিবেশন সফল হবার আর একটা কারণ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মা বৃদ্ধা বিউম্মার এই কনফারেন্সে যোগদান। হাঁটতে পর্যন্ত তাঁর কষ্ট হচ্ছিল তখন। তথাপি দূর দূরান্ত সঞ্চার করে সভাগুলিতে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তি তিনি বাড়িয়ে ছিলেন।

রাজনৈতিক সভা শেষ হবার পর একটা সাহিত্য সম্মেলনও হয়। তাঁর সভাপতি ছিলেন সর্দার কে. এম. পাণিক্কার।

অধিবেশনের শেষের দিন প্যাণ্ডেলে সব জাতের লোক মিলে একটা মিশ্র ভোজ খাওয়া হয়। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, নায়ার, নাম্বাণ্ডি সকলে এতে যোগ দিয়েছিল। এই মিশ্র ভোজের ব্যাপারে কয়েকজন পরে খুব মুশকিলে পড়েছিল। উঁচু জাতির কিছু লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'য়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে আবার গোলমাল হ'তে পারে সে রকম ভয়ও ছিল। সে যাই হোক, পালঘাটের এই অধিবেশন রাজনীতি আর অস্পৃশ্যতা নিবারণে একটা নতুন জাগরণ আনতে সক্ষম হ'য়েছিল।

কুড়ি

বৈকম সত্যাগ্রহ

কেরলের কংগ্রেসকে যখন নতুন করে জাগিয়ে তোলার কথা ভাবছি তখন একদিন 'দেশাভিমানীর' সম্পাদক টি. কে. মাধবন্ নায়ার আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কালিকটে এসে উপস্থিত হ'লেন। নিঃস্বার্থ সমাজসেবী হিসাবে শ্রীমাধবনের কথা না জানতেন এমন লোক কেরলে খুব কম ছিল। দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করার জন্য সমাজে তাঁর একটা উঁচু স্থান ছিল। 'সম্পাদক' এই নামে অনেকে তাঁকে ডাকতো। তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর আন্তরিকতা এবং রসপূর্ণ কথাবার্তা তাঁর বিরুদ্ধ দলকেও খুশী ক'রে তুলত। তিনি নিজে যেমন উৎসাহী ছিলেন অন্যদের মধ্যেও তাঁর এই উৎসাহ সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন। তাঁর মতো উদার হৃদয়, বন্ধুবৎসল লোক খুব কমই দেখা যেত। তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ দিয়েছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে, তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সময় তিনি পান নি। কংগ্রেস যখন অস্পৃশ্যতা নিবারণ একটা প্রোগ্রাম বলে গ্রহণ করলো তখন কংগ্রেসের কাজে তিনি উৎসাহ দেখাতে আরম্ভ করলেন। অস্পৃশ্য জাতির সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর করে তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা উচিত একথা তিনি মনে করতেন। তিনি শ্রীনারায়ণ গুরুকে নিজের আধ্যাত্মিক গুরু বলে মানতেন। নারায়ণ গুরুর উপদেশ আর আদর্শকে কাজে রূপায়িত করতে তিনি নিরন্তর চেষ্টা করতেন। মহাকবি কুমারন্ হাসানের কথায় যাদের ছোঁয়া যায় না, যাদের কাছে যাওয়া যায় না, তারা চোখে পড়লেও দোষের। বিবাহবন্ধনে যারা বাঁধা পড়ে না, যারা একসঙ্গে খায় না— এই ভাবে কত রকমই যে জাতের বোকামি আছে। আজকের যুগের লোকদের এই কথাগুলো বুঝতে মুশকিল হবে। এই কুপ্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করতে প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়েছিলেন এই সাহসী সম্পাদক মাধবন্।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ নিয়ে আমরা অনেক কথা সেদিন বলেছিলাম। মাধবন্ নায়ারের চরিত্রে উদ্দেশ্য এবং কাজের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আমি আর কারো মধ্যে পাইনি। এরপর বেশ কয়েকটি আন্দোলনে আমরা ভাগ নিয়েছিলাম। সেদিনকার সেই পরিচয় খুব দ্রুত গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। একঘণ্টা কথা বলার পর তিনি বিদায় নিলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে কাকিনাড়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে।

মাধবন্‌, সর্দার কে. এম. পাণিক্কর এবং আমি এই তিনজন মিলে মাদ্রাজ থেকে কাকিনাড়ায় যাই। পাণিক্কর সে সময় 'স্বরাজ্য' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। পাণিক্কারের গল্প আর মাধবনের হাসিঠাট্টা আমাদের ভ্রমণপথের সব ক্লান্তি দূর করেছিল। এই সময় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলানা মুহম্মদ আলি। মাধবন্‌ এই অধিবেশনে 'ভারতে অস্পৃশ্য জাতির জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে আবেদন' বলে একটা লেখা লিখে তার কপি ছাপিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি, কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের, কাগজের প্রতিনিধিদের দিয়েছিলেন। মাধবনের এই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অস্পৃশ্যতা নিবারণী কাজকর্ম আরো জোরদার করার নির্দেশ কংগ্রেস রাজ্য কমিটিগুলোকে দেবার সিদ্ধান্ত করেছিল।

মৌলানা মুহম্মদ আলি এবং তাঁর ভাই মৌলানা শওকত আলি সেসময় কংগ্রেসের দুটি সুদৃঢ় স্তম্ভের মত ছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ মিত্রও ছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কংগ্রেসে এসেছিলেন।

কাকিনাড়া কংগ্রেসের পর মাধবন্‌ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ওখান থেকে ফিরে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলো আমরা কাজে পরিণত করতে একটুও দেরী করিনি।

1924 সালের 24শে জানুয়ারী এর্ণাকুলমে আহূত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় অস্পৃশ্যতা নিবারণ একটা জরুরী প্রোগ্রাম হিসাবে নিয়ে তাকে কার্যকরী করার জন্য একটা বিশেষ কমিটি গঠন করা হ'ল। কংগ্রেসের কার্যাবলী জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যে কেরলের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করার জন্য আর একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। আমাকে নিয়ে এই কমিটির সভ্য সংখ্যা ছিল বারজন। ত্রিবাঙ্কুরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত, শহরে, গ্রামে ঘুরে ঘুরে বিরাট বিরাট জনসভায় আমরা বক্তৃতা করেছিলাম। সে কি উত্তেজনাময় দিনগুলোই না গেছে। রোজ তিনটে করে সভা এক এক জায়গায় ডাকা হতো। কোনো কোনো দিন তারও বেশী। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণ এই সব সভায় যোগ দিয়েছিল। চব্বিশ দিন ধরে এই দীর্ঘ পর্যটনে বেশ কয়েকটি মজার অভিজ্ঞতা আমাদের হ'য়েছিল।

একদিন রাতে এক জনসভার পর আমরা আমাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তার বাড়ীতে এলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন খাবার জন্যে আমাকে এক গ্লাস দুধ আর কলা এনে দিলেন। দুধ আর কলা খেয়ে আমি সেখানে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লাম। তারপর চান করে রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত দশটা বেজে গেছে। রাতের খাবারের কোনো আয়োজন দেখলাম না। আমার তখন খুবই খিদে পেয়েছে। কি ব্যাপার খোঁজ করব ঠিক করলাম। 'খাবার কি অনেক

দেরী আছে ?' একথা জিজ্ঞেস করতে আমার অতিথি সেবক চমকে উঠলেন। 'রাতে দুধ আর কলা খাবেন বলে ভেবেছিলাম'—অতিথি সেবকের হ'য়ে একজন বল্লেন। 'দুধ আর কলা আমি খাই'—কিন্তু সে'তো ভাত খাবার পর—আমি একথা বলার পর ভদ্রলোক হাসলেন। খুব তাড়াতাড়ি খাবার তৈরী করে আনলেন। অন্যেরা যা খায় দেশসেবকেরা তা খায় না এই তারা ভেবেছিল।

খাওয়া দাওয়া, বেশভূষা, আচার ব্যবহারে একটা বৈশিষ্ট্য তখনকার কিছু কিছু কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে দেখা যেত। সাধারণ লোকের মত তাদের কাপড় পরা, খাওয়া দাওয়া, আচার ব্যবহার কিছুই নয় এই সব কথা অনেকে তখন বিশ্বাস করতো। সেই সেই বিশ্বাসের জন্য আমাকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়।

আমাদের ভ্রমণ সূচিকা অনুযায়ী 1924 সালের 28শে ফেব্রুয়ারী আমরা ভৈকমে উপস্থিত হলাম। সেখানে পৌছে আমরা জানতে পারলাম যে ভৈকমের মন্দিরের সামনের সরকারী রাস্তা দিয়ে অস্পৃশ্য জাতির লোকেদের হাঁটাচলা নিষিদ্ধ। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ভৈকমে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এ নিয়ে তীব্র নিন্দা করে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।—'বিদেশীরা আমাদের ওপর যখন অন্যায় করে তখন তার প্রতিবাদ আমরা করি আর যখন আমরা আমাদের দেশবাসীর ওপর অন্যায় করি তখন তার প্রতিবাদ করতে আমরা এগোই না কেন ? অস্পৃশ্য জাতিদের প্রতি এই অন্যায় প্রতিরোধ করার দায়িত্ব কি আমাদের নয় ?'—একথা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে খুব হাততালি পড়তে লাগলো। 'হাততালি দিতে অসুবিধা নেই, কিন্তু কাজ করতে গেলেই যত গোলমাল আরম্ভ হবে। অস্পৃশ্য জাতিদের সঙ্গে একসঙ্গে মন্দিরের রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবার জন্যে এখানকার সম্মিলিত জনতার ক'জন রাজী আছেন ?'—একথা আমি জিজ্ঞেস করলে পর 'সকলে' 'সকলে' বলে জনতা চীৎকার করলো। 'তাহ'লে কালই আমরা এই শোভাযাত্রা করবো' বলার পর পাঁচ মিনিট ধরে হাততালি চললো। সেদিন সেই সভা থেকে সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে ফিরে গেল।

সভার পর আমি আমার বিশ্রামস্থলে ফিরে এলে সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট, তহশীলদার, পুলিশ অফিসার শহরের মান্যগণ্য লোক প্রভৃতি অনেকে জড়ো হয়েছেন দেখতে পেলাম। সভায় আমার ঘোষণা অনুযায়ী পরদিন অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে মন্দিরের রাস্তা দিয়ে শোভা-যাত্রা বের করলে তাতে ভীষণ গণ্ডগোল, রক্তপাত ইত্যাদি হবে। তাই এইসব না করে মাস খানেক ধরে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা উচিত বলে তাঁদের মধ্যে অনেকে আমায় বল্লেন। সেই রকম করা হবে বলে ঠিক করে আমরা কালিকটে ফিরে এলাম।

ভৈকম মন্দিরের সামনের সরকারী রাস্তা সকল জাতের লোকেদের জন্য খুলে দেওয়া

উচিত বলে আমরা আমাদের আন্দোলন শুরু করলাম। এর জন্য আমরা নানা জায়গায় সভা সমিতি করলাম। ছোট ছোট পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম। নেতাদের সঙ্গে দেখা করে আলাপ আলোচনা চালালাম। খবরের কাগজের সমর্থনও পেলাম। কিন্তু এত কিছু করার পরও মন্দিরের পরিচালকেরা তাদের নিয়মের এতটুকু রদবদল করতে চাইলেন না। সত্যাগ্রহ ছাড়া এই রাস্তায় সকল জাতের চলার স্বাধীনতা মিলবে না বুঝে আমরা সত্যাগ্রহ করবো বলে ঠিক করলাম।

তার আগে গান্ধীজীকে ভৈকমের অবস্থা সম্বন্ধে এবং এই অবস্থা কি ভাবে আমাদের সত্যাগ্রহের পথে ঠেলে দিয়েছে তা সব জানিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টায় তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে একটা চিঠি পাঠালাম। তার উত্তরে গান্ধীজী যা লিখেছিলেন তা নীচে দিলাম—

আন্ধেরী

প্রিয় কেশব মেনন, 19-3-24

আপনার চিঠি পেলাম। আপনাদের ঐ জায়গার অধিবাসীদের অবস্থা ভারতের অন্যান্য জায়গার অধিবাসীদের তুলনায় সবচেয়ে শোচনীয় তা আমি জানি। আপনি যেমন বলেছেন যে এই অস্পৃশ্য জাতিদের শুধু ছোঁওয়া যায় না মাত্র নয়, তাদের কতকগুলো রাস্তা দিয়ে হাঁটা পর্যন্ত বারণ। এতই শোচনীয় অবস্থা তাদের। আমরা যে এখনো স্বাধীনতা পাইনি তাতে আমি খুব আশ্চর্য বোধ করছি না। আমাদের নিজেদের দেশবাসী এই অধঃপতিত জাতিদের সরকারী রাস্তা ব্যবহার করার দাবী তুলে ধরবার জন্য নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়ে একটা শোভাযাত্রা বার করবেন বলে আপনারা ঠিক করেছেন। এটা একরকমের সত্যাগ্রহ। এই বিষয়ে আপনাকে বিশেষ কিছু বলার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের নিজেদের লোকেরা আপনাদের বাধা দিলে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন না। আপনাদের সব অহিংস ভাবে সহ্য করতে হবে। মারলে মার খেতে হবে। এই সত্যাগ্রহে যারা যোগ দেবে তাদের একথা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। তারা যেন এই সব শর্ত পূর্ণ মাত্রায় পালন করে। সকলে একসঙ্গে যাবেন না। এক এক দলে ভাগ হ'য়ে যাবেন। যদি শোভাযাত্রাকারীদের কেউ এই সব শর্ত না মানেন তাহলে আপনাদের শোভাযাত্রা বন্ধ করে দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করবেন না। যারা অহিংসায় বিশ্বাস করে না তাদের আমরা আমাদের দিকে টানার চেষ্টা করিনি। তাই সব কিছু খুব ভেবে চিন্তে কাজ করার দরকার। এ ধরনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় না। এখান রোগশয্যায় শুয়ে আপনাদের উপদেশ দিতে অবশ্য আমার কোনো অসুবিধে

নেই। তাই আপনাদের একটি ব্যাপারের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ সফলতা কামনা করে এখনকার মতো থামছি।

—এম. কে. গান্ধী।

1924 সালের 30শে মার্চ আমরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবো বলে ঠিক করেছিলাম। তার চারদিন আগে আমি ভৈকমে এলাম। সত্যাগ্রহে সাহায্য করার জন্য অনেক বন্ধু ও ভলান্টিয়ার ইতিমধ্যে সেখানে জড়ো হ'য়েছিলেন। নায়ার এবং ইড়বা সম্প্রদায়ের নেতারাও এসেছিলেন। তাঁদের বক্তৃতা, আলাপ আলোচনা, উৎসাহপূর্ণ প্রস্তুতি সব মিলিয়ে ভৈকমে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। টাকা সংগ্রহ করতে, জিনিষপত্র জোগাড় করতে, অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে, ভলান্টিয়ারদের ব্যবস্থা করতে সব কিছুর আলাদা আলাদা কমিটি করা হ'য়েছিল। নেতাদের বন্দী করলেও সত্যাগ্রহে যেন ভাঁটা না পড়ে তেমনি ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল।

29 তারিখে রাতে শুতে খুব দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। মাঝরাতে কারা যেন আমাকে ডেকে ওঠাল। এই ভদ্রলোকেরা আমার সঙ্গে কতকগুলো জরুরী ব্যাপার আলোচনা করতে এসেছেন। এই লোকগুলি তাঁদের সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তাঁরা আমাকে জানালেন যে পরের দিন সকালে পূর্বনির্দিষ্ট সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলে খুব গোলমাল হবে। এর ফলে অস্পৃশ্যতা নিবারণী আন্দোলন অনেক পিছিয়ে যাবে। তাই পরের দিন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করাটা খুব বিচক্ষণের কাজ হবে না। তাদের এই কথাবার্তা আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিল। আমার সঙ্গে সত্যাগ্রহের ব্যাপারে কাজ করে এসেছিলেন কয়েকজন বন্ধু তাঁরাও এই দলে ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি ভেবে আমি খুবই অবাক হ'লাম। যাহোক তাদের আমি বল্লাম যে পরের দিন সত্যাগ্রহ না করলে সত্যাগ্রহ করার আর দরকার নেই। সত্যাগ্রহ না করার কোনো কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমরা সকলে মিলে অনেক আলোচনার পরেই না এটা ঠিক করেছি। আমাদের এখন পেছন ফেরার কোনো মানে হয় না। আমাদের হারজিৎ যাই হোক্ না কেন, যেমন ঠিক করেছিলাম সত্যাগ্রহ কাল আরম্ভ হবে। এই কথাগুলি তাঁদের বলে আমি শুতে গেলাম।

30শে সকাল। সত্যাগ্রহ ক্যাম্পের লোকেরা ভোরে উঠে স্নান সেরে কপালে ফোঁটা কেটে মন্দিরের রাস্তায় যাবার জন্যে প্রস্তুত। তিনজন করে একটা দল প্রথম দিন সত্যাগ্রহের জন্যে রওনা হলো। কুঞ্জাপি নামে একজন পুলায়া (অস্পৃশ্য জাতি), বাহুলেয়ন নামে একজন ইড়বা (অস্পৃশ্য জাতি) আর গোবিন্দন পাণিক্কর নামে একজন নায়ার। সকাল 7টার সময় আমরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে দুজন দুজন করে অগ্রসর

হ'লাম। ক্যাম্প থেকে মন্দিরের রাস্তা প্রায় এক মাইল। আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে পৌঁছোলাম। দর্শক আর পুলিশে মিলে একটা বিরাট জনতা সেখানে ভীড় করেছিল। 'অস্পৃশ্য জাতিদের "এর ওধারে প্রবেশ নিষেধ" বলে একটা বোর্ড মন্দিরের একশ গজ দূরে রাস্তার ওপর পুঁতে রাখা ছিল। এই বোর্ডের পঞ্চাশ গজ নিকটে এলে সকলে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু তিনজন সত্যাগ্রহী আরো এগিয়ে গেল। বোর্ডের কাছে আট দশজন পুলিশ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—আপনারা প্রত্যেকে কোন জাতের?—একজন পুলিশ অফিসার সত্যাগ্রহীদের জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যাগ্রহী তিনজনই 'আমি পুলায়া', 'আমি ইড়বা', 'আমি নায়ার' এই উত্তর দিলেন। 'নায়ার এগিয়ে যেতে পারে অন্য দুজনকে এগোতে দেওয়া হবে না'—পুলিশ অফিসার হুকুম দিলেন। 'এদের দুজনকে এই রাস্তায় নিয়ে যাবার জন্যে আমি ওদের সঙ্গে এসেছি'— গোবিন্দ পাণিক্কর উত্তর দিল। পুলিশে পথ আটকালো। সত্যাগ্রহী তিনজন পুলিশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটলো। 'হয় আমাদের এই রাস্তা দিয়ে যেতে দিন, নয় এই রাস্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করছি বলে আমাদের অ্যারেস্ট করুন, নইলে আমরা এখান থেকে ফিরবো না'— এই বলে সত্যাগ্রহীরা ওখানেই বসে পড়ল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারেরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে সত্যাগ্রহীদের অ্যারেস্ট করতে হুকুম দিলেন। তাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবার পর আমরা সকলে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। এমনিভাবে প্রথম দিনের সত্যাগ্রহ শেষ হলো।

পরের দিন এই সত্যাগ্রহীদের বিচার হলো। বিচারে বিনা পরিশ্রমে তাদের ছ' মাসের কারাদণ্ড হ'ল। আরো তিন জন সেদিন সত্যাগ্রহ করলো। তাদেরও শাস্তি দিয়ে জেলে পোরা হলো।

এই দু'দিনে কোনোকিছু গোলমাল হয়নি। সত্যাগ্রহ এমন শান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আমরাও খুব খুশী হলাম। কিন্তু আমাদের এই সত্যাগ্রহে কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু ভয় পেয়ে গেল। অনেক কিছু উড়ো খবর তখন বেরোচ্ছিল। "মন্দিরে অস্পৃশ্য জাতিরা ঢুকতে যাচ্ছে। তারা গণ্ডগোলের জন্য তৈরী হচ্ছে"— এই সব উড়ো খবর। আমি কয়েকটা চিঠিও এই মর্মে পেলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে বল্লেন যে সত্যাগ্রহ দু'দিনের জন্য বন্ধ রেখে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে দেখা করে তাদের একবার বুঝিয়ে বলা দরকার। তাদের পরামর্শ মতো সত্যাগ্রহ দু'দিনের জন্য বন্ধ রাখলাম। এই সময় গান্ধীজীর আর একটি চিঠি পেলাম। চিঠিটা এই—

আম্বেরী— 1লা এপ্রিল

প্রিয় কেশব মেনন,

আপনাদের সত্যাগ্রহের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলার জন্যে মিঃ শিবরাম্‌য়্যার, মিঃ বক্তীশ্বরয়্যার এখানে এসেছিলেন। এঁরা আমাকে বল্লেন, যে রাস্তায় প্রবেশ নিয়ে তর্ক উঠেছে সেটা মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি। সে রাস্তা মন্দিরে যাবার রাস্তা। মন্দির ট্রাস্টীদের হাতে। জনসাধারণের এই রাস্তা দিয়ে যাবার অধিকার আছে কিনা তা এই ট্রাস্টীই ঠিক করবে। আমি তাঁদের তখন জিজ্ঞেস করলাম এই রাস্তাটি ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'লেও অব্রাহ্মণরা ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে কিনা। তাতে তাঁরা জানালেন যে অব্রাহ্মণেরা ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। যদি একজনও অব্রাহ্মণকে ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহ'লে তথাকথিত অস্পৃশ্য লোকেদেরও ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার অধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি বলে আমি তাঁদের বলেছি। তাঁরা এতে রাজী হ'লেও রাস্তার আর মন্দিরের মালিক ট্রাস্টীদের এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের এই ব্যাপারে বুঝিয়ে বলতে কিছু সময় লাগবে বলে আমাকে বল্লেন।

মালব্যজী দু'মাসের মধ্যে ওখানে আসছেন আমি জানতে পারলাম। অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনি এবং মন্দিরের কর্তাদের মধ্যেকার ঝগড়া মালব্যজীর মধ্যস্থতায় মিটমাট করার জন্য তিনি কি ঠিক করেছেন সেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানালে এবং তাতে ব্রাহ্মণদের অমত না থাকলে মন্দিরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের প্রশ্ন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক করা হবে বলে সত্যাগ্রহ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হলো'—এটা খোলাখুলি জানিয়ে সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার উপদেশ আমি আপনাদের দিচ্ছি।

এই দুই ভাই আমাকে এই ব্যাপারে যা বলেছেন তা যথার্থ সত্য এই বিশ্বাসে আমি আপনাকে এমনভাবে উপদেশ দিলাম। এই দুই ভাই আমাকে বল্লেন যে এই সংস্কারের ব্যাপারে মন্দিরের অধিকর্তারাও আমাদের মত আগ্রহী। যদি তা সত্যি হয় তাহ'লে এঁদেরও আমাদের সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে স্নেহের সঙ্গে কাজ করা উচিত।

আপনার বিশ্বস্ত এম. কে. গান্ধী

আমি এর উত্তরে গান্ধীজীকে লিখি,

ভৈকম 6-4-24

প্রিয় মহাত্মাজী,

সত্যাগ্রহ এখনকার মত বন্ধ করে রাখতে বলে আপনি আমাকে একটা চিঠি

পাঠিয়েছেন সে খবর 4ঠা এপ্রিলের 'হিন্দু' কাগজে পড়লাম। আপনার চিঠি আমার হাতে এখনো আসেনি তবে আসবে বলে অপেক্ষা করছি। এখানকার অবস্থা সমস্ত আপনাকে জানানো উচিত বলে আপনার চিঠি পাবার আগেই আপনাকে লিখছি।

আপনার চিঠিতে উল্লিখিত শ্রী শিবরামকৃষ্ণয়্যার আর বঞ্চীশ্বরয়্যারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। ওঁরা আপনাকে যে সব কথা বলেছেন তার সত্যতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। ভৈকম মন্দির এবং তার সামনের রাস্তা কোনোটাই কোন ব্যক্তি বা ট্রাস্টীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মন্দির ত্রিবাঙ্কুর সরকারের। এর কাজকর্ম চালান সরকারী অফিসারেরা। সরকার জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে মন্দিরের যাবার রাস্তার দেখাশোনা করছে। এই রাস্তা দিয়ে শুধু ব্রাহ্মণ আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নয় মুসলমান এবং খৃষ্টানেরাও যাওয়া আসা করে। তিয়া, পুলায়া প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিদের মাত্র পথ দিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। নিয়মানুযায়ী ব্রাহ্মণ ও সবর্ণ হিন্দুদের মত অস্পৃশ্য জাতিদেরও এই পথ দিয়ে যাতায়াত করার অধিকার আছে। আপনি যখন এটা জানতে পারবেন তখন সত্যাগ্রহ না থামিয়ে চালিয়ে যাবার উপদেশ দেবেন এ আমি জানি।

মালব্যজীর মধ্যস্থতায় সমস্ত কিছু ঠিক করার ব্যাপারে আপনি যা বলেছেন তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি ধরে নিয়েছেন যে মন্দির ব্রাহ্মণ ট্রাস্টীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তারা মালব্যজীর মধ্যস্থতায় সমস্ত ব্যাপারটা মিটমাট করে নিতে রাজী হবে। কিন্তু ওপরে যেমন লিখেছি মন্দিরের ট্রাস্টী এবং অধিকর্তা ত্রিবাঙ্কুর সরকার। এই সরকার আপনার কথামতো কাজ করতে রাজী হলে আমরা অধঃপতিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে আপনার উপদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে রাজী আছি। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই সংগ্রাম না চালিয়ে কোন উপায় নেই।

কয়েকদিনের জন্য সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার ব্যাপারে আমরা আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। এখানকার অবস্থা এখন একটু ভালো হওয়ায় আমরা কাল আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে যাচ্ছি।

খুব শীঘ্র আমাকে এবং আমার সহকর্মীদের অ্যারেস্ট করা হবে বলে আমি মনে করছি। আমাদের ধরে নিয়ে যাবার পর শ্রীজর্জ জোসেফের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরো বেশী জোরদার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রীজোসেফ এখানকার সমস্ত বিবরণ আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আপনার আশীর্বাদ আমাদের উপর থাক্ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। ইতি

—আপনার বিশ্বস্ত কে. পি. কেশব মেনন

এর মধ্যে সবর্ণ হিন্দুদের একটা সভায় যোগ দিয়ে অস্পৃশ্য জাতিদের মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে যাবার অনুমতি দেবার জন্য সরকারের কাছে তাদের আবেদন জানানো উচিত, এই সুবর্ণ সুযোগ যেন তাঁরা হেলায় না হারান একথা আমি তাঁদের বল্লাম। এতে যে খুব একটা ফল হ'লো তা নয়। ক্যাম্পে ফিরে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরের দিন আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা ঠিক করলাম।

টি. কে. মাধবন্ এবং আমি সেদিন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হলাম। সত্যাগ্রহ আবার আরম্ভ হচ্ছে জানতে পেরে জনতা সেদিনও ভৈকম মন্দিরের রাস্তার দুপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। বেশ কিছুটা যাবার পর পুলিশ আমাদের অ্যারেস্ট করলো। দুপুরের পর কোর্টে আমাদের কেসের বিচার শুরু হলো।

নীচু জাতিদের আমরা মন্দিরের রাস্তা দিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছি। তারা যদি ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে তাতে সবর্ণ হিন্দুদের আপত্তি হবে এবং এর জন্য তারা বিক্ষোভের জন্য হ'তে পারে ইত্যাদি ছিল আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সারাংশ।

কোর্টে আমার বক্তব্য আমি এইভাবে বলেছিলাম—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অমান্য করে মন্দিরের রাস্তা দিয়ে অস্পৃশ্য জাতিদের হাঁটার উৎসাহ আমি দিয়েছি এই অভিযোগ ঠিক। যতদিন এই আদেশ জারী থাকবে ততদিন এই নিয়ম ভাঙার জন্য আমি অস্পৃশ্য জাতিদের উৎসাহ দেব। সবর্ণ হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টানেরা যদি ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে তাহ'লে অস্পৃশ্য জাতিরাও পারে। ঐ রাস্তা দিয়ে হাঁটার স্বাধীনতা তাদের জুগিয়ে দেবার জন্য আমরা এখন চেষ্টা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু লোকের কিছু ভুল ধারণা আছে। অস্পৃশ্য জাতি বলে পরিচিত লোকদের আমরা মন্দিরে প্রবেশ করাবার জন্যে এগিয়ে আসিনি। আমরা এগিয়ে এসেছি জনসাধারণের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করার স্বাধীনতা অর্জন করার কাজে তাদের সাহায্য করতে। অনেকদিন ধরে সরকারকে আবেদন নিবেদন জানিয়ে যখন কোন ফল হ'ল না তখন এই অধিকার সত্যাগ্রহ দিয়ে অর্জন করা যায় বলে আমরা সত্যাগ্রহে নেমেছি। আমাদের এই বিশ্বাসের ফলে আমরা যে শাস্তি পেতে যাচ্ছি তা' এই দুরাচারকে কেরল থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে যদি সাহায্য করে তাহ'লে তার থেকে আনন্দের আর কিছু নেই।

বিচারের পর 500 টাকায় আমাদের জামিন দেবার জন্য কোর্ট আদেশ দিল কিন্তু জামিন দিতে আমরা রাজী না হওয়ায় আমাদের ছ'মাস বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড

হলো। এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করার ইচ্ছে আমাদের নেই, একথা আমরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানালাম। আমাদের সেই দিনই ত্রিবান্দ্রাম জেলে নিয়ে যাওয়া ঠিক হলো। বেলা তিনটের সময় আমি আর মাধবন্ একজন সাব্ইন্স্পেক্টরের সঙ্গে গাড়ীতে ত্রিবান্দ্রাম রওনা হলাম। রাত দশটায় আমরা ত্রিবান্দ্রাম পৌছোলাম।

একুশ

পূজাপ্পুরার সুখের দিনগুলি

ত্রিবান্দ্রাম শহর থেকে তিন মাইল দূরে পূজাপ্পুরা বলে একটা জায়গায় একটা পাহাড়ের ওপর ত্রিবান্দ্রাম সেণ্ট্রাল জেল। সেই পাহাড়ের উপর থেকে দেখলে চারিদিকের অতি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। এখানে ওখানে সারি সারি ছোট ছোট পাহাড়। যতদূর চোখ যায় নারকেল গাছের সারি। সুন্দর সুন্দর বাড়ী, তাদের ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী আর চারিদিকে ছেয়ে থাকা এক অনাবিল শান্ততা—এ যে আমার মনে কি আনন্দের লহরী তুলতো তা বলে বোঝাতে পারবো না।

ত্রিবান্দ্রাম জেলে পৌঁছোবার পর জেলার নীলকণ্ঠ পিল্লার বাড়ী থেকে আমাদের সেদিন রাতের খাবার এনে দেওয়া হলো। ডাল থেকে পায়স অবধি সব রকম ভালো ভালো খাওয়া ছিল। ছ'মাস এখানে বাস করে যে জীবন উপভোগ করতে যাচ্ছি এ যেন তার গৌরচন্দ্রিকা।

চারিদিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা বিরাট একটা ঘরে মাধবনের আর আমার শোবার জন্য খাট পাতা হয়েছিল। স্নানের ঘর, পড়াশুনো করবার জায়গা, সকাল বিকেলে চলাফেরা করার একটা ছোট উঠোন সব সেখানে ছিল। আমাদের পছন্দ মত খাবার সময় মতো আমাদের দেওয়া হতো। আমাদের সব রকম সুখ সুবিধের দিকে জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট আর জেলার সব সময় নজর রাখতেন।

আমাদের পছন্দ মত বই, খবরের কাগজ সব আমাদের দেওয়া হয়েছিল। বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনকে চিঠি লেখার এবং তাদের কাছ থেকে চিঠি পাবার অনুমতিও আমরা পেয়েছিলাম। যারা দেখা করতে আসতো তাদের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার কোনো বাধা ছিল না। জেলের বাইরে যাওয়া ছাড়া আর সব রকম সুবিধে আমাদের ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যখন চারিদিকের উঁচু দেয়ালগুলোর দিকে তাকাতাম তখন আমাদের স্বাধীনতা যে কতটুকু তা মনে না এসে পারতো না।

আমাদের এই জেলে আসার দু'দিন পরে আমাদের আগে শাস্তি পাওয়া সত্যাগ্রহী কুঞ্জাপ্পু, বাহুমেনন্ আর গোবিন্দ পাণিক্করকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। এই তিনজন সত্যাগ্রহীকে ভৈকম থেকে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হ'য়েছিল। এদের তিনজনকে জেলের সাধারণ কয়েদীদের ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এর দুদিন

পরে এ. কে. পিল্লা, কে. কেলপ্পন, ভেলায়ুধ মেনন, কৃষ্ণস্বামী আয়্যার জেলে এসে পৌছোলেন। আর এক সপ্তাহ পরে জর্জ জোসেফও এসে পৌছোলেন। তাঁকে আমার সঙ্গে রাখা হ'লো। অহিন্দুদের এই সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়া সম্বন্ধে কিছু বাদানুবাদ কাগজে এ সময় দেখা গিয়েছিল। সে কথারও উল্লেখ এখানে করা উচিত।

জর্জ জোসেফ একজন নামকরা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। জর্জ জোসেফ সংবাদপত্র পরিচালনায় এবং বক্তৃতামঞ্চেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম থেকেই তিনি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকবার তাঁকে জেলে যেতেও হ'য়েছিল। মহাত্মা গান্ধী জেলে থাকার সময় তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকটির পরিচালনা জর্জ জোসেফ কিছুদিন করেছিলেন।

সত্যাগ্রহীদের তিন ভাগে ভাগ করে জেলে রাখা হ'য়েছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল এক। তাই শাস্তিটাও এক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের কয়েকজনকে কতকগুলো বিশেষ সুবিধে দেওয়া এবং অন্যদের সাধারণ কয়েদীর মত রাখা যে খুবই অন্যায় সেটা আমরা উপলব্ধি করি। আমরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ পোতন্‌কে একটা চিঠি দিয়েছিলাম।

চিঠি পেয়ে মিঃ পোতন্ ভয় পেয়ে গভর্ণমেণ্টকে সব জানালেন। কিছুদিন পরে এই সত্যাগ্রহীদেরও আমাদের পাওয়া সব সুখসুবিধে মিললো। এমনি ভাবে জেলের বাকী দিনগুলো আমরা একসঙ্গে কাটালাম।

জেলে সকালবেলা স্নান সেরে কফি খাওয়ার পর দু'ঘণ্টা বসে লিখতাম। ওয়েল্‌স-এর 'পৃথিবীর ইতিহাস' বইখানির অনুকরণে মালয়ালমে একখানি ইতিহাস লিখবো বলে ঠিক করে তা আরম্ভ করলাম। বেশ কিছুটা লিখেও ছিলাম কিন্তু তা শেষ করতে পারি নি। এর জন্য সরকারী দ্রষ্টব্য বই ত্রিবান্দ্রাম লাইব্রেরী থেকে পেয়েছিলাম। 'বন্ধন থেকে' এই বইটি জেলে বাস করবার সময় লিখেছিলাম। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বই পড়তাম—নানা রকমের বই। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত প্রার্থনা সভায় যোগ দিতাম। কৃষ্ণস্বামী অষ্টপদী শ্লোক আওড়াতেন। কয়েকটি ভক্তি সঙ্গীতও গাওয়া হতো। তারপর রাতের খাওয়া শেষ করে জেলের ভেতরের কম্পাউণ্ডে একটু হাঁটাহাঁটি করতাম। ন'টার সময় শুতে যেতাম। এই ছিল আমার দৈনন্দিন রুটিন।

জেলে বাস করার সময় অন্য কোনো অসুবিধা ভোগ করতে না হ'লেও আমার সংসারের কথা ভেবে আমি বড় চিন্তায় থাকতাম। সংসারের আয় নেই বলে আমার পরিবার আর্থিক কষ্টে পড়বে বলে শুধু নয় আমার আদর্শ এবং কর্মে এতটুকু সহানুভূতি

না থাকা কিছু আত্মীয়স্বজনের কথাবার্তার খোঁচা তাদের স্বস্তি দেবে না এই ভয় আমার ছিল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমার স্ত্রী লক্ষ্মী আমাকে লিখেছিল যে এমন ভাবে কেউ তাদের কিছু বলেনি তবুও আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর তখনকার অভিজ্ঞতা আমি খুব ভালোভাবেই অনুভব করতে পারতাম। আমার বন্দী হবার বেশ কিছুদিন পরে লক্ষ্মী আমাকে লিখেছিল।

—তোমার এই জেলে যাওয়াকে অসম্মান বা আমাদের একটা বিপদ বলে মনে করি না। আমার প্রথম চিঠিতে 'ত্রিবান্দ্রাম জেলে'র ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখতে হবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি' একথা আমি সেজন্য লিখি নি। বৃটিশ সরকার তোমাকে গত তিনবছর ধরে বন্দী করার জন্যে নানা রকম চেষ্টা করেও পারে নি। সেই অবস্থায় ত্রিবাঙ্কুর সরকার এত সহজে তোমাকে বন্দী করে ফেললো দেখে আশ্চর্য লাগছে। আমার প্রথম চিঠিতে তাই অমন ভাবে লিখেছিলাম।

তোমার আংটি চিন্নান্ দিয়ে গেছে (আমাকে অ্যারেস্ট করার আগের দিন আমি আংটিটা আমার ভাই-এর হাত দিয়ে লক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিই)। আংটি পেয়ে আমার মনে যে কি কষ্ট হ'য়েছিল তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আংটিটা বাক্সে রাখিনি। হাতে পরেছি। এটা সব সময় আমার চোখের সামনে রয়েছে এইটাই এখন আমার সান্ত্বনা।

অফিস থেকে তোমার ফেরার সময়, ভাত খাওয়ার সময় আর চা তৈরী করার সময় বড় কষ্ট হয়। তেল মেখে চান করতে পাচ্ছ এবং তোমার প্রতিদিনের কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত পড়েনি জেনে আশ্বস্ত হলাম। আমার খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি কিন্তু আমাকে ছেলেমেয়েরা কি একা যেতে দেবে? আমরা যদি সকলে একসঙ্গে আসি তাতে অনেক পয়সা খরচ হবে—সে পয়সা কোথায়? একা এসে তোমাকে দেখে একা ফিরে আসার সাহস আমার নেই।

এই চিঠির অন্য খানিকটা অংশও লিখছি। সর্দার কে. এম. পাণিক্কর ভৈকম সত্যাগ্রহের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমার স্ত্রী একটা চিঠি পেয়েছিল। সেই চিঠির কথাই এই অংশে লেখা ছিল।

—কে. এম. পাণিক্করের চিঠি আজ পেলাম। তোমার জেলে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই দুঃখিত। আমাদের সব দুঃখকষ্টের কথা তিনি বুঝতে পারছেন। অমৃতসরে গিয়ে পড়েছিলেন বলে ভৈকম সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি যদি আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন তাহ'লে খুশীই হবেন এই সব লিখেছেন।

আমার বড় মেয়ে চেল্লাম্মাও আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিত। তার চিঠি থেকে

ভৈকম সত্যাগ্রহের ব্যাপারে কারো কারোর মনোভাব জানা সম্ভব হ'য়েছিল।

1924 সালের 15ই মে ওর চিঠির অংশ থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি—দুদিন আগে অমুক বাবু এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন যে বাবা এসবের মধ্যে না গেলেই ভালো করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক করলাম। অন্যেরা ব্যাপারটা ঠিকঠাক বুঝোলে বুঝতে পারে কিন্তু অমুকবাবু কিছুতেই বুঝবেন না। কেউ কেউ বলছেন যে ভৈকমের অবস্থা এরকম হলে তোমাদের চেষ্টা সফল হতে অনেক দিন লাগবে। তোমার কি মনে হয়? তোমার চেষ্টা যাতে সফল হয় তার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

তখন চেল্লাম্মার বয়স মাত্র 15 বছর ছিল।

ত্রিবান্দ্রাম জেলে আসার দু'মাস পরে আমার স্ত্রী, ছেলে আর ছোট মেয়ে লীলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সুপারিডেণ্টের অফিসে বসে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। অফিসে পৌঁছেই আমি আমার ছোট মেয়ে লীলাকে কোলে তুলে নিলাম। আমি যে জেলে আছি সে কথা ভুলেই গেলাম। দু'ঘণ্টা আমি আমার পরিবারের সঙ্গে ছিলাম। সময় হ'য়ে যাবার পর তারা যখন বিদায় নিল তখন তারা না এলেই ভালো হতো বলে আমার মনে হলো।

একদিন দুপুরবেলা খাওয়ার সময়ে জেলের ভেতর থেকে একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পেলাম। প্রচণ্ড মারের শব্দ আর তার সঙ্গে এক হতভাগ্যের করুণ চীৎকার। আমি আর শুনতে পারলাম না। একজন কয়েদীকে কি একটা অপরাধে হাত পা বেঁধে মারা হচ্ছে। গুণ্ডা, সমাজদ্রোহী, চোর ছ্যাঁচড়দের শাস্তি দেওয়া উচিত ঠিকই কিন্তু তা বলে হাত পা বেঁধে একটা লোহার দাণ্ডা দিয়ে মারার প্রথা বন্ধ করা উচিত বলে আমার মনে হ'ল। কোনো কোনো কয়েদীকে কোনরকম শাস্তিতেই শায়েস্তা করা যায় না, তাই তাদের মেরে শায়েস্তা করা উচিত বলে বলা হয়। আমাদের জেলগুলি আজও শাস্তির জায়গা। মানুষকে সংশোধন করার চেষ্টা সেখানে কম। এই ব্যাপারে পশ্চিমের দেশগুলি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। আমাদের তা অনুকরণ করা উচিত। মারধোর করা একটা রোগের মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য অসুখের মতো এরও চিকিৎসার দরকার। এই কথা মনে রেখে আমাদের জেলগুলির সংস্কার করা উচিত।

ভৈকম সত্যাগ্রহ এই সময় সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেছিল, তামিলনাড়ুর রামস্বামী নায়কার ভৈকমে এসে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে ত্রিবান্দ্রাম জেলে এলেন। শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি নেতারা জেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পাঞ্জাব থেকে একদল আকালী ভৈকমে এসেছিলেন। ভারতের নানা

জায়গা থেকে রোজ অসংখ্য লোক ভৈকমে আসতো। পুলিশ তখন সত্যাগ্রহীদের জেলে পোরা বন্ধ করলো। চাতুকুট্টি নায়ার দু'দিন দু'রাত রাস্তায় বসে অনশন করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ডাক্তারদের সহায়তায় তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো তখন লোকে খুবই উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিল। এই ঘটনায় ভৈকম সত্যাগ্রহ যেন নতুন করে জীবন পেল।

অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা সে সময় ঘটলো। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা শ্রীমূলম তিরুনাল দেহ রাখলেন। তাঁর ছেলে চিত্তিরা তিরুনাল অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলে মহারানী লক্ষ্মীবাঈ শাসন পরিচালনা নিজের হাতে নিলেন। মহারাজার নির্বাণে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্ত করে দিতে মহারানী ঠিক করলেন।

একদিন সকালে খবর পেলাম যে আমাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পাঁচ মাস এত আরাম করে থাকার জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি বলেও এতটুকু দুঃখ হ'ল না। সুপারিণ্টেডেণ্ট ও জেলের অফিসারদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা জেলের বাইরে এলাম। আমি সেইদিনই ভৈকমে রওনা দিলাম। আমাদের অভ্যর্থনায় আয়োজিত ভৈকমে এক জনসভায় যোগ দিয়ে পরদিন পালঘাট রওনা হলাম।

আমাদের জেল থেকে ছাড়লেও ভৈকম সত্যাগ্রহ বন্ধ হয় নি। এই সময় গান্ধীজী ভৈকমে এলেন। এখানে এসে অনেকের সঙ্গে কথা বলে তিনি সরকারের সঙ্গেও কথা বলতে তৈরী হ'লেন। খৃশ্চান মুসলমানেরা যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারে সেই রাস্তায় সব হিন্দুরা জাতি নির্বিশেষে হাঁটতে পারবে বলে তিনি ঠিক করলেন। তবে সবর্ণ হিন্দুদের মন্দিরের আশেপাশে অবর্ণ হিন্দুদের প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত বলে সত্যাগ্রহীরা জোর করতে পারবে না বলে ঠিক হলো, সেই মত 'অস্পৃশ্য জাতিদের এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ' বলে লেখা বোর্ডটি উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। সত্যাগ্রহও উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। এইভাবে ভৈকম সত্যাগ্রহ যে উদ্দেশ্যে করা হ'য়েছিল তার একটা সমস্যার সমাধান হলেও অস্পৃশ্যতা দূর করা সম্ভব হ'ল না। গান্ধীজীর উপদেশ মত এর জন্য চেষ্টা অবশ্য আমরা করে চললাম।

ভৈকম থেকে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত সবর্ণ হিন্দুদের একটা শোভাযাত্রা বের করবো বলে আমরা ঠিক করলাম। তার জন্যে সব রকম আয়োজন আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল্লাম। আমাদের এই শোভাযাত্রা পথের সব জায়গা থেকে বিপুল অভ্যর্থনা পেলো। পথে মাঝে মাঝে জনসভাও করা হ'য়েছিল। এক একটা জায়গায় শোভাযাত্রা উপস্থিত হলে সেখানে নতুন নতুন লোকেরা এই শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছিল। এমনি ভাবে আর একটা শোভাযাত্রা ডক্টর নাইডুর নেতৃত্বে নাগরকোবিল থেকে বেরোলো।

ত্রিবান্দ্রামের সমুদ্র সৈকতে আহুত এক বিরাট জনসভায় অস্পৃশ্যতা সমূলে উৎপাটিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানিয়ে একটা প্রস্তাব পাশ করা হলো। সবর্ণ হিন্দুদের একটা প্রতিনিধি সঙ্ঘ মহারানীর সঙ্গে দেখা করে 25000 হাজার সবর্ণ হিন্দুদের সই করা একটা বিরাট আবেদন মহারানীর হাতে দেয়।

ভৈকম সত্যাগ্রহ প্রায় কুড়ি মাস ধরে চলেছিল। এই সত্যাগ্রহ শুধু কেরলেই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অস্পৃশ্যতা নিবারণ করে সবর্ণ হিন্দুদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার ভিত্তি তৈরী করেছিল। এই সত্যাগ্রহের ফলে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার আবহাওয়া তৈরী হ'য়েছিল। কেরলে কংগ্রেসের কাজের গৌরবজনক ইতিহাসে ভৈকম সত্যাগ্রহ এক উদ্দীপনাময় অধ্যায়।

বাইশ

অপ্রত্যাশিত দুর্দৈব

"দেশের সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেছে তারা কখনো সখনো হয়তো ফুলের মালা পায় কিন্তু অনেক সময় তাদের বহু খারাপ অভিজ্ঞতা হয়, সে কথা অন্যেরা জানতে পারে না"— একথাগুলো একবার গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বলেছিলেন। অনেক হতাশার সময় তাঁর এই কথাগুলো আমার মনে উদয় হতো। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা জীবন সুখের জীবন নয় আমি জানি, কিন্তু তা সত্বেও ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটি শক্তি আমাকে এই দিকে আকর্ষণ করেছিল।

জেল থেকে বাড়ী আসার পর আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে যে সব কটু কথা শুনতে হ'য়েছিল সে সম্বন্ধে আমার স্ত্রী আমাকে বল্ল। "কত টাকা খরচ করে পড়িয়েছি। কত কি যে আশা ওর কাছ থেকে ছিল, আর এখন আসছে জেলের কয়েদী হয়ে। যারা স্ত্রীকে সন্তানকে ভালোবাসে তারা কি এমন কাজ করতে পারে? সে যে এমন কাজে এগিয়ে গেলো স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা একবার চিন্তাও করলো না। কারা তাদের ভার বইবে বলে সে ভেবেছে?" খুব কম দিনই গেছে যখন আমার স্ত্রীকে এই ধরনের কথাবার্তা শুনতে হয় নি। সংসার চালানোর জন্যে আমার স্ত্রীর অপরের কাছে হাত পাততে হয়েছিল। সান্ত্বনা দেবার কেউ সেখানে ছিল না। দেশের সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেছে তাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা বলে থাকি, কিন্তু তাদের পরিবারেরা যে কতখানি আত্মত্যাগ করে সে কথা কি আমরা কেউ মনে রাখি? বিরাট ত্যাগ তারাই কি করে না?

1921 সালের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ওকালতি ছেড়ে আমি কালিকটে এলে পর কিছুদিন কষ্টেস্বষ্টে সংসার চালাবার মত টাকা আমার হাতে ছিল। টাকা পয়সা আমি খুব সাবধানে খরচ করতে পারি না। টাকা পয়সার যে দরকার নেই তা ভেবে নয়, আমি টাকা রাখার অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম। হিসেব রাখা, পাই পয়সা গোণা, কি কি খরচ হ'তে পারে সে সম্বন্ধে ভেবে রাখা সবই আমি করেছি। কিন্তু এমনি ভাবে কিছুদিন চলার পর আমি আবার আমার আগেকার স্বভাবে ফিরে যেতাম। রাজনীতিতে যোগ দেবার পর অনেকবার টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে খুব চিন্তা করতে হয়েছে। কেমন করে সংসার চালানোর পয়সা জোগাড় করবো?

স্ত্রী পুত্র পরিবারকে দেখাশোনার দায়িত্ব কি আমার নয়? অন্যান্য কর্তব্যও কি আমার নেই— এই সব চিন্তা আমাকে খুবই উদ্বিগ্ন করতো, কিন্তু তখন 'কোন একটা উপায় বার হবেই' বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি।

যে সব উকীল ওকালতি বন্ধ করে দেশের কাজে যোগ দিয়েছিল তাদের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ যমুনালাল বাজাজ এক লক্ষ টাকার একটা ফাণ্ড আলাদা করে রেখেছিলেন। সেই ফাণ্ড থেকে প্রত্যেক মাসে আমি 100 টাকা পেতাম। গান্ধীজীও প্রত্যেক মাসে আমাকে 100 টাকা করে পাঠাতেন। প্রায় একবছর এই রকম ভাবে চালিয়েছি। 1922 সালের মার্চ মাসে গান্ধীজী জেলে গেলে পর এই অবস্থার পরিবর্তন হলো। বাজাজ ফাণ্ডের টাকা শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী আমাকে যে টাকা পাঠাতেন তাও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর জেলে যাবার পর দু' তিন মাস মাত্র টাকাটা পেয়েছিলাম। তারপর আর পাইনি। হাতে তখন টাকাও নেই, কোন সঞ্চয়ও নেই। খরচও বন্ধ করা যায় না। দরকার মেটাতে হবে। এমন সময়ও গেছে যখন আমার কাছে আট আনা পয়সা পর্যন্ত ছিল না। সে সব কথা মনে পড়লে এখন আমি শিউরে উঠি।

এই সময় একবার এর্ণাকুলমে কেরল কংগ্রেস কমিটির একটা সভা হয়। এই সভাটা খুবই জরুরী ছিল। আমি কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলাম বলে এই সভায় না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। অথচ আমার হাতে তখন মাত্র দুটো টাকা ছিল। সে টাকা দুটি নিয়ে আমি গেলে বাড়ীতে খরচের একটা পয়সাও থাকবে না। এমনি ভাবে উভয়সঙ্কটে যখন পড়েছি তখন হঠাৎ একটা পথ দেখতে পেলাম। কাল্লাই থেকে ত্রিচূর অবধি টিকিট কিনলাম তাতে এক টাকা ক' আনা পড়লো। বাকী খুচরো বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। নীলকণ্ঠ নাম্বুতিরিপাড্ তখন রাজ্য কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনিও এই গাড়ীতে ত্রিচূর থেকে এর্ণাকুলম যাবেন। ত্রিচূরে পৌঁছে সেখান থেকে এর্ণাকুলম অবধি টিকিট তাঁকে দিয়ে কাটাবো ঠিক করলাম। সেই মত কাজও হলো। টিকিটের চেয়ে বেশী দরকার ছিল কফি খাওয়া। তার জন্যেও নাম্বুতিরিপাডের উদারতার আশ্রয় নিলাম। এর্ণাকুলম থেকে কালিকটেও এই ভাবে ফিরলাম।

দিল্লী, কলকাতা অথবা অন্য কোন জায়গায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিটিঙ হ'তো। তাতে যেতে হ'লে অনেক খরচ। প্রত্যেকবার কংগ্রেস কমিটির মিটিঙে যোগ দেবার সময় কোনো উদার বন্ধুর কাছে হাত পাতা একটা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দু'একবার চাইলে তারা খুশী মনে দিত। কিন্তু বারবার তাদের টাকার জন্যে বিরক্ত করলে তারা নিশ্চয়ই মনে মনে আমাদের গালাগালি দিত। কিন্তু

আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। তবে টাকা চেয়ে খালি হাতে কোনো দিন ফিরে আসিনি। সেই সময়কার একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি।

সংসারের খরচের জন্য সেদিন আমার হাতে একটাও পয়সা ছিল না। যথা নিয়মে 'মাতৃভূমি' অফিসে এলাম। বাড়ী ফিরে যাবার সময় কিছু হাতে নিয়ে যেতে পারবো বলে ভেবেছিলাম। বাড়ীতেও তাই বলে আমি অফিসে এসেছিলাম। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে পয়সার কথা মনে হচ্ছে। পিওন এলে পর পয়সা কিছু পাওয়া গেছে কিনা বলে খোঁজ করলাম। 22 টাকা পাওয়া গেছে বলে ম্যানেজার আমাকে বল্লেন। সে টাকায় কাগজ ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি কিনে বাকী পয়সা কম্পোজিটারদের দেওয়া হ'য়েছে। শুনে আমি খুব নিরাশ হ'য়ে গেলাম। খালি হাতে কি করে এখন বাড়ী ফিরি? এই ভাবে তিন ঘন্টা কেটে গেল। দুপুরে খাওয়ার জন্যে বাড়ী ফেরার সময় হয়ে এল। রান্না কিছু হয়েছে কিনা তাও জানি না। খুব শঙ্কিত মনে আমি রিক্সায় চড়লাম। তখন পিওন আসছে দেখতে পেলাম। ডাক্ দেখে বাড়ী ফিরবো ভেবে আবার অফিসে ফিরলাম। সেদিনকার চিঠিগুলোর মধ্যে একটা খাম খুলে দেখি তাতে 100 টাকার একটা নোট আর একটা চিঠি—"আপনি খুব কষ্টে পড়েছেন তা আমি জানতে পেরেছি। হতাশ হবেন না। টাকা আরো পাবেন। এখন এই টাকাটা পাঠাচ্ছি"—এই ছিল চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। কে যে টাকাটা পাঠিয়েছে তা তখন জানতে পারিনি, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম। এই চিঠি আর টাকা পেয়ে আমার কি আনন্দ যে হলো। এই টাকা থেকে কিছুটা আমার সহকর্মীদের এবং কিছু অফিসের জরুরী দরকারে দিলাম। বাকী টাকাটা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।

সেদিন যদি আমি ঐ টাকাটা না পেতাম তাহ'লে আমার অবস্থা যে কি শোচনীয় হ'ত তা আমি নিজেই জানতাম। ঠিক এই সময় কি ক'রে যে টাকা পাঠাবার কথা সেই বন্ধুটি ভেবেছিলেন তা আজো আমার অজ্ঞাত। এই ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু একবার নয়, অনেকবারই হয়েছে। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে আমার মন সেই পরম শক্তির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কাছে বারবার মাথা নীচু করেছে এবং আমি যে সম্পূর্ণ একা নই এই বিশ্বাস আমাকে সংকটের মুহূর্তগুলি পার হতে সাহায্য করেছে।

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি পালঘাট থেকে কালিকটে এলাম। কিছুদিন পরে বৈকম থেকে ত্রিবান্দ্রামে সবর্ণ হিন্দুদের শোভাযাত্রা পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য আবার আমাকে বৈকম আসতে হলো। শোভাযাত্রার সঙ্গে ত্রিবান্দ্রাম অবধি যাবো বলে ঠিক করেছিলাম আর তখনি "স্ত্রীর খুব অসুখ, শীঘ্র কালিকটে আসুন" বলে একটা তার পেলাম। আমি তক্ষুণি কালিকট রওনা হলাম।

প্রবল জ্বরে আক্রান্ত শীর্ণ শায়িত স্ত্রীকে দেখে এটা সাধারণ জ্বর নয় বলে আমার সন্দেহ হ'লো। বেশ কিছুদিন ডাক্তার আমাকে রোগটা কি বলেন নি। পরে একদিন বল্লেন,—আমার সন্দেহ ঠিক জেনে আপনাকে বলবো ভেবেছিলাম। আপনার স্ত্রীর ক্ষয়রোগ হয়েছে। আর একটুও দেরী না করে মাদ্রাজে নিয়ে গিয়ে ওঁনার চিকিৎসা করানো ভালো বলে আমি মনে করি।

একটুও দেরী না ক'রে মাদ্রাজে চিকিৎসা করাতে ডাক্তার উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেটা কি ক'রে সম্ভব হবে? রোজকার সংসার চালাবার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, তার উপর মাদ্রাজে যাবার পথের খরচ, সেখানে থাকার, চিকিৎসা করার খরচ কি করে আমি জোগাড় করবো? আর চিকিৎসা না করিয়ে রোগীকে কালিকটে রেখে দেবই বা কি করে? কিছু টাকা আমার শ্বশুর নিয়ে এলেন কিন্তু তা খুবই কম। হাতে টাকা না নিয়ে বেরোবই বা কি করে? কিন্তু বেরোতে হবেই। মাদ্রাজে পৌঁছে অন্য সব কিছু ভাববো ঠিক করে আমি যাত্রার দিন ঠিক করলাম। রওনা হবার আগের দিন একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করা হ'য়েছে বলে আমার এক বন্ধু আমাকে জানালেন। এ খবর পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরের দিন আমাদের বিদায় দিতে অনেক বন্ধুবান্ধব ষ্টেশনে এলেন। গাড়ী ছাড়ার সময় একজন শেঠ আমার হাতে একটা খাম দিলেন। গাড়ী ছাড়ার পর খামটা খুলে দেখি তার মধ্যে 400 টাকার নোট্। আমি দু'বার গুণে দেখলাম। খামটা হাতে নিয়ে অসহায় ভাবে শুয়ে থাকা আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের অজ্ঞান্তে আমার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অদৃশ্য এক বিধাতার নিয়ন্ত্রণে আমরা নিয়ন্ত্রিত একথা প্রায়ই আমার মনে হয়। কখন কোন দিক থেকে যে আঘাত আসবে সে কথা আমরা কেউ বলতে পারি না। তবু জলের স্রোতে মিশিয়ে বয়ে যাওয়া খড়কুটোর মত মানুষ অসহায় নয় একথা আমার মনে হয়। অনেক বিপদ আসে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার জন্যে আমাদের কষ্ট সহ্য করতে হয়। আবার আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারা কতকগুলো জিনিস অর্জন করা এবং কতকগুলো জিনিস বর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি জানি। আমাদের জীবনের যাত্রাপথে সবচেয়ে দরকার হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস এবং কতকগুলো মৌলিক নীতিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখা। এই নীতিগুলোর ধারণা এক একজনের কাছে এক একরকম। আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি কিন্তু আমার দরকারে আমি তাদের কাজে লাগাতে চাই নি, তাই বোধহয় আমার উপর তাদের ভালোবাসা কমেনি এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের সাহায্যও পেয়েছি।

বঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যা আমি অনেক দেখেছি। তেমনি ভাবে সত্যনিষ্ঠা, দয়া, করুণা, সততা, নিঃস্বার্থপরতা এবং অসীম স্নেহ আমি দেখেছি। এই দু'ধরনের লোক অবশ্য পৃথিবীতে কম। অধিকাংশ লোকই এই দুই দলের বাইরে। সাধারণ মানুষ নিষ্ঠুর অথবা আত্মত্যাগী নয়। তার স্বার্থে যাতে আঘাত না লাগে তেমনি ভাবে সে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। তারা অপরের ক্ষতি করতেও চায় না, ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত নয়।

পাঁচ মাস আমি মাদ্রাজে ছিলাম। ক্ষয়রোগের চিকিৎসা এবং ওষুধ আজকের মতো তখনকার দিনে অত সহজ ছিল না। ডাক্তার কেশব পাই ছিলেন তখনকার দিনে মাদ্রাজের বিখ্যাত ক্ষয়রোগ চিকিৎসক। আমার দেওয়া পারিশ্রমিক হিসাবে তিনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসা করেন নি। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কাজে নামা একজন লোক বলে বোধহয় তিনি আমার ওপর এত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমি মাঝে মাঝে এক একটা দরকারে মাদ্রাজের বাইরে যেতাম। এমনি ভাবে একবার আমি চাতুকুট্টি নায়ারকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমির শেয়ার জোগাড় করতে কোলারে গিয়েছিলাম। কোলারে তখন বহু মালয়ালী কর্মচারী ছিলেন, তাই শেয়ার জোগাড় করতে আমার একটুও অসুবিধা হয়নি। লিফটে করে স্বর্ণ খনির ছ'হাজার ফুট নীচে নেমে সোনার শিলাগুলো কেটে ওপরে ওঠানো, শিলা গুঁড়ো করে তার থেকে সোনা সংগ্রহ করে তা গলিয়ে সোনার বাঁট করা সব আমরা দেখেছিলাম। এক সপ্তাহ পরে আমরা মাদ্রাজ ফিরে এলাম।

এই সময় কেরলের অস্পৃশ্যতা নিবারণী আন্দোলনের বিষয়ে বিশেষ করে ভৈকম সত্যাগ্রহের কথা জানবার জন্যে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ ত্রিবাঙ্কুরে এসেছিলেন। পথে দু'তিন দিন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন। আমি মাদ্রাজে আছি জানতে পেরে ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একটা তার তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে দেখে বল্লেন যে ভৈকম সত্যাগ্রহের সম্বন্ধে তিনি কিছু বিবরণ সংগ্রহ করতে চান, তাই আমি যদি মৈলাপুরে তাঁর আবাসস্থলে একবার আসি তাহ'লে ভাল হয়। এর সঙ্গে তিনি আমাকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণও করলেন। বেলা 12টার সময় আমি মৈলাপুরে গেলে পর অ্যাণ্ড্রুজ সেখানে ছিলেন না। ওখানকার লোকদের বলে গেছেন শীঘ্র ফিরবেন। 1টা বাজার সময়ও তাঁর দেখা নেই। আমার তখন খুব খিদে লেগেছে। প্রায় দুটোর সময় ঘেমে নেয়ে অ্যাণ্ড্রুজ সেখানে এলেন। আমাকে দেখে বল্লেন,—'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। এত দেরী হবে আমি তা ভাবতে পারিনি। আপনি একটু বসুন আমি এক্ষুনি খেয়ে আসছি।'

আমাকে যে তিনি খেতে বলেছেন তা ভুলে গেছেন। কি যে করবো তা আমি ভেবে পেলাম না। এদিকে এত খিদে পেয়েছে যে চুপ করেও থাকতে পারছি না। "মিঃ অ্যাণ্ড্রুজ আপনি আমাকে যে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাকি ভুলে গেলেন"—আমি একথা বলতেই অ্যাণ্ড্রুজ কি রকম যেন হয়ে গেলেন। "ইস্, কি লজ্জার কথা দেখুন তো, হাজার বার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। চলুন খেয়ে আসি" বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খেতে চল্লেন। খাওয়া দাওয়ার পর দু'ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল্লাম। সেই যে আমাদের শেষ দেখা একথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমরা অবশ্য পরস্পরকে চিঠি লিখতাম, কিন্তু এর পরে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েছিলাম। সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক জনসভায় অ্যাণ্ড্রুজের ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশাল হৃদয়ের কাছে শেষবারের মত অঞ্জলি সমর্পণ করেছিলাম।

চার পাঁচ মাস একটানা মাদ্রাজে থাকতে হ'য়েছিল বলে আমাকে মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ ত্যাগ করতে হয়। মাতৃভূমির পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি 1925 সালের 31শে জানুয়ারী সম্পাদকীয়তে এইভাবে লিখেছিলাম—তিন বছর পূর্ণ না হওয়া শিশুর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় পিতার মনে যে দুঃখ বোধ হয়, মাতৃভূমির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তার চেয়ে কম বেদনা আমি বোধ করছি না। আমার সব রকম দুঃখকষ্ট আমি ভুলে যেতাম যখন মাতৃভূমির কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতাম। মাতৃভূমির কাজ করে যাবার ভাগ্য থাকলে তার জন্য আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। নিজের দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা বোধ, ভ্রাতৃত্ব বোধ এবং আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পেলে যে কোন ভারতবাসীই তাকে ভাগ্য বলে মনে করবে। কারোর কারোর সারা জীবন দেশের সেবায় কাটে, তারা ভাগ্যবান। কিন্তু এমন হতভাগ্যও আছে যাদের কপালে দেশকে সেবা করার সুযোগ ঘটে না। আমি তাদের মধ্যে একজন। আমাকে আজ যে মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তার কারণগুলো খুবই গভীর। সম্পাদকের পদ ত্যাগ করছি বলে কাগজের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে এ যেন কেউ মনে না করেন। মাতৃভূমির জন্য যে কলম ব্যবহার করেছি তা আমি সর্বদা ব্যবহার করবো। সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া ছাড়া কাগজের সঙ্গে আর সব সম্পর্ক থাকবে। শুধু তাই নয় সম্পাদকের দায়িত্ব নেই বলে মাতৃভূমিকে সাহায্য করবার বেশী স্বাধীনতা আমার এখন থাকবে। তিন বছর আগে একটা মহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় মাতৃভূমি জন্ম নেয়। আজ মাতৃভূমি কেরলে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেরলে এবং কেরলের বাইরের মালয়ালীরা

মাতৃভূমিকে সাহায্য করবার জন্য সদা প্রস্তুত, এ আমি দেখেছি। মাতৃভূমি সাপ্তাহিকের প্রচার বাড়াতে বোঝা যাচ্ছে যে পাঠকদের এর উপর প্রীতি বাড়ছে। পারিশ্রমিক না বাড়ালেও, নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা না ভেবে দিনরাত মাতৃভূমির জন্য যাঁরা খেটে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে এরকম ভাবে খেটে যাবেন, আমার সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের হাতেই মাতৃভূমি চালানোর ভার রয়েছে। সত্য, সমতা এবং স্বাতন্ত্র্য এই মন্ত্র নিয়ে মাতৃভূমি তার আদর্শ নির্ভয়ে ঘোষণা করবে। মাতৃভূমির এই কাজে সাহায্য করার জন্য আমি পাঠকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীর পদ থেকেও আমি ইস্তাফা দিলাম। পি. রামুন্নি মেনন আমার জায়গায় সেক্রেটারী হলেন।

আমার শাশুড়ী আমাদের সঙ্গে মাদ্রাজে এসেছিলেন। তিনি এ সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মাদ্রাজে মারা গেলেন। আমাদের দুঃখকষ্ট এতে আরো বেড়ে গেল।

স্ত্রীর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপ হ'তে লাগলো। কবিরাজী চিকিৎসা করিয়ে দেখবো ভেবে ফেব্রুয়ারী মাসে পালঘাটে ফিরে এলাম। আমার সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর শুশ্রূষায় সমস্ত সময় নিয়োগ করলাম।

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বছর ক্ষয় রোগে মারা যাচ্ছে। তার পাঁচগুণ লোক এই রোগে ভুগছে। এই সব লোকের বেশীর ভাগই ডাক্তারদের সাহায্য বা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায় না। কি অসহ্য দুঃখজনক অবস্থা এটা। আজকাল ক্ষয়রোগীদের হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন নতুন ওষুধও বার হ'য়েছে। তবুও এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির সঙ্গে লড়ার উপকরণ এখনো যথেষ্ট নয়। ভারতের জনসাধারণ যে পাঁচটি মহাব্যাধিতে ভোগে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ক্ষয়রোগ।

রোগের গুরুত্ব রোগীকে না জানাবার জন্যে বই পড়ে, কথা বলে, ছেলেমেয়েদের দিয়ে গান গাইয়ে স্ত্রীকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতাম। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে স্ত্রীর অবস্থা আরো খারাপ হলো। রাতে ঘুম নেই, পা ফুলতে শুরু করলো, মুখের ভেতর ক্ষত দেখা দিল। কাশতে এবং থুথু ফেলতে পর্যন্ত শক্তি সে হারিয়ে ফেললো। সে যে এত অসহায় এই ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। এক সপ্তাহ এমনভাবে কাটলো। পরের দু'তিন দিন রোগটা যেন একটু কমেছে বলে মনে হল।

1925 সালে 26শে এপ্রিলের অর্ধরাত্রি কেটে গেছে। লক্ষ্মীর ঘরে একটা স্তিমিত প্রদীপ জ্বলছিল। আমি এতক্ষণ জেগে ছিলাম এবার একটু বারান্দায় গিয়ে শুলাম। দু'তিন ঘণ্টা ঘুমোলাম। প্রায় রাত চারটের সময় কে যেন আমাকে ডেকে তুললো। আমি লক্ষ্মীর কাছে ছুটে গেলাম। কাশতে কাশতে কফ বাইরে না বেরোনোর জন্য

চোখদুটো তার গোল গোল হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। আমার লক্ষ্মীর জন্যে অসহ্য কষ্ট হলো। লক্ষ্মী ততক্ষণে তার খোলা চোখদুটি বন্ধ করেছে। কিছুক্ষণ সে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে রইল। বাড়ীর সকলে ইতিমধ্যে উঠে পড়ে রোগীর ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। লক্ষ্মী আর একবার চোখ খুললো, কি যেন বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। মুর্গী আর কাক ডাকছে, ভোর হয়েছে। ঘরে জড়ো হওয়া সকলের দিকে তাকিয়ে রোগিনী কাউকেই চিনতে পারল না। খোলা চোখ দুটি অর্ধেক বন্ধ হলো, শ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেল, তারপর সব শেষ। লক্ষ্মীবিলীন সেই হতভাগ্য ভবনে ততক্ষণে সূর্যের আলো উঁকি মারতে শুরু করেছে।

তেইশ

মরণান্তর জীবন

এমনি ভাবে উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান হলো। লক্ষীর মতো স্ত্রী পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। রাঁধা বাড়া সংসারের সমস্ত কাজ সে করেছে। সংসার খরচের পয়সা না থাকলে সে আমার কাছে মুখ ফুটে পয়সা চায় নি, পাছে আমি কষ্ট পাই, সমস্ত কষ্ট সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। আমি যা খেতে ভালোবাসতাম তা সব রকম অসুবিধার মধ্যেও তৈরী করে খাইয়েছে। লক্ষ্মী বই পড়তে খুব ভালোবাসতো। আমার মতের সঙ্গে তার মত না মিললেও সে কখনো তার বিপরীত একটা কথাও বলতো না। ও রকম ভাবে বল্লে আমি কষ্ট পাব তাই সে চুপ করে থাকতো। কিন্তু তার মুখের মৃদু হাসি দেখে বুঝতে পারতাম যে সে আমার মতের সঙ্গে একমত নয়।

রোগশয্যায় শুয়ে একদিন লক্ষ্মী আমাকে বলেছিল—"আমি মরে গেলেও তোমাকে ছেড়ে যাবো না। আমি তোমার কাছে কাছেই থাকবো। তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা।"

তার এই কথাগুলো তার মৃত্যুর পর আমার প্রায়ই মনে পড়ত। এ কথার সত্যতা থাক বা না থাক লক্ষ্মীকে আমি ভুলতে পারি নি। তার পোষাক, তার ব্যবহৃত অলঙ্কার, তার জিনিষপত্রগুলোকে দেখে ছুঁয়ে আমি যেন তার ছোঁয়া পেতাম। এমনি ভাবে সকলের মাঝে থেকেও একান্ত একাকী আমার দিন কাটতে লাগলো।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা এটাকে খুব সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করি। শুধু যখন আমাদের প্রিয়জনকে আমরা হারাই, শুধু তখনি তার নিষ্ঠুরতা, তার ক্ষতি আমরা বুঝতে পারি। তখন জীবনের ওপর আমাদের আর আসক্তি থাকে না। জীবন এক শূন্যতায় ভরে যায়। এ এমন এক শূন্যতা যাকে আর পূর্ণ করা যায় না। আশে পাশে চারিদিকে লোক থাকলেও আমি একা, সম্পূর্ণ একা এই কথাই বার বার মনে হয়। অন্যদের সান্ত্বনা, আশ্বাস তখন কোনো কাজেই লাগে না। দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে, একলা বসে, আমার প্রিয়তমার মুখখানি চিন্তা করতে করতে, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভেবে চোখের জল ফেলে তখন আমি দিন কাটাতাম।

আমার এই অপুরণীয় ক্ষতিতে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণা আমার ওপর আর নেই

একথা আমার বারবার মনে হলো। এর জন্যে দোষ কি আমার নয়? ঈশ্বরের বিধানে কোনো ত্রুটি, কোনো অন্যায় কি আছে? কালচক্র ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাশক্তির নিয়মও নির্ভুল ভাবে ঘুরে চলেছে। যা আমাদের জানার অসাধ্য তাকে আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে জানতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টায় ঘটনার কার্যকারণ, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাদের অর্থ না বুঝে আমরা ভয় পাই। সাধারণ মানুষের যে ক্ষমতা নেই তা ঋষি আর দার্শনিকদের আছে বলে শুনেছি। আমাদের জানার অসাধ্য কিছু কিছু তাঁরা তাদের দিব্যশক্তি দিয়ে জানতে পারেন। মানুষের মধ্যে না থাকা কিছু কিছু শক্তি ছোট ছোট প্রাণীদের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরুষ আরশোলা বহুদূরে ওড়া মেয়ে আরশোলার গন্ধ পায়। মিষ্টি জিনিষ যেখানেই রাখা হোক না কেন পিঁপড়ে ঠিক সেখানে উপস্থিত হবে। কিছু কিছু জন্তুর মানুষের চেয়ে শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ একথা গবেষণায় জানা গেছে। প্রাণীতত্ত্ব বিশারদেরা বলেন প্রজাপতি এক নাগাড়ে 3000 হাজার মাইল উড়ে যেতে পারে। এই সব যখন জানা যায় তখন জীবনের অগাধ রহস্য, অপার মহিমার দিক্‌টাও আমাদের বিস্মিত ক'রে তোলে।

রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে আমাদের মনে যে সব ভাবনা চিন্তার উদয় হয় তা অনির্বচনীয়। কোটি কোটি নক্ষত্র আমরা সেখানে দেখতে পাই কিন্তু আরো কত কোটি কোটি নক্ষত্র এই আকাশের বুকে লুকিয়ে আছে যা আমাদের চোখে পড়ে না। একথা যখন ভাবি তখন আমরা কত ক্ষুদ্র সেকথা মনে না উঠে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্রতা আর ঈশ্বরের মহিমা তখনই বুঝতে পারি। কিন্তু এই সব ভাবনা চিন্তা আমার মনকে এতটুকু শান্তি দিতে পারে নি। মরণের রহস্য জানার জন্য আমি খুবই উতলা হ'য়ে উঠলাম।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরো পরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।

গীতার এই শ্লোকটিও আমার মনে সান্ত্বনা দিতে পারল না। তখন আমার কাজ করার মন একেবারেই ছিল না। কেন কাজ করবো কার জন্য করবো এই রকম একটা চিন্তা মনে উদয় হ'তো। বই পড়ে মনের শান্তি পেলাম না। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পাওয়া সান্ত্বনা আমাকে এতটুকু উৎসাহ দিতে পারলো না। অবশেষে মনের শান্তি খোঁজার জন্য আমি পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দাশ্রমে এসে উপস্থিতি হলাম।

আমার একজন প্রিয় বন্ধু, দোরাইস্বামী শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে মাঝে মাঝে পণ্ডিচেরীতে

যেতেন। তিনিই আশ্রমে যাবার, শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

1925 সালের আগস্ট মাসে একদিন সকাল বেলায় আমি পণ্ডিচেরীতে এসে উপস্থিত হলাম। সকাল 11 টার সময় শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করার সময় ঠিক করা হয়েছিল।

অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে হলে কাছের পুলিশ ষ্টেশনে জানাতে হবে এই ছিল তখনকার নিয়ম। পূর্বজীবনে অরবিন্দ ঘোষ একজন বিপ্লবী ছিলেন। রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেও তাঁর ওপর থেকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ যায়নি। তাই তাঁর সঙ্গে যারাই দেখা করতে আসতো তাদের সমস্ত বিবরণ পুলিশকে দিতে হ'ত। আমিও আমার আগমনের উদ্দেশ্য, কতদিন সেখানে থাকবো সবই পুলিশকে আগের থাকতে জানিয়েছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের এক ছোট ভাই সে সময় আশ্রমে বাস করছিলেন। তিনি আমাকে আশ্রমের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করার সময় হ'লে পর একজন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ওপরে থাকতেন। তখন বছরে একবার দর্শন দেবার ব্যবস্থাটা চালু হয়নি। রোজ দুপুরে খানিকক্ষণ তিনি বারান্দায় এসে বসতেন। সেইটাই ছিল দর্শনের সময়। সেদিন আমি একাই ছিলাম, তাই আধঘণ্টারও একটু বেশী সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার ঘটেছিল।

তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ। একটু মোটা সোটা শরীর। মাথা আর দাড়ির চুল লম্বা। একটা সাদা ধুতি আর একটা সাদা চাদরে তাঁর দেহ ঢাকা ছিল। কথা বলছিলেন খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে। মাঝে মাঝে কোনো কথা জোর দিয়ে বলার সময় হাত নেড়ে সেটার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। মুখ তাঁর অনাবিল শান্ত, হাসি প্রায় ছিল না বল্লেই হয়।

প্রথমটা আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। কি তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। কেমন ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করবো। কিন্তু সে খুব অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুর পর কি অবস্থা হয় সেটা জানতে চেয়েছিলাম। মৃত্যুর পর কি সব শেষ হ'য়ে যায়? অথবা মৃত্যু আর একটা অন্য লোকের পথ দেখায়? মৃত লোকদের প্রেতাত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলার কাহিনী আমি বইয়ে পড়েছি, একি সত্যি? বিশ্বাসযোগ্য? মৃত ব্যক্তিদের কি দেখা যায়? অন্য লোকে অন্য রূপে থাকার সময় মৃত ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে তাদের প্রিয়জনের কথা কি ভাবে? তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইলে কি সেটা পছন্দ হবে? এমনিভাবে অনেক কিছু তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার কোনো কোনো প্রশ্ন হয়তো তাঁর কাছে ছেলেমানুষের মতো মনে হ'য়েছে।

মৃত্যুর পর সব শেষ হ'য়ে যায় না। মৃত্যু শুধু একটা অবস্থার পরিবর্তন, কোনো বিশেষ পরিবেশে প্রিয়জনদের সঙ্গে মৃত্যুর পরও সম্পর্ক রাখা সম্ভব বলে তিনি আমাকে বলেছিলেন।

মৃত্যু একটা অবস্থার পরিবর্তন, জীবন এই দেহ ছেড়ে গেলেও তার শেষ হয় না একথা আর এক মহান ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন। আপনার সঙ্গে যেমন কথা বলছি তেমনি প্রেতলোকে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব—একথা শ্রীঅরবিন্দ যখন বল্লেন তখন 'তা সম্ভব নয়' একথা বলার সাহস আমার হলো না। কিন্তু একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা বলে যখন ফিরছি তখন তাঁর একজন ভক্ত কিছু ফুল তাঁর সম্মুখে রেখে তাঁর পাদস্পর্শ করলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় কি যে সব আবেগ আর চিন্তায় আমার মন ভরে গিয়েছিল সে সব কথা এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু কি যেন একটা অস্পষ্ট আলো দূরে দেখতে পেয়েছিলাম। আহার, নিদ্রা, স্নেহ, ঘৃণা, দেওয়া নেওয়া, এইই জীবন নয়। এসবের ওপরে জীবনের কি যেন একটা অর্থ, কি যেন একটা উদ্দেশ্য আছে বলে আমার তখন মনে হ'য়েছিল।

এই সময় এবং এর কিছু পরেও মরণের পর জীবনের কি হয় তা জানার ইচ্ছা আমার ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এই বিষয়ে আমি বহু বই পড়লাম। 'মরণের আগে', 'মরণের সময়', 'মরণের পরে', এই শিরোনামায় এক ফরাসী লেখকের লেখা তিনটি বই আমার খুবই ভালো লেগেছিল। এই বইগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বাস্তব ঘটনা আর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে বেরোনো 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' সাপ্তাহিকটি আমি নিয়মিত পড়তাম। এতে অবিশ্বাস করার অনেক কিছু ছিল কিন্তু তাহলেও এর কতকগুলো কাহিনী আমার মনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বক্তৃতা ও রচনা' এই সিরিজের সাতখানা বই আমি অনেকবার পড়েছি। এখন মনে উৎসাহ জাগানোর জন্যে আবার সেগুলো পড়লাম। যারা আত্মশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা এই বইগুলি থেকে তা লাভ করবে।

ভগবৎগীতার শ্লোক থেকেও আমি সান্ত্বনা লাভ করতে চেষ্টা করেছিলাম। গীতা অবশ্য রোজ পড়তাম না। এক একটা সংকটের সময় মনে সাহস জোগাবার অংশগুলো বারবার পড়তাম।

আমাদের অজানা অনেক বিষয়ে, জানার অসাধ্য কতকগুলো বিষয়ে বিশেষ কোনো মতের প্রকাশ করা খুবই সাহসের পরিচয়। আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কোন ঘটনার কথা কেউ যদি বলে তা শুনে 'অসম্ভব', 'কি সব বোকার মত কথাবার্তা'

এসব বলা ঠিক নয়। এক সময় যা অবাস্তব বলে আমরা বিশ্বাস করে এসেছি তা এখন বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে এমন ঘটনার অভাব নেই। প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ বলে কোনো কোনো ঘটনাকে এখন প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বলে আমরা বুঝতে পেরেছি।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাসের সময় সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতো এই লোকে বিশ্বাস করতো। 1543 সালে কোপার্নিকাসের বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী ঘুরছে বল্লে পর জনসাধারণের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণাকে ভেঙে দেওয়ার অপরাধে তাঁকে অপরাধী করা হয়েছিল। তেমনি ভাবে সেই সব অমর বৈজ্ঞানিকেরা সেই গ্যালিলিও, ব্রুণো—তাঁরাও শাসনকর্তাদের কোপদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। আজ তাঁদের মত সারা পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে।

এমনি ভাবে একদিন মরণের পরের অবস্থা জানা সম্ভব হবে। তখন অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন আসবে না। এখনো সে অবস্থায় আমরা পৌঁছুইনি। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকরা যা বলেন তা আমাদের বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে মেনে নেওয়া উচিত। কিছু কিছু বিশ্বাস আমরা মেনে নিতে পারিনি বলে তাদের অবহেলা করাটা ঠিক নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের পুনর্বিচার করা এবং তাদের সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করা আমাদের উচিত।

চব্বিশ

মালয় যাত্রা

1925 সালের জুলাই মাসে আমি আবার মাদ্রাজে ওকালতি শুরু করলাম। চার বছর প্র্যাকটিশ ছেড়ে দেওয়ার ফলে কেস পেতে আমার দেরী হতে লাগলো। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকার মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। বন্ধুরা বলাবলি করছিল—"আবার কবে এসব দরকার নেই বলে মেনন চলে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। মেননের পছন্দ হচ্ছে পলিটিক্স্।" আমার সম্বন্ধে এ রকম ধারণা অনেকের ছিল, তাতে আমার প্র্যাকটিশ করার পক্ষেও খুবই অসুবিধা হয়েছিল।

খরচ চালানোর টাকা হাতে না থাকলে দেশের কাজেও সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঢেলে দেওয়া যায় না। তাই যতদিন না ভাল প্র্যাকটিশ হচ্ছে ততদিন অন্য আর কিছু না ক'রে ওকালতিতে সমস্ত মনোযোগ দেব বলে ঠিক্ করলাম। আমার হিতাকাঙ্ক্ষীদের কেউ কেউ উপদেশ দিল—"বাজে কাজে মাথা না ঘামিয়ে প্র্যাকটিশে মনোযোগ দিলে এতদিনে অবস্থার উন্নতি করতে পারতে। এখনো যদি এদিকে মন দাও তাহলে যথেষ্ট আয় করতে পারবে।"

আমার পরিবারটি বেশ বড় ছিল। আমি দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলাম—লক্ষ্মীর বোন আম্মুকে। আম্মু দুটি পুত্রকে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। আম্মু খুব শান্ত আর কোমল স্বভাবের ছিল। তাই আমার নতুন পারিবারিক জীবন সুখেরই হ'য়েছিল। আম্মু খুব হিসেব করে চলতে পারতো। কিন্তু কষ্টেসৃষ্টে চালালেও টাকার দরকার। তাই টাকার অভাবে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম।

"ধার চেও না বা ধার দিও না" বলে সেক্সপীয়র যে উপদেশ দিয়েছেন তা যে খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন তা আমার মনে হয় না। যাদের ধার করতে হয় না তারা যে ভাগ্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর যখন কোনো বন্ধু ধার চায় তখন তাকে ধার দিয়ে সাহায্য করাটাও তার চেয়ে বড় ভাগ্য। তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দিলে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দ তখন অনুভব করা যায়।

কিন্তু ধার চাওয়ার ব্যাপারটা সে রকম নয়। ধার চাওয়ার মত হীনতা আর কোনো কিছুতেই নেই। দীনবন্ধু ঈশ্বর যদি আমাকে কোনো বর দিতে চান তাহলে 'ধার চাওয়ার দীনতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন'—এই হবে আমার প্রার্থনা। আমাকে

যে কতবার এই হীনতা সহ্য করতে হয়েছে। এক একবার মনে হয়েছে এমনি দেনাদার হয়েই কি সারা জীবনটা কাটাতে হবে? কাউকে কিছু ফেরত দেবার নেই এই তৃপ্তি কি আমার কোনোদিনই হবে না? এমনি সব কথা আমি প্রায়ই ভাবতাম।

মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করার সময় একদিন পি. কে. নাম্বিয়ার নামে এক ব্যারিষ্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মিঃ নাম্বিয়ার বহুদিন পেনাঙে প্র্যাকটিশ করছেন এবং খুব নাম ও টাকা করেছেন। তিনি আগে মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করতেন। মালয়ে ব্যারিষ্টারদের প্র্যাকটিশের ব্যাপারে তিনি আমাকে অনেক খবর দিলেন। আমি যদি সেখানে যেতে রাজী হই তাহ'লে তার জন্যে যথোচিত সাহায্য করবেন বলেও বল্লেন। আমার সেই অবস্থায় নাম্বিয়ারের সঙ্গে হঠাৎ এই দেখা হ'য়ে যাওয়াটা একটা আশীর্বাদের মতো আমার মনে হলো। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর মালয়ে যাবার আগ্রহ আমার হল। আমি অবশ্য তক্ষুনি কিছু ঠিক করিনি। ভেবে চিন্তে তাঁকে পেনাঙ-এ লিখবো বলে জানালাম।

পি. কে. নাম্বিয়ারের সঙ্গে দেখা হবার বেশ কিছুদিন আগের একটা ঘটনার কথা এখানে বলি। একদিন সকালবেলা এক সন্ন্যাসী আমার বাড়ী এসে হাজির। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ মাথায় লম্বা চুল, ছেঁড়া গেরুয়া বস্ত্র পরণে, হাতে একটা দণ্ড। আমি তাঁকে পয়সা দিতে গেলে পর তিনি নিলেন না। তাঁর কাপড়ের দরকার বল্লেন। আমি তাঁকে একটা কাপড় দিলাম। তখন তিনি সামনের গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি হাতে পেলাম ভস্ম। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই কি একটা আশ্বাসে আমার সারা মন ভরে গেল। "আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে জাহাজে করে সমুদ্র পেরিয়ে খুব শীঘ্র অন্য একটা দেশে যাবেন"। আমি মালয়ে যাবার চার পাঁচ মাস আগের ঘটনা এটা। সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হবার সময় মালয়ে যাবার আমার কোনো প্ল্যানই ছিল না। দু'তিন মাস বাদে আমি যখন মালয় যাওয়া ঠিক করলাম তখন এই সন্ন্যাসীর কথাগুলো মনে পড়লো।

মাদ্রাজে দ্বিতীয় বার প্র্যাকটিশ শুরু করার এক বছর পরে আমার প্রথমা কন্যা চেল্লাম্মা অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। তার মা'র অসুখ তাকে ধরেছিল। দশ মাস সে অসুস্থ ছিল। ডক্টর পাই তার চিকিৎসা করেছিলেন। কবিরাজী ক'রেও দেখলাম, কোনো ফল হ'ল না। দিন দিন সে ক্ষয়ে যেতে লাগলো। অর্থাভাবে তখন আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। একদিন তার কাছে যখন বসে আছি সে আমাকে বল্ল:

—বাবা এ সবের কি মানে হয় বলুন তো? পয়সার জন্যে আপনার এই দুশ্চিন্তা? আমার এই অসুখ সারা? আচ্ছা আমরা কি পাপ করেছি যার জন্যে এইরকম ভুগছি?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। অনেকবার এ প্রশ্ন আমাকে বিচলিত করেছে—তবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম—এ রোগ সারবে না কে তোকে বল্ল? তুই এমন কথা ভাবছিস কেন?

মৃত্যু এগিয়ে আসছে—এমন একটা অনুভূতি তার হ'য়েছিল। এই নিয়ে সে মাঝে মাঝে আমাকে বলত। মৃতদেহ শ্মশানে কি ভাবে নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়েও সে আমাকে নির্দেশ দিত।

একদিন সে আমাকে বল্ল—"আত্তারচিরার কুয়োর জল খাবার ইচ্ছে হয়েছে আমার।" ওলাভাকোটের কাছে আমাদের যে বাড়ীটা ছিল তার নাম ছিল আত্তারচিরা। আমি তক্ষুনি একথা ওলাভাকোটের বাড়ীতে জানালাম। পরের দিন সেই কুয়োর জল এক বোতল নিয়ে ওলাভাকোট থেকে একজন মাদ্রাজে এল। খুব আগ্রহের সঙ্গে চেল্লাম্মা জলটা খেল। এর ঘণ্টা দুই পরে সে বেশ খানিকটা রক্ত বমি করলো। তারপর খুব ক্লান্ত হ'য়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। দুপুরের পর তার মুখে একটা প্রসন্নভাব ফিরে এল। রাতে শুতে যাবার সময়ও তার সেই একই অবস্থা ছিল। আমি সব সময় তার কাছে কাছে ছিলাম। রাত একটার সময় সে আমায় ডাকলো। ভাই বোনদের সব ডেকে আনতে বল্ল। তারা সব এলে পর তাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে "বাবা আমি চল্লাম" এই কথাগুলি বলে সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

মরণ হয়তো একটা অবস্থার পরিবর্তন। কিন্তু আমার মেয়ের শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে আমি এই বিশ্বাস থেকে কোনো শান্তি বা আশ্বাস পেলাম না। সকলের যা হয় আমারও তা হয়েছে। জীবনের পথে অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয় কিন্তু তার জন্য জীবনের যাত্রা বন্ধ থাকে না।

মরার সময় আমার মেয়ের বয়স ছিল আঠারো। "আমার তো বয়স বেশী হয়নি, আমার জীবন তো সবে শুরু হ'য়েছে আর এখনি তা শেষ হ'তে চললো" একদিন এমনি ভাবে এই কথাগুলি সে আমাকে বলেছিল। তার এ কথাগুলো আমি কোনদিনও ভুলব না।

"ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাও। তাঁর দেওয়া আলো তোমার ভেতর প্রবেশ করুক। সেই মহাশক্তির সঙ্গে তোমার বন্ধন দৃঢ়তর হোক। শোয়া, বসা, চলা সবসময় যেন একথা তোমার মনে থাকে। যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে এই শক্তি তোমাকে রক্ষা করবে"—এই কথাগুলি স্মরণ করে তখন আমি নিজেকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করেছি।

মাদ্রাজ ছেড়ে যাবার ইচ্ছা আমার ক্রমেই বাড়তে লাগলো। মালয়ে আমার

কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে সেখানকার সবকিছু জানাতে বলে চিঠি লিখেছিলাম। তারাও আমাকে সেখানে আসার জন্যে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলো। মালয়ে যাব বলে ঠিক করলাম। যাবার পথ খরচ হাতে না থাকলেও আমি যাব বলে ঠিক করলাম।

রোজকার খরচ জোগানোই তখন আমার পক্ষে মুশকিল ছিল। তার উপর আমার এবং পরিবারের সকলের জাহাজ ভাড়া জোগাড় করা যে কি অসম্ভব ব্যাপার তা আমার জানা ছিল। তবু আমার পরিবারকে রেখে আমার একা যাবার ইচ্ছা ছিল না। টাকার যখন খুব দরকার তখন ধার পাওয়া যায় না। ধার চাইতে গেলে লোকের রাগ বা বিরক্তি ধরলে তাদের দোষ দেওয়াও যায় না। কত রকমের ছুতো, কত রকমের উপদেশ যে তখন আমি শুনেছিলাম। তবুও আমার এই বিপদের সময় আমাকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছেন যে দু'টি বন্ধু কুট্টিকৃষ্ণ মেনন এবং নীলকণ্ঠ নাম্পুতিরি, তাদের আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। বাড়ীর জিনিষপত্র বিক্রী ক'রে, ধারধোর করে যে টাকা জোগাড় করলাম তা জাহাজ ভাড়া আর পথের খরচের মাত্র।

1927 সালের আগস্ট মাসে আমি মাদ্রাজ ছাড়লাম। কোনো একটা জায়গায় থাকাকালীন সেখানে যে অভিজ্ঞতা হয় তাতে সেই জায়গায় ওপর আমাদের ঘৃণা বা ভালোবাসা জাগে। মাদ্রাজে যে খারাপ অভিজ্ঞতা আমার হ'য়েছিল সেই অভিজ্ঞতার জন্যেই মাদ্রাজ ছাড়তে আমার কষ্ট হয় নি। বেলা চারটের সময় আমাদের জাহাজ ছাড়লো। মাদ্রাজের চোখের সামনে থেকে মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা ডেকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই জাহাজে অনেক শ্রমিক ছিল। মালয়ে যাবার যে কোনো জাহাজে এই শ্রমিকদের দেখা যায়। তাদের বসার, খাওয়ার, শোবার কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না। জাহাজের অফিসারদের ব্যবহারও ভালো ছিল না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুলীর কাজ করবার জন্য ভারত থেকে লোক পাঠানো হয়েছিল। এদের পাঠাতো সাদা চামড়ার লোকেরা তাদের দরকার মতো। মালয়, সিংহল, মরিশাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিস, ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি জায়গায় ইংরেজেরা ভারতীয় কুলীদের পাঠিয়েছিল। এতে হয়তো আমাদের দেশের জনসংখ্যার ভীড় কমানো সম্ভব হয়েছে অথবা দেশের উপসম্পদ্ বাড়ার সাহায্য হয়েছে। কিন্তু এতে আমাদের দেশীয় সম্ভ্রম আর আত্মমর্যাদার হানি হয়েছে। ভারতবাসীরা কুলী এই রকম একটা মনোভাব বাইরের দেশগুলোতে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে পর সেখানকার ভারতীয়দের সমস্যা আমাদের এবং সে দেশের বিরাট একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার শেষ এখনো হয়নি।

এই জাহাজে কয়েকজন ভারতীয় অফিসারও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হ'ল মালয়ে জীবন সুখেরই হবে। মাদ্রাজের খারাপ স্মৃতিগুলো ক্রমে মন থেকে মুছে যেতে লাগলো। তবে যখন একা থাকতাম তখন নানা চিন্তা কখনো আমাকে উৎসাহে ভরে দিত কখনো চিন্তাকুল করে তুলতো।

সকালবেলা সমুদ্রের মধ্যে থেকে ওঠা সূর্যের মনোহর দৃশ্য, সন্ধ্যার সময় সেই সমুদ্রে ডুবে যাওয়া অস্তমিত সূর্যের ম্লান রশ্মিগুলি আমার মনকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দিত। ফসফরাস জ্বলা ঢেউগুলি আর আকাশে ঝিক্‌মিক্ করা কোটি কোটি তারাগুলো দেখে মনের মধ্যে অদ্ভুত এক আবেগ জাগতো।

ফেলে আসা দিনগুলি সম্বন্ধে নানা চিন্তা একটার পর একটা আমার মনে জেগে উঠতে লাগলো। আমার তখন বয়স 41 বছর। এত বয়সেও অন্যের সাহায্য ছাড়া পরিবার পোষণ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার বয়সী বন্ধুরা আজ কত উঁচুতে পৌঁচেছে। আমার সঞ্চয় হচ্ছে শুধু দেনা। যখন ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে সুখে স্বচ্ছন্দে কাজ করে যাওয়া উচিত তখন এক নতুন জীবনের অন্বেষণে এক অজানা দেশে আমি পাড়ি দিচ্ছি। জীবনের ব্যবহারিক দিক্‌টা আমি অবহেলা করেছি। তার শাস্তি আমাকে পেতে হয়েছে। প্রথমেই দরকার ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। এখন থেকে অন্ততঃ এই দিকে দৃষ্টি দেব ঠিক করলাম।

তবে এতদিন যে ভাবে আমি জীবন কাটিয়েছি তা যে আমার পরাজয় তা মানতে আমার মন চায় না। হয়তো অনেক অনেক বিষয়ে ঠিকমতো ভেবে চিন্তে করা হয়নি, কিন্তু তার জন্যে জীবন নষ্ট হয়েছে তা কি বলা যায়? যদি অর্থ উপার্জনের কথা ধরা যায় তাহ'লে আমার বিরাট পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু অর্থ উপার্জন কি জীবনের জয় পরাজয়ের মানদণ্ড? জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতার দরকার। তা আত্মনির্ভরতা ও সাহস বাড়াতে আমাদের সাহায্য করে। জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটাতেও হয়তো শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে যদি জীবন কাটানো যায় তাহ'লে দুরদৃষ্টের আঘাতগুলি অত অসহ্য বলে মনে হয় না।

দুঃখের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে জীবনে জয় লাভ করেছিল এমন অনেক মহৎ লোকের কথা আমার মনে পড়ল। জীবনে পরাজয়ের একটা কারণ আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতা বা শক্তির ঠিকমতো ব্যবহার না করা। যেমন করে হোক জীবনটা কাটিয়ে দিলেই হ'লো এইই হচ্ছে বেশীর ভাগ লোকের মনোভাব। জীবন যে একটা দায়িত্ব সে কথা আমরা মনে করি না। জীবনের যে একটা লক্ষ্য, একটা উদ্দেশ্য আছে সে কথা

আমরা জানি না। বিরাট একটা কিছু লাভ করারও আমাদের আকাঙ্ক্ষা নেই। কিন্তু এই সবই তো এ সংসারকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। আজ আমরা যেসব সুখসুবিধা ভোগ করছি তার কারণ এগুলি।

25শে আগস্ট জাহাজ স্বেটনহাম বন্দরে পৌছোলো। আমি পূর্ব নির্ধারিত মতো পেনাঙে গেলাম। পি. কে. নাম্বিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই বীরস্বামী নামে কুয়ালালামপুরের একজন ব্যারিস্টারকে আমার কথা লিখেছিলেন। এঁর সঙ্গে আর একজন ব্যারিস্টার ছিলেন জি. কে. নারায়ণন্। তাঁর সঙ্গে আমার মাদ্রাজেই পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য নেবেন বলেছিলেন। তাই আমি কুয়ালালামপুরে গিয়েছিলাম। জি. কে. নারায়ণন্ আমাকে অভ্যর্থনা করতে বন্দরে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে নামার সময় আমার হাতে মাত্র 16 টাকা ছিল। সেটা বদলে 10 ডলার করে আমি এবং আমার পরিবার মিঃ নারায়ণনের বাড়ীতে উঠলাম। এমনিভাবে মালয়ে আমি আমার নতুন জীবন আরম্ভ করলাম।

পঁচিশ

নতুন জীবন

আজকের থেকে তখন মালয়ের অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। পেনাঙ, মালাক্কা সিঙ্গাপুর ইত্যাদি জায়গাগুলি তখন বৃটিশ শাসনে ছিল। একে তখন বলা হত 'স্ট্রেট সেটেল্‌মেণ্ট।' এর রাজধানী ছিল সিঙ্গাপুর। মালয়েতে তখন ন'টি প্রদেশ ছিল। চারটি প্রদেশ পেরাক, সিলাউকুর, নিগরী সেম্বিলান, পাহাং একটি শাসনের অধীনে ছিল। এটা তখন এফ. এম. এস. এই নামে পরিচিত ছিল। এর রাজধানী ছিল কুয়ালালামপুর। এই চারটি রাজ্যের সুলতানদের নামে ইংরেজরা শাসন করতো। অন্যান্য পাঁচটি প্রদেশ সেখানকার সুলতানেরাই শাসন করতো। তবে শাসন ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট অফিসার ছিল। নামে উপদেষ্টা হলে'ও আসলে রাজ্যশাসন তারাই করতো। এমনি ভাবে তিন রকমের শাসন ব্যবস্থা তখন মালয়ে চালু ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর মালয় রাজ্যের সব প্রদেশগুলো নিয়ে একটা ফেডরেশান গঠন করা হ'য়েছিল। এখন মালয় আর সিঙ্গাপুর দুটো আলাদা রাজ্য হয়েছে।

প্রায় 60 লক্ষ লোকের মধ্যে তখন শতকরা 44 জন ছিল মালয়ের অধিবাসী। বাকী শতকরা 38 জন চীনা, শতকরা 11 জন ভারতীয়, বাকী ইউরোপীয় ও অন্য জাতির। এখানকার ভারতীয়রা শতকরা 85 জন রবারের বাগান, মিউনিসিপ্যালিটি বা পূর্তবিভাগে কাজ করতো। বাকীরা ছোটখাটো অফিসার, কেরানী, শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার ও দোকানপাটের ব্যবসা করতো।

মালয় বেশ ধনী রাষ্ট্র। জঙ্গল কাটিয়ে এখন ভালো রাস্তা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী এবং অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থা করা করা হয়েছে।

সে সময় মালয়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক জাগরণ কিছুই হয়নি। ভারতীয়দের মধ্যেও এই চেতনা ছিল না।

এখানে ওকালতি করার মধ্যে কতকগুলো বিশেষত্ব আছে। ভারতীয় উকিলদের এখানে প্র্যাকটিশ করতে দেওয়া হয় না। ব্যারিস্টার আর সলিসিটরদের মাত্র দেওয়া হয়। এখানকার একটা বিশেষ পরীক্ষা পাশ করলে প্র্যাকটিশ করতে দেওয়া হয়। তবে এ ধরনের উকীল খুব কমই ছিল। বৃটিশ ব্যারিস্টার আর সলিসিটরদের সংখ্যাই

কমই ছিল। বৃটিশ ব্যারিস্টার আর সলিসিটরদের সংখ্যাই সেখানে বেশী দেখেছিলাম। কিছু চীনা এবং ভারতীয় ব্যারিস্টারেরাই ছিল। কুয়ালালামপুর আর সিঙ্গাপুরে একটা করে সুপ্রীম কোর্ট ছিল।

মালয়ে উকীলেরা একা একা প্র্যাকটিশ খুব কমই করতো। তিন চারজন বা তারো বেশী লোক একটা কোম্পানী করে প্র্যাকটিশ করাটা ছিল নিয়ম। এই রকম কাজের কতকগুলো সুবিধা আছে। কেউ কেউ হয়তো কোর্টে গিয়ে মামলার সওয়াল করা পছন্দ করেন। কেউ কেউ কোর্টে যেতে পছন্দ করেন না, অফিসে বসেই মক্কেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাগজপত্র তৈরী করতে ভালোবাসেন। এমনি ভাবে প্রত্যেকের তাদের নিজেদের ইচ্ছে এবং পছন্দ মতো কাজ করা সম্ভব নয়। নতুন প্র্যাকটিশ আরম্ভ করার সময় এই রকম কোনো কোনো কোম্পানীর ভেতর ঢুকলে তাহ'লে তাকে কেসের জন্য হাঁ করে বসে থাকতে হয় না। কিছুদিন এই কোম্পানীতে বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে কাজ দেখে পরে তার অংশীদার হ'য়ে যোগ দিতে পারে। সকলে যে যার খুশী ফী চাইতে পারবে না। যা টাকা পাওয়া যেত তার একটা সাধারণ হিসেব রাখা হতো। অফিসের খরচের পর যা বাকী থাকতো সকলে সমান ভাগ করে নিত। একই কোম্পানীর লোকেরা একাধিক জায়গায় অফিস খুলে প্র্যাকটিশ করতে পারতো। প্রধান অফিস এক জায়গায় থাকতো, শাখা অফিসগুলো অন্য জায়গায়। এই ছিল মালয় আর সিঙ্গাপুরের ওকালতি করার ধরন।

'স্থানর্ডাস অ্যাণ্ড কোম্পানী' নামে সিঙ্গাপুরে দুজন ভারতীয় প্র্যাকটিশ করছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জি. কে. নারায়ণন্ আর বীরস্বামী। বীরস্বামী ওখানকার নিয়মসভার ভারতীয় সদস্য ছিলেন। সততা আর বাগ্মিতার জন্য তিনি ব্যারিস্টার হিসেবে খুব নাম করেছিলেন। কুয়ালালামপুরে প্রায় একশ মাইল দূরে মালাক্কা বলে একটি জায়গায় নতুন অফিস খুলে তার ভার আমাকে তাঁরা দিলেন। মালয়ের নিয়ম অনুসারে ছ'মাস সেখানে বাস করার পর প্র্যাকটিশ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই ছ'মাস আমাকে কিছু টাকা বেতন হিসেবে দিতে আর ছ'মাস পরে বেতন বাড়িয়ে দেবেন বলে তাঁরা ঠিক করেছিলেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী এক সপ্তাহ পরে আমি পরিবারসহ কুয়ালালামপুর থেকে মালাক্কায় গেলাম। কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে কেস চালাবার জন্যে কুয়ালালামপুর থেকে সপ্তাহে একবার নারায়ণন্ অথবা বীরস্বামী মালাক্কায় আসতেন। এমনি ভাবে ছ'মাস কাটলো। যে বেতন আমি পাচ্ছিলাম তা দিয়ে সংসার চালাতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ছ'মাস পরে যে বেতন তাঁরা দেবেন বলেছিলেন, তা' এমন কিছু লোভনীয় ছিল না। তা ছাড়া সনদ্ কিনতে আমার

500৲ ডলার ধার করতে হ'য়েছিল। সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা একটুও ভালো বলে আমার মনে হ'ল না। তাই এই কোম্পানী থেকে আলাদা হয়ে নিজে নিজে প্র্যাকটিশ করবো ঠিক করলাম। তার সব প্রস্তুতিও অনেক কষ্টে করলাম।

কিছু মূলধন না থাকলে মালয়ে প্র্যাকটিশ করাটা সম্ভব ছিল না। শুধু বাড়ী ভাড়া নয়, অফিসের ভাড়া দিতে হবে, ফার্নিচার কিনতে হবে। যতদিন না প্র্যাকটিশ ভালো করে জমে ওঠে ততদিন অর্থাৎ তিনচার মাস অফিস চালানোর টাকা চাই। চার পাঁচজন কেরানীর মাইনে এবং অন্যান্য খরচ মিলিয়ে বেশ কিছু টাকা প্রতি মাসে চাই। আমার হাতে তখন একটাও পয়সা নেই। স্ট্যানর্ডাস কোম্পানী ছেড়ে দিয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন বাড়ী ফিরছিলাম, তখন তার পরের দিন কি করে কি করবো আমি নিজেই জানতাম না।

এক সপ্তাহ এমনি ভাবে কেটে গেল। ছ'মাস এখানে থাকার ফলে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল। তাদের মধ্যে একজন অফিস খোলার জন্য 1000৲ হাজার ডলার দেবেন বল্লেন। এমনি ভাবে এই ভদ্রলোকের সাহায্য নিয়ে 1928 সালের জুন মাসে মালাক্কায় প্র্যাকটিশ আরম্ভ করলাম। অল্প দিনের মধ্যে সেখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে মুব্বার নামে একটা জায়গায় আর একটা অফিস খুললাম। এই জায়গাটা জোহর ষ্টেটে। সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি আমি মালাক্কায় থাকতাম, আর শনি রবিবার মুব্বারে যেতাম। জোহরের সুলতান মুসলমান বলে সেখানে বৃহস্পতি আর শুক্রবার ছুটির দিন ছিল। এমনিভাবে একটুও বিশ্রাম না নিয়ে আমি সাত দিন একটানা খেটে গেছি।

আমার মক্কেলের অনেকাংশ ছিল চীন, তামিল আর মালয়ের অধিবাসী। তাদের ভাষা জানা কেরানীর দরকার। মক্কেলের বক্তব্য লিখে নিয়ে তারপর ইংরিজীতে তর্জমা করে ষ্টেটমেণ্ট তৈরী করতে হত। কেরানীরা এই কাজ করতো। তাদের বলা হ'তো কেস ক্লার্ক। কোর্টে গিয়ে কাগজপত্র ফাইল করা, বিচারে যে কেসগুলো পড়েছে সেগুলোর সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং অন্যান্য কাজের জন্য একজন করে কোর্ট ক্লার্কের দরকার ছিল। জমির ব্যাপারে দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি রেজিষ্ট্রি করা, ল্যাণ্ড অফিসে গিয়ে অন্যান্য কাজ করার জন্য একজন ল্যাণ্ড ক্লার্কের দরকার ছিল। দলিল লিখে ঠিকঠাক করার জন্য একজন কনভেনসিং ক্লার্ক, আর এসবের ওপর টাইপিস্ট, বেয়ারা এমনি ভাবে এক একটা অফিসে আটদশজন ক'রে লোক ছিল। দুটো অফিস মিলিয়ে মাসে 1000 ডলারের ওপর লাগতো। এ ছাড়া আমার সংসারের খরচ ছিল আলাদা।

অফিস খোলার অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ভালোমত উপার্জন আরম্ভ হ'লো। আমার দুঃখকষ্ট এতদিনে দূর হলো। সুসময় এসেছে দেখে খুব খুশী ভাবেই আমার দিনগুলো কাটাতে লাগলাম। এই রকম ভাবে চললে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারবো এ আশা আমার মনে দৃঢ় হলো।

মালাক্কা তখন একটা বড় শহর ছিল না। 15 শ' শতাব্দীতে পর্তুগীজেরা মালাক্কায় এসেছিল। অনেক বছর মালাক্কা তাদের প্রধান আবাসস্থল ছিল। পর্তুগীজ সভ্যতার অনেক ছাপই এখানে ছিল। পর্তুগীজ বংশোদ্ভুত অনেক লোক মালাক্কায় আছে। তাদের ভাষাও পর্তুগীজ।

মালাক্কায় চীন আর মালয়ী ছাড়া তখন বহু ভারতীয়ও ছিল। 'মালাক্কা ইণ্ডিয়ান' বলে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক সেখানে আছে, তবে তাদের সংখ্যা কম। এদের পূর্বপুরুষেরা তামিল ছিল কিন্তু তারা তামিল সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। তারা মালয় ভাষায় কথা বলে। একটু এদিক ওদিক্ বদলে তারা হিন্দুদের সমস্ত আচারবিচার পালন করে।

রবারের বাগানগুলিতে অনেক মালয়ালী কেরানী আর অফিসারও ছিল। কাজকর্মের পর সন্ধ্যাবেলায় একসঙ্গে বসে আমোদপ্রমোদে কিছু সময় কাটাবার জন্যে একটা ক্লাব করবার চেষ্টা আমিই প্রথম করেছিলাম। এই ক্লাব গঠন করার ফলে এখানকার ভারতীয়দের একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য এসেছিল। রোজ এখানে নানা ধরনের ভারতীয়রা একসঙ্গে হ'য়ে ক্লাবের কাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে চালাতেন। সে বছর আমরা দীপাবলীর সময় ক্লাবে সৌখীন দ্রব্যের বাজার দিয়েছিলাম। তিনদিন ধরে এই এই বাজার চলেছিল, এবং এতে ভাগ নিতে বহুদূর থেকে ভারতীয়রা মালাক্কায় এসেছিল। দু'বছর আমি এই ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলাম। এই ক্লাব এখনো খুব ভালো ভাবে কাজ করছে।

আমার কয়েকজন পুরানো বন্ধু আমার মালাক্কা বাসকালে সেখানে এসেছিলেন। অন্ধ্রের নেতা টি. প্রকাশম্ আর তাঁর পত্নী এঁদের মধ্যে পড়েন। প্রায় এক সপ্তাহ তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল যা আমার মন থেকে আজো মুছে যায় নি।

একদিন সকালে প্রকাশম্, তাঁর স্ত্রী আর আর আমি আমার গাড়ীতে মালাক্কা থেকে একটা জায়গায় রওনা হলাম। মালয়ের রাস্তাঘাট সাধারণতঃ ভালো। আমার ড্রাইভার অগ্যস্তন্ এমনিই খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাতে ভালোবাসে। সেদিন আবার আমাদের গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌছোনোর খুব জরুরী দরকার ছিল। সেদিন

অগ্যাস্তন্ ভীষণ জোরে গাড়ী চালাচ্ছিল। আমি তাকে দু'তিনবার সাবধান করে দিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা? অন্য কোনও গাড়ীকে অগ্যাস্তন্ তার আগে যেতে দিচ্ছিল না। আধঘণ্টা পরে আমরা একটা লম্বা রাস্তায় এলাম। তার একদিকে একটা লম্বা রাস্তায় এলাম। তার একদিকে একটা ছোট খাল মত ছিল। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছোটো গাড়ী পথ থেকে ছিটকে খালের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খালটা চওড়া গভীর ছিল না তাই একদম নীচে না পড়ে গাড়ী খালের একপাশে আটকে গেল। আমাদের কারোরই কোনো চোট লাগে নি। অনেকদিন বাঁচবো বলে বুঝি আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম, তবে গাড়ী থেকে আমাদের অন্যরা টেনে বার করে আনলো। অগ্যাস্তন্ একটুও অপ্রতিভ হয় নি। দুর্ঘটনা যে তার অসাবধানতার জন্য, সে রকম কোনো ভাব তার মধ্যে ছিল না। রাস্তা ঠিকমত মেরামত করা হয়নি বলে গাড়ী রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছে একথা সে বল্ল, বিশ্বাসও করলো। এমনি ধরনের দুর্ঘটনায় আমি আর অগ্যাস্তন্ কয়েকবার পড়েছি এবং তার থেকে রক্ষাও পেয়েছি।

কুয়ালালামপুর থেকে মালাক্কায় একদিন আমাকে মাঝরাতে যাত্রা করতে হয়েছিল। সে সময় আমার একটা পন্টিয়্যাক গাড়ী ছিল। অগ্যাস্তন্ ঠিক আগের মতই জোরে গাড়ী ছোটালো। মালাক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা জায়গায় পৌছোলে পর গাড়ী রাস্তায় শোয়া একটা বড় মোষের ওপর চড়ে পাশের খালে গিয়ে উলটে পড়লো। খালটি গভীর ছিল না। আমি সে সময় ঘুমোচ্ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দেখি যে বাইরে বেরোবার উপায় নেই। জায়গাটা একটা গ্রাম। ঘোর অন্ধকারে কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। গাড়ী উলটে যাবার শব্দ শুনে আশেপাশের লোকেরা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। আমি একেবারে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলাম। মোষটা ততক্ষণে মরে গেছে। অগ্যাস্তন্ বল্ল যে এতবড় একটা লম্বা রাস্তায় শুয়ে থাকার ফল মোষটা পেয়েছে। আমার বা অগ্যাস্তনের কারোর কোনো চোট লাগে নি। ভোর হ'লে কয়েকজনের সাহায্যে গাড়ী খাল থেকে বার করে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। সেদিন এরপর অগ্যাস্তন্ একটু আস্তে গাড়ী চালিয়েছিল। আর কোন কারণে নয়, হয়তো ক্লান্তির জন্যে।

অগ্যাস্তন্ গাড়ী চালাবার সময় যদি অন্য কোনো গাড়ী ওর আগে যায় তাহ'লে অগ্যাস্তন্ সেটা সহ্য করতে পারতো না। আগের গাড়ীটার আগে যেতে না পারলে তার তৃপ্তি নেই। একবার মালাক্কা থেকে মুব্বার যাবার পথে অগ্যাস্তন্ একজন ইউরোপীয়ানের গাড়ীকে অতিক্রম করলো। লোকটি পুলিশে রিপোর্ট করল। অন্য লোকের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গ্রাহ্য না করে সে গাড়ী চালিয়েছে এই চার্জ তাকে করা

হলো। বাদীপক্ষ আমাকে সাক্ষী মানলো। গাড়ী পঞ্চাশ মাইল বা তারও বেশী বেগে চলছিল একথা আমি কোর্টে বল্লাম। এর ফলে অগ্যাস্তনের 50 টাকা জরিমানা হ'ল। না দিলে দু সপ্তাহের জেল। জরিমানার টাকাটা আমি দিলাম। অগ্যাস্তনের এটা একটুও পছন্দ হ'ল না। সে আমাকে বল্ল,—আপনি কোর্টে বল্লেই পারতেন যে আমি 30 মাইল বেগে গাড়ী চালিয়েছি।

আমি বল্লাম—সেটা তো ঠিক নয়। তুমি 50 মাইলেরও বেশী বেগে গাড়ী চালিয়েছ।

—সেটা কি আপনার কোর্টে বলা উচিত ছিল? অগ্যাস্তন্ আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

অগ্যাস্তন্ খুব চালাক চতুর আর বিশ্বস্ত ড্রাইভার ছিল। কাজ করতে তার এতটুকু আলস্য ছিল না। গাড়ী চালাবার সময় গাড়ীর স্পীড্টা যেন কমাতে বলা না হয়। জোরেই যদি না গাড়ী চালাবো তাহ'লে গাড়ীর দরকার কি? এই ছিল অগ্যাস্তনের প্রশ্ন।

বেশ কয়েক মাস অগ্যাস্তন্ আমার সঙ্গে ছিল। পরে দেশে চলে গেল। এর এক বছর পরে তার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিশ্বস্ত এক বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথার আঘাত আমার লেগেছিল।

দ্রাবিড় কড়্কম্ নেতা ই. ভি. রামস্বামী নায়কার আমি মালয়ে থাকার সময় সেখানে একবার এসেছিলেন। 'স্বয়ং মর্যাদা' সমিতির প্রচারণার কাজে নায়কার মালয়ে কয়েকটা জায়গা ঘুরেছিলেন। দুদিন তিনি আর তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আমাদের পরস্পরের প্রায়ই দেখা হ'ত। তারপর তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন। এতে আমাদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যে কোনো বাধা পড়েনি। মালয়ে দ্রাবিড় কড়্কম্, নায়কারের ষষ্ঠীপূর্তির সময় আহূত এক জনসভায় আমাকে অধ্যক্ষ হবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। আমি সেই সভায় গিয়ে নায়কারের জনসেবার গুণকীর্তন করেছিলাম। নায়কার ছিলেন একজন সুবক্তা, নেতা এবং জনসেবী। চল্লিশ বছর ধরে জনগণের জীবনে তাঁর প্রভাব বিস্তারের কথা স্মরণ করে নায়কার বিরোধী ব্যক্তিরাই তাঁর ক্ষমতার কথা অস্বীকার করতে পারতেন না।

মালাক্কায় আমি প্রায় দু'বছর প্র্যাকটিশ করেছিলাম। "নাট্টুকোং চেট্টিয়ার" সম্প্রদায়ের অনেক লোক সেখানে বাস করতো। সুদে টাকা ধার দেওয়া ছিল তাদের ব্যবসা। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা মালয়ের নানাস্থানে খাটাতো এই সম্প্রদায়ের অনেকে আমার বন্ধু বা মক্কেল ছিল।

চেট্টিনাডের রাজা স্যার আন্নামল চেট্টিয়ার মালাক্কা এলে পর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আয়োজিত এক জনসভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। তখন রাজার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। খুব বিরাটভাবে চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। রাজা সাহেবের প্রগল্‌ভতা এবং বশীকরণ শক্তি একবার যাঁরা তাকে দেখেছে তারা কোনদিনই ভুলবে না।

চেট্টিয়াদের কথা বলার সময় একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। মালাক্কায় প্র্যাকটিশ করার সময় একবার ক্রিমিন্যাল কেসে ধরা পড়া এক চেট্টিয়ারের হ'য়ে আমি কোর্টে হাজির হ'য়েছিলাম। চেট্টিয়ারের জামিনের জন্য আমি গিয়েছিলাম। কোর্টে বহু চেট্টিয়ার এসেছিল। চেট্টিয়ারকে জামিন দেবার জন্য আমি কোর্টের কাছে প্রার্থনা জানালাম। দোষের গুরুত্বের কথা ভেবে বিচারক যে কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে আসামীকে জামিনে ছাড়ার আদেশ দিলেন। জামিনের খবরটা দেবার জন্যে আমি চেট্টিয়ারকে খুঁজলাম, কিন্তু তাকে কোর্টে দেখতে পেলাম না। ততক্ষণে পুলিশও তাকে খুঁজছে। কিন্তু চেট্টিয়ারের খোঁজ পাওয়া গেল না। অসংখ্য লোকের জড়ো হওয়া কোর্ট থেকে দিনে দুপুরে সকলের অজান্তে চেট্টিয়ার যে কি করে পালিয়ে গেল তাই ভেবে সকলে অবাক হয়ে গেল। নিরপরাধী আমার মক্কেলের এই ব্যবহারে আমিও খুব অবাক্ হয়ে গেলাম। এর পর সেই চেট্টিয়ারের আর কোনো খোঁজ পাইনি। কেমন করে যে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল, তা' আজো আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়।

ছাব্বিশ

গণ্ডগোলের সূত্রপাত

রবার এবং টিন মালয়ে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এইগুলোর দাম যেমন ওঠে পড়ে, তার ওপর নির্ভর করে মালয়ে ব্যবসার উন্নতি অবনতি, অর্থের প্রাচুর্য আর অভাব। আমি যখন মালয়ে ছিলাম তখন বরারের বেশ দাম। রবারের বাগান কেনা এবং বিক্রী তখন খুব চলছিল। এই বেচাকেনার ব্যাপারে দলিল তৈরী করা, সে সব রেজিষ্ট্রী করা ইত্যাদিতে উকীলদের খুব লাভ হয়। একজন বা দু'জন ক্লার্ক এইসব কাজ সারতে পারে। আমার মালাক্কার অফিসে এইসব কাজ করতো একজন চীনা। এই সব কাজকর্মে তার ভালই অভিজ্ঞতা ছিল। তার নাম ছিল চুতোঙ্। একদিন চুতোঙ্ আমাকে বল্ল যে তার এক চীনাবন্ধু 1000 হাজার ডলার ধার চায়। তার জন্য সে তার রবারের বাগানটি মর্টগেজ রাখতে চায়। আমি যদি কোন চেট্টিয়ারকে এ বিষয়ে বলে দেখি তাহ'লে ভাল হয়। আমি আমার চেনা এক চেট্টিয়ারকে এ টাকাটা দিতে বল্লে পর তিনি তা দিলেন। আমি অবশ্য চেট্টিয়ারকে বলেছিলাম যে ঐ বাগানের দলিল দস্তাবেজ সব পরীক্ষা করে তারপর টাকা দিতে। যে লোকটি টাকা ধার করেছিল সে আমার সামনে দলিলে সই দিয়েছিল। তারপর এটা রেজিষ্ট্রী করার জন্য ল্যাণ্ড অফিসে পাঠালাম। দু'দিন পরে দলিল বিনা রেজিষ্ট্রীতে ফিরে এল। রবারের বাগানের মালিক মৃত। দলিলে যে সই দিয়েছে সে বাগানের মালিকের নামে মিথ্যা সই দিয়ে টাকা নিয়েছে জানা গেল। চুতোঙের জানা লোক বলে টাকা ধার দেবার জন্য আমি চেট্টিয়ারকে বলেছিলাম। দলিল বিনা রেজিষ্ট্রীতে ফিরে এলে পর চেট্টিয়ার চোখের জলে ভেসে আমার অফিসে এল। চুতোঙ্ বল্ল যে তার বন্ধু তাকে ধাপ্পা দিয়েছে। চেট্টিয়ারের যে ক্ষতি হ'লো তার জন্য আমি দায়ী না হলেও আমার কথা-মতো তিনি টাকাটা দিয়েছেন এটা পরিষ্কার। এদিকে চুতোঙের লোকটি টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গা পরিত্যাগ করেছিল। এই লোকটার কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে না পারলে টাকাটা আমি দেব একটা আমি চেট্টিয়ারকে বল্লাম। এদিকে সেই চীনা লোকটির খোঁজ পাওয়া গেল না। সে চীনে পালিয়ে গিয়েছিল। চেট্টিয়ারকে এই টাকাটা দেবার মত টাকা আমার হাতে তখন ছিল না। তাই এই টাকাটার একটা প্রমিসরি নোট আমি লিখে দিলাম। এটা চেট্টিয়ারের হাতে দিলে

পর চেট্টিয়ারের মুখের সেই কৃতজ্ঞতা এবং অদ্ভুত ভাব আমি বলে বোঝাতে পারব না। এই টাকাটা আমি ধার করে দিয়েছিলাম। সে ধার শোধ করতে আমার দু'বছর লেগেছিল।

আর একটা মুব্বার অফিসে ঘটেছিল। সে ঘটনা এর চেয়ে গুরুতর। মুব্বার অফিসে দলিল রেজিষ্ট্রী করতে নিয়ে যেত পাণিক্কর বলে একটি লোক। লোকটি কাজকর্মে খুব চৌকশ, মক্কেলদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা জানতো। সপ্তাহে দু'দিন আমি মুব্বারে যেতাম। তখন 10 / 15-টা দলিল রেজিষ্ট্রী করার থাকতো। মক্কেলরা আমার দলিল সই করার পর সেগুলো রেজিষ্ট্রী করার পয়সা আমি পাণিক্করের হাতে দিতাম। রেজিষ্ট্রী করার পর দলিল ফিরে এলে তা মালিকদের ফেরত দিতাম। এই জন্য অফিসে একটা রেজিষ্টার রেখেছিলাম। দলিল ফিরিয়ে দেবার পর তার সমস্ত বিবরণ লিখতে এবং মালিকদের সই নিতে পাণিক্করকে নির্দেশ দেওয়া ছিল। আমি যখন মুব্বারে যেতাম তখন বেশ ভালো ভাবে এই রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করে দেখতাম। কখনো কোনো ভুল ধরা পড়ে নি।

মালাক্কার সেই ঘটনার দু'মাস পরে এক শনিবার আমি মুব্বার অফিসে গেলে পর একজন চেট্টিয়ার আমার কাছে এসে নালিশ করলো যে তার কতকগুলো দলিল সে ফিরে পায়নি। পাণিক্করকে জিজ্ঞেস করাতে বল্ল যে সে দলিলগুলো সব বাড়ীতে রেখেছে, এক্ষুণি নিয়ে আসছে বলে বাড়ী গেল। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরল না দেখে তার বাড়ীতে লোক পাঠালাম। সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। আমার তখন সন্দেহ হওয়াতে সমস্ত কিছু ভালো করে অনুসন্ধান করে বিশ্বস্ত পাণিক্করের ভয়ানক জোচ্চুরির কথা জানতে পারলাম। প্রায় চল্লিশটির মতো দলিল সে রেজিষ্ট্রী করতে পাঠায় নি। অফিসের রেজিষ্টারে এই দলিলগুলো ফেরত পাওয়া হয়েছে এবং মক্কেলদের ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে লেখা ছিল। দলিল ফেরত পেয়েছে বলে মক্কেলদের সইও রয়েছে। এ সমস্তই যে নকল তা' আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। আমি রেজিষ্ট্রী করতে যে টাকা তাকে দিতাম সে সব টাকা পাণিক্কর নিজেব দরকারে খরচ করতো। অনেক টাকা আমি তাকে দিয়েছিলাম। দলিলে সই করে তিন মাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রী না করলে চারগুণ রেজিষ্ট্রী ফী দিতে হবে। হিসেব দেখার পর বুঝতে পারলাম যে আমাকে এখন প্রায় 4000 হাজার টাকার মত গচ্চা দিতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ল্যাণ্ড অফিসের অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল্লাম, তিনি দয়া করে আমাকে শাস্তি দিলেন না। সমস্ত দলিলগুলো রেজিষ্ট্রী করার জন্য টাকা আমি আবার দিলাম। এর জন্যে প্রায় 1000 হাজার ডলার আমার ক্ষতি হ'লো। তা হোক্, এতে আমার মক্কেলদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

একমাস পরে কুয়ালালামপুরে পাণিক্করকে অ্যারেস্ট করা হয়। বিশ্বাসবঞ্চনা কেসে তার আট মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে থাকতে থাকতে সে অনুতপ্ত হ'য়ে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। তাতে আর একটা কথাও সে লিখেছিল। তার লাড্ডু খাবার ভীষণ ইচ্ছে হ'য়েছে, কাউকে দিয়ে যদি আমি গোটা চারেক লাড্ডু জেলে পাঠিয়ে দিই তাহলে সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আমি সুপারিন্টেন্টের অনুমতি নিয়ে তাকে লাড্ডু পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জেল থেকে বেরোনোর পর পাণিক্করকে অসুস্থ বলে মনে হলো। কয়েকদিন তাকে আমার বাড়ীতে রেখে পরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হ'য়ে ফিরে পাণিক্কর যখন আমাকে বল্ল যে, যে করেই হোক্ তাকে একটা চাকরী জোগাড় করে দিতে হবে তখন আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। "আপনি যদি একটা চিঠি দেন তাহ'লে আমি একটা কাজ পেতে পারি নইলে আমি বড় কষ্টে পড়বো" পাণিক্করের এই কথাগুলো শুনে আমার মনটা গলে গেল। একবার ভুল করলে তার আর কোন উপায় নেই এটা সত্যিই কষ্টকর। কিন্তু যে ঘটনা ঘটে গেছে তাকেও লুকিয়ে রাখা যায় না। তাই পাণিক্করের দরকার মতো একটা চিঠি লিখে দিলাম। চিঠিটা এই ভাবে লিখলাম—"লোকটি আমার অফিসে কাজ করতো। বিশ্বাসবঞ্চনার কেসে তাকে জেল ভোগ করতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে নিজের দোষ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছে। লোকটি কাজকর্মে খুব চালাকচতুর।" কাজ পেতে পাণিক্করের বেশী দেরী হল না। এক বছর কাজ করার পর একদিন তাস খেলতে খেলতে হার্টফেল করে সে মারা যায়। আমার যে ক্ষতি করেছে সে ক্ষতির শোধ সে করতে চেয়েছিল। আরো কিছু দিন বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই আমার টাকাটা শোধ করতো।

এই সময় আর একটা গণ্ডগোলের সম্মুখীন আমাকে হ'তে হয়েছিল। 1930 সালের জুন মাসে কুয়ালালামপুর সুপ্রীম কোর্টে এনরোল্ করার জন্য আমি দরখাস্ত করলে পর সেখানকার বার কমিটি এর বিরোধিতা করে। আমি আগে সিঙ্গাপুর সুপ্রীম কোর্টে আমার নাম তালিকাভুক্ত করেছিলাম। ফেডারেটেড্ মালয়ান ষ্টেটের কোর্টগুলোতে প্র্যাকটিশ করবার জন্য কুয়ালালামপুর সুপ্রীম কোর্টে নাম তালিকাভুক্ত করতে হয়। 1927 সালে মালয়ে পৌঁছোনোর পরই আমি এ বিষয়ে দরখাস্ত করলেও 1930 সালের জুন মাসে আমার দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে আমি শাস্তি পেয়েছি। আমি ভারতের কোর্ট প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম ইত্যাদি বলে বার কাউন্সিল আমার

দরখাস্তের বিরোধিতা করে। এই ব্যাপারে কুয়ালালামপুর বার কমিটি, সেক্রেটারীর ফাইল করা এ্যাফিডাবিট জি. কে. নারায়ণনের আমার সম্বন্ধে লেখা একটা চিঠি, মাদ্রাজের পুলিশের কুয়ালালামপুর পুলিশ কমিশনারকে লেখা একটা চিঠি, প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হ'য়েছিল। এই দুই চিঠিতে যা লেখা ছিল তা আমি এখানে বলছি।

নারায়ণন্ লিখেছিলেন—"1919 সাল থেকে আমি কেশব মেননকে চিনি। আমি মাদ্রাজে প্র্যাকটিশ করার সময় তিনিও সেখানে প্র্যাকটিশ করছিলেন। 1921 সালের আরম্ভে তিনি মাদ্রাজের প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য কেরলে যান। অসহযোগ আন্দোলনের মূলকথা হচ্ছে যে সরকারের সঙ্গে কোনো কিছুতে সহযোগিতা না করা। উকীলরা কোর্ট বহিষ্কার করবে, প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দেবে, লোকে খাজনা দেবে না ইত্যাদি। 1921 সালের পর কোন বছর আমার ঠিক মনে নেই, কেশব মেননের জেল হয়েছিল। কি দোষে তা আমি ঠিক জানি না।" 1922 সালের মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ এই আন্দোলনের ফলে হয়েছিল একথাও নারায়ণন্ লিখেছিলেন।

স্যানর্ডাস কোম্পানীর একজন অংশীদার ছিলেন নারায়ণন্। সেই কোম্পানী ছেড়ে আমার নিজের প্র্যাকটিশ আরম্ভ করাটা তাঁর একটুও ভালো লাগেনি। তাই আমাকে একটা শিক্ষা দেবেন বলে তিনি ভেবেছিলেন। এই কাজে যে আমার কত ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি একবার চিন্তাও করলেন না।

মাদ্রাজের পুলিশ কুয়ালালামপুরের পুলিশ কমিশনারকে আমার সম্বন্ধে এই রিপোর্ট দিয়েছিলেন—

নাম—কে. পি. কেশব মেনন।

কাজ—অসহযোগ আন্দোলনকারী।

ইতিহাস—মাদ্রাজের প্রায় সব শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ট্রামওয়ে মজদুর সংঘের স্থাপকদের মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। 1921 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াকুব হাসান এবং অন্যান্যদের অ্যারেস্ট করা হ'লে পর প্র্যাকটিশ বন্ধ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য মালাবার যান। মালাবারের নানা জায়গায় খিলাফত্ আর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে অনেক বক্তৃতা দেন। কেরলের অসহযোগ আন্দোলনের নাড়ী হচ্ছেন ইনি। ভৈকম সত্যাগ্রহে 1924 সালের 7ই এপ্রিল এঁনাকে অ্যারেস্ট করা হয়। জামিন না দিতে প্রস্তুত থাকায় ছ'মাসের সাজা ভোগ করেন। সেই বছরের 1লা সেপ্টেম্বর জেল থেকে ছাড়া পান।

কালিকট থেকে প্রকাশিত একটা অসহযোগ আন্দোলন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ইনি।

1925 সালের জুলাই মাসে মাদ্রাজে ফিরে এসে আবার প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেন।

আমার এতদিনকার কাজ এবং মতামত কোর্টের সামনে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এটা আমি কোর্টে ফাইল করা আমার অ্যাফিডাবিটে খোলাখুলিই লিখেছিলাম। 1915 সালে কালিকটে প্র্যাকটিশ করার সময় থেকে মালয়ে আসা অবধি যা যা করেছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলাম।

আমার কেস শোনার জন্য আদালতে সেদিন খুব ভীড় হয়। চীফ্ জজ শুনানীর পর সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন। রাজনৈতিক মতামত আর উকীলের কাজ এ দু'টোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আবেদনকারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ না থাকায় আবেদন নাকচ করে দেবার কোনো কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তাই আবেদনকারীকে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসেবে এনরোল করার স্বপক্ষে তিনি রায় দিচ্ছেন।

"আপনার সাফল্য কামনা করি"—জজ আমাকে বল্লেন। এমনিভাবে খুব উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তোলা এই কেসটি আমার স্বপক্ষে গেল। এই কেস শুধু মালয়েই নয়, আমাদের দেশেও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার সাফল্যে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা একটা সম্পাদকীয়তে লিখেছিল। মাতৃভূমিও লিখেছিল।

কেসে আমি জিতলেও এর ফলে যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হ'য়েছিল তার জের কাটতে অনেকদিন লেগেছিল।

সাতাশ

মালাক্কা থেকে সিঙ্গাপুর

কুয়ালালামপুরের সুপ্রীম কোর্টে এনরোল করার জন্য আমার দরখাস্ত সেখানকার বার কমিটি বিরোধিতা করবে। এ খবর মালয় আর সিঙ্গাপুরের বড় বড় কাগজগুলো ছেপেছিল। আমি এ সময় মালাক্কা আর জোহরে প্র্যাকটিশ করছিলাম। এই সময় সিঙ্গাপুর বার কমিটি আমার নামে মোকদ্দমা করবে এরকম একটা উড়ো খবর শোনা গেল। এই খবরের সত্যতার খোঁজ করার আগ্রহ লোকের থাকে না। যা তারা শোনে তা বিশ্বাস করে এবং তার বেশী অন্য লোকের কাছে বলে বেড়ায়। তা সে যাই হোক, এই খবর প্রচার হবার পর জোহর আর মালাক্কায় আমার প্র্যাকটিশ কমে গেল। নতুন মক্কেলরা আমার কাছে কেস দিতে দ্বিধা করছিল। যারা এসেছিল তারাও পেছন ফিরতে লাগলো যারা। আমার অসুবিধার কথা বুঝেছিল তারাও আমায় নতুন কেস দিতে ভরসা পাচ্ছিল না। অফিস আর বাড়ীর খরচ চালানো মুশকিল হয়ে উঠল। আমি আবার ধার করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ধার পেতে বেশ বেগ পেতে হল। এনরোলমেণ্ট কেস চালাতে বেশ কিছু টাকার দরকার হ'য়েছিল। কি যে করবো তা বুঝতে না পেরে আমি শঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম।

এই সময়ে পেনাঙের একটা কাগজ আমার নামে একটা খারাপ লেখা ছাপলো। আমি ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমাকে মালয়ে বেশী দিন থাকতে দিলে এখানকার ভারতীয় শ্রমিকেরা গোলমাল করতে শুরু করবে ইত্যাদি। এটা পড়ে আমি এই কাগজের নামে মানহানির মামলা করবো বলে ঠিক করলাম। পেনাঙে গিয়ে আমি কেস ফাইল করলাম। কেস লড়াই করতে কাগজটির সাহস হ'ল না। সম্পাদক ক্ষমা চাইলেন। মানহানির জন্য কোর্ট থেকে যে টাকা পেয়েছিলাম তার বেশী খরচ আমার হ'য়েছিল, এতে আমার দেনা আরো বেড়ে গেল।

এই সময়কার আর একটা দুঃখের কাহিনী বলছি। একটা দেনা শোধ করবার খুব জরুরী দরকার ছিল। আমার এক নিকট বন্ধুর কাছে ধার চাইব ভাবলাম। এই ভদ্রলোক রোজ আমার বাড়ীতে আসতেন। আমাকে খুব স্নেহও করতেন। আমার অভাব বাড়ার সঙ্গে ভদ্রলোকের আগমনও কমতে লাগলো। এঁর আর্থিক অবস্থা বেশ

ভালো ছিল। আর কোনো উপায় না দেখে আমি এঁর দ্বারস্থ হলাম। আমাকে দেখেই তিনি আমার আগমনের কারণ বুঝতে পেরেছিলেন। আমার দরকারের কথা তাঁকে বল্লাম, টাকা না পেলে যে আমার কি অবস্থা হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে বল্লাম। "আমি কারোকে টাকা ধার দিই না। যারা ধার চায় তাদের আমি পছন্দ করি না"—এই উত্তর তিনি আমায় দিলেন। আমি হতভম্বের মতো সেখানে একমিনিট বসে রইলাম। তারপর বাড়ী ফিরলাম। এই ভদ্রলোকের এমনি অসৌজন্যময় কথাবার্তা আর টাকা না পেলে আমার কি অবস্থা হবে সেই কথা মনে করে আমার চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়লো। টাকা পয়সার ব্যাপারে এই ভদ্রলোকের খুব হাতটান আমি জানতাম। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করারও একটা দিক আছে। ভদ্রলোকের এই ব্যবহারে এবং এই সব গোলমালে আমার মন এত খারাপ হ'য়ে গেল যে আমার আর কিছুই ভালো লাগছিল না। কারোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল না। অফিসেও শান্তি মনে কাজ করতে পারছিলাম না। বাড়ীতে বসে থাকতেও মন চাইছিল না। পাওনাদারদেয় চিঠির পর চিঠি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এরপর পাওনাদারেরা আমার নামে মামলা শুরু করলো। দেনা শোধ করবার কোন উপায়ই দেখতে পেলাম না।

দেনাদারের অভিজ্ঞতা যে কি তা বলে বোঝানো যায় না। তাকে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। তার আহার নিদ্রা সব ঘুচে যায়। নৈরাশ্য আর ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরে। সত্যকে ফাঁকি দিতে হয়, পৌরুষ বিসর্জন দিতে হয়। জীবনে ঘৃণা ধরে যায়। মৃত্যুর জন্য সে লালায়িত হয়।

এই সময় কোন একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকতে আমার খুব ভাল লাগতো। একদিন মালাক্কা থেকে বেশ দূরে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলাম। হাতে আমার 'The Consolation of Philosophy' বলে একটা বই ছিল। সেটা পড়তে লাগলাম। মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ সরিয়ে চারিদিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলাম। পাখীদের গান, ভ্রমরের গুঞ্জন, গাভীর ডাক, প্রজাপতির নৃত্য দেখতে দেখতে আমার মনের ভার অনেকটা কমে গেল। আমার চেয়ে এদের জীবন কত সহজ, কত শান্তিপূর্ণ একথাই তখন আমার মনে হচ্ছিল। আমি যদি এদের মত হতে পারতাম। অন্যান্য প্রাণীরা মানুষের মতোই হয়তো বেদনা অনুভব করে, কিন্তু মনের কষ্ট শুধু মানুষই অনুভব করে। এ কষ্ট শারীরিক কষ্টের চেয়ে অনেক বেশী অসহ্য। মন যখন নৈরাশ্যের কালো অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন সাধারণতঃ একটা ভালো বইয়ের মধ্যেই আমি আশ্রয় খুঁজি।

আমার অভাবের কথা জানতে পেরে আমার কিছু সহৃদয় বন্ধু আমাকে সাহায্য

করার জন্য একটা অর্থ-সাহায্য ভাণ্ডার খুলেছিল। এটা খুব গোপনে গোপনে খোলা হ'য়েছিল। যা টাকা সংগৃহীত হ'য়েছিল তা বেশী না হলেও বন্ধুদের এই সহৃদয়তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের মালয়ালীরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। আমার অবস্থার একটু পরিবর্তন হলে তাদের কয়েকজনের টাকা আমি ফেরত দিয়েছিলাম।

আমার এই দুঃসময়ে যারা আমার মনকে মাঝে মাঝে খুশীতে ভরিয়ে তুলতো এমন দুজন বন্ধুর কথা এখানে বলবো। তারা হচ্ছে 'টমি' নামে আমার কুকুর আর 'রামন্' নামে আমার একটি পোষা বাঁদর। অফিস থেকে ফেরার পর সন্ধ্যের সময় আমি ওদের নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করতাম। টমি আর রামনের খেলা দেখতে আমার খুব মজা লাগতো। অনেক দূর থেকে আমার গাড়ী আসছে দেখতে পেয়ে রামন্ খুব খুশী হয়ে একরকম অদ্ভুত শব্দ করতো।

টমি খুব পোষ মানা কুকুর ছিল। সব কথা সে শুনতো.। আমার সঙ্গে বন্ধুবান্ধব দেখা করতে এলে সে তাদের কিছু বলতো না কিন্তু আমার বেড়াতে যাবার সময় তাকে যদি না নিতাম তাহ'লে তার খুব খারাপ লাগতো। "আমার সঙ্গে আসিস না"—বলে তাকে ফিরিয়ে দিলে দেখা যেত ঠিক আমার পেছন পেছন রাস্তা চিনে সে এসেছে। আমার কথা না শুনে এসেছে বলে আমি যাতে না রাগ করি তার জন্যে আমাকে নানা ভাবে খুশী করার চেষ্টা করতো। ওর রকম সকম দেখে ওর ওপর আর রাগ করতে পারতাম না। অনেক সময় গলিঘুঁজি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতাম বলে টমি সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতাম। আমার দেনার ভার হালকা করে দেবার জন্যে টমি যদি কিছু করতে পারতো তাহ'লে খুশীর সঙ্গেই সে করতো। কুকুর সত্যিই একটা আশ্চর্য প্রাণী। তার ভালোবাসা, ভক্তি, ত্যাগ করবার ক্ষমতা মানুষ অনুকরণ করতে পারলে ভালোই হয়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় মালাক্কা থেকে ফিরে গেটের সামনে টমিকে দেখতে পেলাম না। জানতে পারলাম টমি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে! বাড়ীর বাগানে তাকে কবর দিলাম। টমির মৃত্যুতে আমার মন এমন একটা শূন্যতায় ভরে গিয়েছিল যে তা পূর্ণ হতে অনেকদিন লেগেছিল। টমির মৃত্যুতে আমাদের মতই কষ্ট পেয়েছিল আমার বাঁদর রামন্। তার কান্না থেকে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

আমার সব দুঃখকষ্টের মূল রামন্ এই রকম একটা বিশ্বাস আমার এক বন্ধুর ছিল। বাড়ীতে বাঁদর পোষা নাকি অলক্ষুণে, একথা তিনি বলেছিলেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি আমি তা জানতাম না। একদিন আমার অজান্তে তিনি রামন্‌কে জঙ্গলে ছেড়ে

দিলেন। রামন্ যাওয়াতে আমার দুঃখ দুর্দশা একটুও কমেনি। বরঞ্চ রামনের এই বিচ্ছেদ আমার দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিল।

আমি মালয়ে আসার একবছর পূর্ণ হবার আগেই আমার ভাই আপ্পুকুট্টন মালয়ে এসেছিল। সে মুব্বারে আমার অফিসের কাজ দেখতো। আমার দুঃখকষ্ট শুরু হবার সময় মালাক্কার অফিসও বাদ গেল না। লোকে বলে দেনা আর ইঁদুর খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, আর দু'টোই খুব ক্ষতি করে। মালাক্কা থেকে মুব্বারে যাবার সময় একটা নদী পার হ'তে হয়। নৌকো করে নদী পার হবার সময় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পাওনাদারদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কথা আমার অনেকবার মনে হয়েছে। কিন্তু আমি না থাকলে আমার পরিবারের অবস্থা কি হবে এই কথা ভেবে আমি এই কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। কতদিন আমি এই নরকে পড়ে মরবো, এর কোনো শেষ দেখতে পাচ্ছি না, এই সব চিন্তা প্রায়ই মনে উদয় হতো। পাগল না হ'লেও পাগলের মত এমনিভাবে আমি এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পিষে মরে যাচ্ছিলাম। একদিন আমার স্ত্রী যখন বল্ল—"এমন ভাবে মন খারাপ করে লাভ কি? যা হবার হবে"—তখন আমার মনে একটা অন্য ভাবনার উদয় হ'ল। আমার এমন কি গুরুতর বিপদ্ ঘটেছে? এমন কোন্ মানুষ এ পৃথিবীতে আছে যাকে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়নি? আমি আজ দেনাদার, কিন্তু সেটা কি অপরাধ? দুঃখকষ্টগুলোকে দূর করার শক্তি হয়তো আমার নেই, কিন্তু তাদের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি তো আমার হাতে। "তোমার জীবনে যত বিপদই আসুক না কেন, তারা তোমার সাহসকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাচ্ছে। এই বিপদ-গুলি তোমার ভবিষ্যতের ভিৎ শক্ত করে গেঁথে তোলার এক একটি ইষ্টিকা"—এক শিক্ষাগুরুর এই কথাগুলো আমার এখন মনে হ'ল।

কুয়ালালামপুর বার কমিটির কেস শেষ হবার পর প্র্যাকটিশ করার জন্য সিঙ্গাপুর যাওয়া ঠিক করলাম। মালাক্কায় কেস চলার সময় এটা আমি ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তখন এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলিনি। মালাক্কায় কিছু পাওনাদার কেস করে আমার বিরুদ্ধে তাদের অনুকূলে রায় দিইয়ে নিয়েছিল।

কয়েকজন পাওনাদারকে আমার বিরুদ্ধে কেস দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেও কয়েকজনকে পারলাম না। এরা অফিসে আর আমার বাড়ীতে যেসব জিনিষপত্র ছিল তা সব বাজেয়াপ্ত করলো। আইনানুযায়ী যে ক'টি জিনিষ আমি রাখতে পারি সেইগুলো নিয়ে একদিন সকালে মালাক্কা সেকে সিঙ্গাপুর রওনা হলাম। আমার মেয়ে পদ্মিনীর একটা পুতুল বাজেয়াপ্ত জিনিষগুলোর মধ্যে ছিল। গাড়ীতে ওঠার পর পদ্মিনী বল্ল—"বাবা আমার পুতুলটাকে নেওয়া হয়নি" বলে সে পুতুলটা নিতে গেল। পুতুলটা

যে নিয়ে যাওয়া যাবে না, সে কথা ওকে বলি কেমন করে? "ওটা এখন এখানে থাক থুক্, অন্য সব জিনিষগুলোর সঙ্গে ওটা পরে আসবে" বলে ওকে সান্ত্বনা দিলাম। বেচারী! আমার কথাগুলো সে বিশ্বাস করলো। বেশ কিছু দামী জিনিষও এর সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই পুতুলটা সেখানে ফেলে রেখে চলে আসতে আমার মেয়েয় চেয়ে আমার কম কষ্ট হয় নি। পথে যেতে যেতে এটা ওটা বলে আমি মেয়ের মন ভোলাবার চেষ্টা করছিলাম। সে কিন্তু থেকে থেকে পুতুলের কথা জিজ্ঞেস করছিল। ঋণ করার দুঃখ যে কি তা বেচারী জানবে কি করে।

মালাক্কা থেকে সিঙ্গাপুরের রাস্তা 120 মাইল। আমরা প্রায় সন্ধ্যের সময় পৌছোলাম। সিঙ্গাপুরে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। তাই অনেক আশা নিয়ে আমি সিঙ্গাপুরে আমার নতুন জীবন আরম্ভ করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু মালাক্কা থেকে সিঙ্গাপুরে আসার পর আমি যেন কড়াই থেকে তপ্ত আগুনের মধ্যে পড়লাম। সিঙ্গাপুরে কিছুদিন থাকার পর এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

আঠাশ

কতকগুলি মামলা

সিঙ্গাপুরে আমার অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা হ'লেও এই শহরটির মতো কোনো শহরই আর আমার ভালো লাগেনি। এই শহরটির পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য, বাস করার সুখ সুবিধা, লোকেদের আচার-ব্যবহার, শাসনব্যবস্থার তৎপরতা এবং কর্মক্ষমতা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। এই ছোট্ট দ্বীপটি প্রায় দেড়শ' বছর আগে জেলেদের একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। সেই ছোট্ট দ্বীপটি কেমনভাবে একটি সুন্দর শহর হয়ে গড়ে উঠল তার কাহিনী খুবই চমকপ্রদ।

1819 সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অফিসার টমাস স্ট্যানফোর্ড রাফেল্‌স্‌ আরো দুজন লোকের সঙ্গে এই দ্বীপে নেমেছিলেন। তখন চারপাশে ঝোপঝাড়ে ঘেরা জেলেদের ক'টি ছোট্ট কুটির মাত্র তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তখন এই দ্বীপটি জোহরের সুলতানের অধীনে ছিল। এক সময় সিংহপুরী বলে অভিহিত একটি বড় শহর এই দ্বীপে ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাভানীজ্‌রা ঐ শহর ধ্বংস করে বলে ইতিহাসে লেখা আছে। রাফেল্‌স্‌ ঠিক করলেন সিংহপুরীর হৃতগৌরব উদ্ধার করবেন। 1824 সালে জোহর সুলতানের হাত থেকে এই দ্বীপের সব অধিকার এবং দায়িত্ব বৃটিশেরা নিয়ে নিল।

এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থার প্রাধান্য জেনে রাফেল্‌স্‌ সিঙ্গাপুরের অভিবৃদ্ধির জন্য কাজ করতে শুরু করলেন। তাঁর সেই কাজ আজ অবধি হ'য়ে চলেছে। বেশ কিছুদিন সিঙ্গাপুরের শাসনব্যবস্থা ভারত সরকার চালিয়েছিল। 1867 সালে এই ব্যবস্থার রদ্‌ হয়।

সিঙ্গাপুরের 12 লক্ষ লোকের মধ্যে সাড়ে আট লক্ষের বেশী লোক চীন দেশীয়। দেড় লক্ষ মালয়ের অধিবাসী। ভারতীয়ের সংখ্যা 87,000। বাকী সব ইউরোপীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের।

সিঙ্গাপুর অন্তঃশুল্ক না দেওয়া একটা খোলা বন্দর হওয়াতে এখানকার ব্যবসার এত শ্রীবৃদ্ধি। আজ সিঙ্গাপুরে যে শাসনব্যবস্থা চালু আছে তা আমার থাকার সময়ে ছিল না। তখন শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে জনসাধারণের কোনো আগ্রহই ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা তখন সেখানে চালু ছিল। এ নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্নও করত

না, মাথাও ঘামাত না। এই প্রথার সীমিত ব্যবস্থায় সেখানকার শাসনতন্ত্র বেশ ভালো-ভাবেই চলছিল। নির্বাচনে নামা, মন্ত্রী হওয়া এসবের কথা তখন কেউ ভাবতোও না।

সিঙ্গাপুরে অনেক আইনজ্ঞের অফিস ছিল। বড় বড় অফিসগুলোর বেশীর ভাগই সব সাহেবদের। চীন দেশীয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান, সিংহলবাসীরাও উকীল হিসেবে কাজ করছিল। ভারতীয়দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কমই ছিল। তখন চার পাঁচজন ভারতীয় মাত্র সেখানে ছিল।

সিঙ্গাপুরে অফিস খুলতে মালাক্কার চেয়েও বেশী টাকার দরকার। থাকা খাওয়ার খরচও বেশী। কতকগুলো ধার শোধ না করে উপায় ছিল না। এগুলো শোধ না করলে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করা যাবে না। অফিস খোলার জন্যও টাকা চাই। এই সব টাকার জোগাড় কি করে করি? কোর্টের রায় দেওয়া আর বাজেয়াপ্ত করা একজনকে কি কেউ টাকা দেয়? কিন্তু আমার দরকারের কথা অপরকে না জানালে আমার কাজই বা চলবে কি করে? তাই আমার এক বন্ধুকে সব কথা খুলে বল্লাম। আমার কথা শুনে তার সহানুভূতি হলেও আমাকে সাহায্য করার তাঁর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তিনি কিন্তু আমার জন্যে তাঁর পরিচিত কয়েকজন লেখকের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বল্লেন। তাদের জামিনে আমার দরকারী টাকা একজন নাট্টুকোট্টচেট্টিয়ার দিল। এমনি ভাবে আমি সিঙ্গাপুরে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করলাম।

কেস হাতে পেতে খুব বেশী অপেক্ষা করতে হ'ল না। বেশীর ভাগই ছিল দেওয়ানী মামলা। তবে ফৌজদারী মামলাও কিছু কম ছিল না। কতকগুলো কেসের কথা আমার এখনো মনে আছে। মানুষের চরিত্রের নগ্নতা আর কুশ্রীতা এই মামলাগুলোও আমরা দেখতে পাই।

সিঙ্গাপুর নৌবাহিনীতে অনেক মালয়ালী তখন কাজ করতো। তারা সেলাটার নামে এক জায়গায় থাকতো। অন্যান্য জাতের লোকরাও সেখানে থাকতো। বড় বড় শেড্ তৈরী করে তারা এখানে বাস করতো। এদের মধ্যে গোপালন বলে একজন ছুতোর মিস্ত্রী এবং পিল্লা বলে একটি লোকও ছিল। পিল্লা আর গোপালন একই জায়গায় থাকত। পিল্লা তার সাবানটা একটা সাবানের বাক্সে রাখতো। গোপালন একদিন এই সাবান নিয়ে স্নান করে সাবানটা আবার সেখানেই রেখে দেয়। পিল্লা সাবান ব্যবহার করতে গিয়ে দেখে যে তার সাবানটা কে যেন ব্যবহার করেছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে গোপালন ব্যবহার করেছে। একজন ছুতোর মিস্ত্রী তার সাবান ব্যবহার করেছে জানতে পেরে পিল্লা খুব রেগেমেগে গোপালনের গালে একটা চড় মারলো।

সকলের সামনে তাকে অপমান করার মতো এমন কাজ সে কি করেছে গোপালন তা বুঝতে পারলো না। তখন অবশ্য সে কিছু বল্ল না। সেদিন মাঝরাতে একটা ভয়ানক আর্ত চীৎকার শোনা গেল। পিল্লা যেখানে শুয়েছিল সেইখান থেকে শব্দটা আসছিল। সকলে ছুটে গিয়ে দেখে পিল্লার শরীরে একটা কুঠার গাঁথা। রক্ত পড়ে কালো হয়ে আছে। পিল্লা মরে গেছে।

পিল্লার হত্যার জন্য গোপালনকে বন্দী করা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রথম শুনানীর পর কেস সুপ্রীম কোর্টে গেল। জুরীদের সাহায্যে জজ এই কেস চালাচ্ছিলেন। আমি গোপালনের হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। গোপালন যে হত্যা করেছে তা কেউ দেখেনি। তবে পিল্লার দেহে গেঁথে থাকা কুঠারটা গোপালনের আর হত্যার দিন পিল্লা আর গোপালনের মধ্যে যে গোলমাল হয় তার প্রমাণও ছিল। গোপালন দোষী জুরীরা এই মত দিল। জজ গোপালনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। আপীল করেও কোনো ফল হ'ল না।

কতকগুলো বাঞ্ছনীয় কেসে শাস্তি কমাবার অধিকার গভর্ণরের আছে। তার জন্য দরখাস্তে সই নেবার জন্যে আমি জেলে গোপালনের সঙ্গে দেখা করলাম। ফাঁসির আসামীর সেলে গোপালন একা বসেছিল। আমাকে দেখে সে বল্লে—"আমাকে যে করেই হোক আপনাকে রক্ষা করতে হবে স্যার, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে—" বলে সে কাঁদতে লাগলো। আমি হতভাগ্যকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। দু' সপ্তাহ পরে জানতে পারলাম গোপালনের শাস্তি কমাবার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ফাঁসির মঞ্চে গোপালনকে নিয়ে যেতে খুব বেগ পেতে হ'য়েছিল। হাত পা ছুঁড়ে তার সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে প্রাণপণে যুঝেছিল। শেষ পর্যন্ত গোপালনের ফাঁসি তারা দিতে পেরেছিল। এমনিভাবে জাতধর্মের বাইরে এক জায়গায় আগে পিল্লা তার পেছনে গোপালনও চলে গেল।

আর একটা কেসের কথা আমার এখানে মনে পড়ছে। কয়েকজন মালয়ালী এতে অভিযুক্ত আসামী ছিল। এটা জোহরে ঘটেছিল। সেখানে জাপানীদের রবার বাগানে বেশ কিছু মালয়ালী কাজ করতো। তারা সেখানেই থাকতো। একদিন এই বাগানের একটা বড় গাছের ডালে একজন মালয়ালীর মৃতদেহ ঝুলছে দেখা গেল। পুলিশের সন্দেহ হলো যে লোকটিকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই বাগানের আটজনকে তারা ধরে নিয়ে গেল। প্রথম অন্বেষণের পর পাঁচজনকে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাকী তিনজনের কেস সুপ্রীম কোর্টে

পাঠানো হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আসামীদের হ'য়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। এদের মধ্যে নাম্পিয়ার বলে একজন ছিল সর্দার আর বেশ পয়সাওয়ালা লোক। যে পাঁচজন ছাড়া পেয়েছিল তাদের মধ্যে নাম্পিয়ারও ছিল। ছাড়া পেয়েই নাম্পিয়ার এবং অন্ত চারজন সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। যে তিনজনের নামে হত্যার অভিযোগ ছিল তারা নাম্পিয়ারের অধীনে কুলীর কাজ করতো। তাদের কেস চালানোর খরচ দিয়েছিল নাম্পিয়ার। নাম্পিয়ার চলে যেতে তাদের হাতে কোনো পয়সা নেই বলে এই কুলীরা আমাকে জানালো। দেশে আমাদের সম্পত্তি আছে। কেসে জিতে বেরোতে পারলে যে করেই হোক আপনার টাকা আপনাকে দেব—একথা তারা আমাকে বল্ল। টাকা তাদের কাছে নেই এবং তাদের সাহায্য করারও কেউ নেই একথা আমি জানতাম। ফী পাবো না বলে এই অবস্থায় তাদের জলে ফেলে দিতে আমার মন চাইল না। "ঠিক আছে কেস আমি চালাবো, টাকা পরে দিলেই হবে" একথা আমি তাদের বল্লাম। সুপ্রীম কোর্টে এদের তিনজনের হ'য়ে আমি হাজির হ'য়েছিলাম। কেসটা খুব গোলমেলে হ'লেও কেসটা চালাতে আমার ভালই লাগছিল। নাম্পিয়ার ঐ বাগানের একজন মাস্তুরা ছিল। কুলীদের কাজ যে দেখে তাকে 'মাস্তুরা' বলে। মৃত লোকটি নাম্পিয়ারের সঙ্গে অভদ্রভাবে কথা বলেছিল। লোকটিকে শিক্ষা দেবার কথা নাম্পিয়ার কয়েকজন কুলীকে বলেছিল। সেই মতো আসামীরা তাকে গলা টিপে হত্যা করে তার মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এই ছিল অভিযোক্তাদের বক্তব্য। আসামীদের বক্তব্য ছিল কেউই লোকটিকে খুন করেনি, সে আত্মহত্যা করে মরেছে। তিনদিন ধরে শুনানী চলেছিল। বিচারপতি রায় দিলেন যে আসামীরাই খুন করেছে এবং তাদের তিনজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

আমি এদের হ'য়ে আপীল করলাম। আপীলে কোর্টের রায়ই বহাল রইল।

শাস্তি কমাবার জন্যে সুলতানের কাছে আবেদন পাঠানো হ'ল। তাতে আসামীদের সই নিতে গিয়ে দেখি তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেলে রাখা হয়েছে। তাদের সই নিয়ে সুলতানের কাছে পাঠানো হল। আসামীরা আমাকে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বল্ল—"যদি আমাদের প্রাণদণ্ড মকুব হয় তাহ'লে আমাদের সমস্ত কিছু আপনার।" এক সোমবার তাদের ফাঁসি দেবার কথা। তার আগের দিন আমি খবর পেলাম যে প্রাণদণ্ড মকুব করে আসামীদের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ খবর তাদের আমি জানালাম। এরপর আমি তাদের দেখি চার বছর পরে জেলে আর একটা কেসের আসামীদের সঙ্গে

পরামর্শ করতে যাবার সময়ে। পুরোনো কয়েদীদের মতো এই লোকগুলি বেশ সুখেই জেলে বাস করছিল। 1941 সালে মালয়ে যুদ্ধ শুরু হবার সময় কয়েদীদের জেল থেকে ছেড়ে দেবার সময় তারাও ছাড়া পায়। এর পর আমি আর তাদের দেখিনি।

আর একটা কেসের কথাও বলছি। এটা ঘটেছিল জোহরে একটা রবারের বাগানে। চিন্নাপ্পন নামে একজন কুলী এই বাগানে কাজ করতো। আট বছর কাজ করার পর চিন্নাপ্পন কিছু টাকা পয়সা জমিয়েছিল। এ খবর জানতে পেরে আর একজন কুলী তার মেয়ে পোন্নাম্মার সঙ্গে চিন্নাপ্পনের বিয়ে দেবে বলে বেশ কয়েকবার তার অনেক টাকা হাত করেছিল। চিন্নাপ্পন পোন্নাম্মাকে ভালোবেসেছিল। এক একটা অজুহাতে পোন্নাম্মার বাবা তার বিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছিল। এমনিভাবে চিন্নাপ্পনের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে এসেছে জানতে পেরে পোন্নাম্মাকে সে আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ঠিক করলো। চিন্নাপ্পন এ খবর জানতে পেরে যে করেই হোক্ এই বিয়ে বন্ধ করবে বলে ঠিক করলো। "পোন্নাম্মা আমার, তাকে আর একজন বিয়ে করবে এ আমি কখনোই হ'তে দেব না"—চিন্নাপ্পন প্রতিজ্ঞা করলো। পোন্নাম্মাও এই বাগানে কাজ করতো। একদিন সকালবেলা চিন্নাপ্পন তাকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললো। পোন্নাম্মা যে তাকে ভালোবাসতো একথা চিন্নাপ্পন জানতো কিন্তু সে ছিল অসহায়। তার বাবা যে জোর করে তাকে আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছে একথা চিন্নাপ্পন বুঝতে পেরেছিল। এটা যাতে না হ'তে পারে তাই এই পথ সে বেছে নিয়েছিল। হত্যার সময় সেখানে কোন সাক্ষী ছিল না। চিন্নাপ্পন যদি চুপচাপ থাকতো তাহ'লে হয়তো তাকে রক্ষা করা সম্ভব হতো, কিন্তু সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। "পোন্নাম্মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে সেখানে তাড়াতাড়ি যেতে হবে"—একথা চিন্নাপ্পন বললো, শুধু বলা নয়, বিশ্বাসও করেছিল। ওর হ'য়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু ওর একগুঁয়েমির জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না। ও ফাঁসির মঞ্চে এমনভাবে উঠলো যেন বিয়ের প্যাণ্ডেলে ঢুকছে। "পোন্নাম্মা, এই দেখ আমি এলাম বলে"—ফাঁসির মঞ্চে উঠে সেই ছিল তার শেষ কথা।

এই ঘটনাকে ভিত্তি করে সাপ্তাহিক মাতৃভূমিতে 'স্বর্গে বিবাহ' নামে একটা ছোট গল্পের কথা হয়তো কোনো কোনো পাঠকের মনে আছে।

কেস হাতে পেলেও যা টাকা পাচ্ছিলাম তাতে আমার কুলোচ্ছিল না। তাই উপার্জন বাড়াবার জন্য আমাকে অন্য উপায়ও খুঁজতে হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরের ওয়াই.

এম. সি. এ. একটা কর্মাস বিভালয় খুলেছিল। সেখানে সপ্তাহে আমি দু'বার পড়াতাম। সন্ধ্যেবেলায় ক্লাশ নিতাম বলে অন্য কাজের বিঘ্ন ঘটতো না। এর জন্যে যে পারিশ্রমিক পেতাম তা নিতান্তই অল্প। কিন্তু তখন এই টাকাটা আমার খুবই কাজে এসেছিল। ছ'মাস আমি এই কাজ করেছিলাম। শিক্ষকতা করার একটা সুযোগ এইভাবে লাভ করে আমি খুশীই হ'য়েছিলাম।

উনত্রিশ

অগাধ নৈরাশ্য

আমাদের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় সবই নির্ভর করছে প্রধানতঃ আমাদের নিজেদের ওপর। তবুও অনিয়ন্ত্রিত ও অনিবার্যভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটে যায় যা আমাদের দুঃখকষ্টকে বাড়িয়ে তোলে। যা করা উচিত, সেরকম ভাবে করেও আমাদের অভিজ্ঞতা যদি অন্য রকমের হয় তাহ'লে হতাশা অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক। সময়ের শক্ত হাত থেকে আর রক্ষা নেই এই রকম মনে হয়। এই রকম অনুভূতি আমার অনেকবার হয়েছে। "আজ এইটা করবো, আর এইটা করবো না" মনে মনে ঠিক করে বেরোলেও যা ভেবে রেখেছি তা করতে পারি নি। অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্য ঘটনা ঘটে গেছে। মালাক্কায় যে দুর্ভোগ আমাকে পোহাতে হয়েছে তা যেন আর না হয় ভেবে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট পরেও আমাকে পিষে মেরেছে, কঠিন ভাবে পিষে মেরেছে।

সিঙ্গাপুরে আসার একবছর পর একজন মক্কেল আমাকে তার একটা কেসের জন্য কোর্টে হাজির হবার জন্য ধরলো। এই কেসটা আগে সে একজন ইউরোপীয় অ্যাডভোকেটকে দিয়েছিল। এমনি ভাবে অ্যাডভোকেট বদলা বদলি করলে তাদের কতকগুলো ভদ্রতা পালন করতে হয়। এটা এখানকার নিয়ম। প্রথম উকীল যতদিন কাজ করেছে ততদিন পর্যন্ত তার ফী দিতে হবে। ফী দেওয়ার পর সমস্ত রেকর্ডগুলো চেয়ে নিতে হবে। যতদিন না পারিশ্রমিক দেওয়া শেষ হবে ততদিন কেসের রেকর্ডগুলো প্রথম উকীল তার কাছে রেখে দিতে পারবে। মক্কেল ফী দিতে না পারলে তার প্রাপ্য টাকাটা নতুন উকীল দেবে এই কথা আগের উকীলকে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেকর্ড সব নতুন উকীলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। মক্কেলের হাত থেকে টাকাটা আদায় করা না গেলে প্রতিশ্রুত টাকাটা নতুন উকীলের পুরোনো উকীলকে দিতে হবে, এই রকম নিয়ম।

আমাকে এই কেসে দাঁড়াতে বললে পর আমি ঐ কেসের রেকর্ডগুলো আমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য সেই ইউরোপীয়ান উকীলকে লিখলাম। ফী যদি কিছু বাকী থাকে তা দেবার দায়িত্ব আমি নিলাম, তাও লিখে দিলাম। আমার এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি আমাকে রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ফী বাবদ 100 ডলার বাকী আছে এ কথাও তিনি আমাকে জানালেন। শুনানী আরম্ভ হবার বেশ কিছুদিন আগে অবধি

আমি এই মামলার পেছনে খাটলাম। শুনানীর এক সপ্তাহ আগে এই ইউরোপীয়ান উকীলটির আর একটি চিঠি আমি পেলাম। এই কেসে উপস্থিত হবার জন্য তাঁর মক্কেল তাঁকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেছে, তাই রেকর্ডগুলো সব যেন তাঁকে আমি পাঠিয়ে দিই। আমার ফী যদি কিছু বাকী থাকে তাহ'লে তিনি সেটা দিয়ে দেবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিলাম। আমার ফী বাবদ 121 ডলার পাওনা আছে তা তাঁকে জানালাম। তিনি সেটাও আমাকে দেবেন বলে কথা দিলেন।

এর কিছুদিন পরে তিনি আমাকে তাঁর প্রাপ্য 100 ডলার পাঠিয়ে দিতে বল্লেন। আমি তাঁকে লিখলাম আমার বাবদ যে 121 ডলার তাঁর কাছে আমার পাওনা আছে তার থেকে 100 ডলার নিয়ে আমাকে 21 ডলার পাঠিয়ে দিতে। তিনি কিন্তু এতে রাজী হ'লেন না। আমি তাঁকে 100 ডলার পাঠাবো তারপর তিনি তাঁর 121 ডলার পাঠাবেন বলে বললেন। আমার মনে হ'লো এটা ভদ্রলোকের অন্যায় জেদ। আমি তাঁর কাছ থেকে বেশী টাকা পাবো। কাজেই আমার কাছ থেকে টাকা চাওয়ার ঔচিত্য আমি বুঝতে পারলাম না। আমারও জেদ বেড়ে গেল, এই নিয়ে আমরা অনেক চিঠি লেখালেখি করলাম। কথা দিয়ে কথা না রাখার জন্য তিনি আমার বিরুদ্ধে বার কমিটির কাছে অভিযোগ করলেন। কমিটি আমার কাছে এর ব্যাখ্যা চাইল। আমি আমার বক্তব্য জানালাম। অপর উকীলটির কাছে আমার পাওনা টাকা বেশী হলেও আমি তাঁকে যে টাকা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই টাকাটা আমার আগে ফেরং দেওয়া উচিত ছিল। আমি তা করিনি বলে আমি উকীলদের পরস্পরের মধ্যে পালিত রীতি লঙ্ঘন করেছি বলে বার কমিটি তাদের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে কোর্টে জানালো। কেস শুনানীর জন্যে এলে কোর্ট রায় দিল যে বার কমিটির অভিযোগ ঠিক। এর শাস্তি হিসেবে আমাকে দু'মাসের জন্য প্র্যাকটিশ করতে দেওয়া হ'ল না। এর সঙ্গে বার কমিটির কেসের খরচও আমাকে দিতে হল সবশুদ্ধ 650 ডলারের মতো। সিঙ্গাপুরে আমার প্র্যাকটিশ যখন বেশ জমে উঠেছিল তখন এই ভীষণ বিপদের সম্মুখীন আমাকে হ'তে হ'ল।

দু'মাসের উপার্জন নষ্ট হলো। শুধু তাই নয় আমার ভবিষ্যৎ যে এর ফলে খুব নিরাপদ হবে না সে কথা ভেবে আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। আমার দু'একজন বন্ধু বললো যে এই ভদ্রলোকটির টাকাটা আগে দিয়ে তারপর আমার টাকাটা চাইলেই হতো। এমনি অন্যায় জেদ না করলেই হ'তো। কিন্তু আমি যা করেছিলাম তা ঠিকই করেছিলাম এই বিশ্বাস তখন আমার ছিল, এখনো আছে।

এ সময় আমাকে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আমি কারোর সঙ্গে দেখা

করতাম না। শহর থেকে চার মাইল দূরে থাকতাম। যদি কোনো দরকারে শহরে আসতে হতো তাহ'লে হেঁটে যাওয়া আসা করতাম। বাসভাড়া খুব অল্পই ছিল, কিন্তু সে পয়সাও আমার হাতে না থাকায় দুপুর রৌদ্রে হেঁটে এসেছি আমার মনে আছে।

এমনি ভাবে দু'মাস কাটার পর আমি আবার প্র্যাকটিশ আরম্ভ করলাম। পাওনাদারেরা আমার প্র্যাকটিশের অপেক্ষায় বসে ছিল। খুব কষ্ট করে সংসার খরচ চালিয়ে বাকী টাকা সব পাওনাদারদের দিতাম। কিন্তু এতে আমার দুর্ভোগ যে কিছু কমলো তা নয়।

আমার নানা ধরনের পাওনাদার ছিল। আমি হয়তো কারোর সঙ্গে কথা বলছি সেই সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে উপস্থিত। তাদের দেখেই আমি ঘাবড়ে যেতাম। অন্যদের সামনে তাদের পাওনা টাকা চাইতে এতটুকু দ্বিধা তাদের হ'ত না। তাই তাদের দেখলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে হাতে টাকাকড়ি কিছু থাকলে দিয়ে দিতাম। এরকম ভাবে দেওয়া টাকাটা এক রকম ঘুষ বলে গণ্য হতো। এটা তাদের ধার বা সুদের মধ্যে ধরা হত না। আর এক ধরনের পাওনাদার ছিল। তারা খুব কৌশলী। আমার কষ্টে তারা সহানুভূতি দেখাতো। তারা আমার দুঃখকষ্ট যাতে দূর হয় তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তাও বলতো। তারপর তারা জেনে নিত আমার কোন মক্কেলের আমাকে ফী দেবার আছে কিনা। মক্কেলরা এসে চলে গেলেই তারা এসে আমাকে চেপে ধরতো। তাদের হাত থেকে কোনো ছুতোয়ই রক্ষা পেতাম না। হাতে পাওয়া অর্ধেক বা পৌনে তিন ভাগ টাকা তারা নিয়ে নিত। তারপর তার যদি কোর্টের কোনো কাজ থাকতো তা ঠিক করে দেবার জন্য আমাকে ধরতো। তার ফী আমি পেতাম না। চাইতেও আমি পারতাম না।

এই দুই ধরনের পাওনাদার ছাড়া তৃতীয় আর এক ধরনের পাওনাদার ছিল। তারা বড় নিষ্ঠুর ছিল। তারা আমার কাছে আসতো না। সব দায়িত্ব তারা উকীলের হাতে দিয়েছিল। সময় চাইলে, টাকার সংখ্যা একটু কমাতে বললে "উকীলকে বল্লেই হবে, সব আমরা উকীলের হাতে দিয়েছি" এই কথা তারা বলতো। উকীলের সঙ্গে দেখা করলে বলতো "আমার মক্কেল আমাকে এমন ভাবে কাজ করতে বলেছেন, কাজেই তিনি অন্যরকম করতে পারবেন না" বলে হাত কচলাতেন। এদের কাছ থেকে একটু সহানুভূতি আমি পাই নি। একজনের কাছ থেকে 1200শ' ডলার ধার করেছিলাম। সেই টাকার সুদ, সুদের সুদ, কোর্টের খরচ ইত্যাদি দিয়ে দেনা শোধ করেছিলাম 4000 হাজার ডলার। এর মধ্যে আমার জিনিষ বাজেয়াপ্ত করার তেরোবার

নোটিশ তিনি পাঠিয়েছিলেন। এটা শুধু একজন পাওনাদারের কথা বল্লাম। এমনি ভাবে আরো কত পাওনাদারের সঙ্গে আমার যুঝতে হ'য়েছিল।

একবার আমার এক উকীল বন্ধু তাঁর আর এক উকীল বন্ধুকে বলেছিলেন "মেননকে দেখলে তাঁর মনে যে কোন কষ্ট আছে তা মনেই হয় না।" আমি তা শুনতে পেয়েছিলাম। আমার মনে অশান্তির যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা বাইরে না দেখানোর প্রবল চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে তা দাউ দাউ করে জ্বলে বাইরে বেরিয়ে আসতো।

এই সময়কার একটা ঘটনার কথা বলি—

একবার এক পাওনাদার আমার অফিসের সব জিনিষ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। সেদিনই অন্য কয়েকজন পাওনাদার তাদের টাকা ফেরৎ পাবার জন্য আমার নামে মামলা দায়ের করেছিল। আমি যে বাড়ীতে থাকতাম তার ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়ীওয়ালা পরের দিন আমার জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করার জন্য তৈরী হচ্ছে সে কথা আমি জানতে পারলাম। বাড়ী ভাড়ার টাকা খুব বেশী না হলেও আমার কাছে তখন বেশী কম একই ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় খুবই হতাশ মনে আমি বাড়ী ফিরলাম। বাড়ীতে পৌঁছোনোর পর দু'তিন মাসের বিল্ দেওয়া হয়নি বলে ইলেকট্রিক লাইটের কানেকশান কেটে দেওয়া হয়েছে জানতে পারলাম। একটা লণ্ঠন আর দু' তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে যুঝছিল আমার বাড়ীর লোকেরা। সেদিন যা যা ঘটেছিল এবং পরের দিন যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আমার স্ত্রীকে একটা কথাও বল্লাম না। অসহ্য এক ভারের বোঝা আমাকে ক্রমশঃ নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কাপড় জামা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে একা একা বসেছিলাম। একটা 'ছোট্ট' মোমবাতি জানলায় জ্বালিয়ে রাখা হ'য়েছিল। সেখানে বসে সামনের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল আমার ভবিষ্যৎও অমনি ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। পাশের ঘর থেকে ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে কি যেন বলছিল শুনতে পেলাম! অভাবের কথা জানার বয়স তাদের হয়েছিল। আমাকে একা বসে থাকতে দেখে তারা কেউই আমার কাছে আসে নি।

আমার স্ত্রী গা ধুতে গেল। একটু পরে আমি বারান্দা থেকে উঠে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। সেদিন যা ঘটেছিল তার চেয়ে পরের দিন যা ঘটতে যাবে তাতেই আমি বেশী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার আর একটুও মানসিক বল ছিল না। কাপড় জামা রাখা আলনার থেকে বেল্টটা নিয়ে আমি গলায় জড়িয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরলাম। এমনি ভাবে দুতিন মিনিট আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি যে কি

করছিলাম তা আমি নিজেই জানতে পারি নি। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেলাম। লণ্ঠন হাতে আম্মু কাপড় বদলাবার জন্য ঘরে ঢুকে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেল। "একি করছ তুমি" বলে সে আমার হাত চেপে ধরলো। কিছুই না এমন ভাব দেখালেও আম্মু সব বুঝতে পারলো। আম্মু যদি ঠিক সে সময়ে না আসতো তাহ'লে কি যে হতো তা এখন বলতে পারি না। সেদিন বাড়ীর লোকেরা খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে কাটিয়েছিল।

যে বিপদের কথা ভাবছিলাম, পরের দিন তার সম্মুখীন হ'তে হ'ল না। বাড়ীওয়ালা দয়া করে বাড়ী ভাড়া শোধ করার মেয়াদ আরো দু'সপ্তাহ বাড়িয়ে দিলেন।

আমাকে যে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হ'ল তার জন্যে কি খারাপ কাজ আমি করেছি? "যেমন কর্ম তেমন ফল" এটা কি সাধারণতঃ দেখতে পাই? কোনো কোনো সময় দার্শনিক ব্যাখ্যা কোনো কাজে লাগে না। আমার এই সময়টা এমনি ছিল। এই পৃথিবীর ওপর আমার ঘৃণা ধরে গেল। কোনো রকমে যদি আমার মৃত্যু হতো তাহ'লে আমি তাকে অভ্যর্থনা করে নিতাম। তবে আত্মহত্যা করার মনও আমার ছিল না, সাহসও না।

মনকে খুব শক্ত করে বেঁধে কিছু একটা বলে মনকে সান্ত্বনা দিতে এই সময় চেষ্টা করেছি কিন্তু কখনো কখনো এ চেষ্টায় সফল হই নি। অপ্রতিহত বাধাবিপদ এলে তাকে সহ্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? অন্যদের সাহস দেখলে আমরা কি তার প্রশংসা করি না? আমরা কেন তাদের অনুকরণ করতে পারবো না? আপদ বিপদের সময়ই তো সাহসের দরকার। দুঃখকষ্ট সহ্য করে নি, আপদবিপদের সম্মুখীন হয় নি এমন মানুষ ক'জন আছে?

দেনা করা আমার কয়েকজন বন্ধুদের সম্পর্কে অন্যদের মন্তব্য শুনে আমি কষ্ট পেয়েছি। "এরা মিথ্যেবাদী, মতলব এঁটেই টাকাটা শোধ দিচ্ছে না" ইত্যাদি। "যারা ধার করে তারা কখনো কথা রাখে না"—এরকম আর একজন লোক বলেছিল। এই কথাটার মধ্যে সত্য আছে। নির্দিষ্ট দিনে টাকাটা দেওয়া সম্ভব নয় জেনেই দেনাদারেরা কখনো কখনো 'এই দিন দেব' বলে কথা দেয়। এটা আর কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে তখনকার মতো রক্ষা পাবার একটি পথ মাত্র। টাকা ধার করলে এমনটি না করে উপায় নেই।

খুব একটা বড় বিপদের সম্মুখীন হলে আমাদের সুপ্ত অন্তর্নিহিত শক্তি জেগে ওঠে। সাঁতার জানে না অথবা জলে নামতে ভয় পাওয়া একটি লোক তার বাচ্চার জীবন বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে রক্ষা করেছে এমন ঘটনার কথা শুনেছি। তেমনি ভাবে অত্যন্ত সঙ্কট মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পাবার অভিজ্ঞতাও আমার হ'য়েছে।

একবার একটা দেনা শোধ করার কোনো উপায় না দেখে যখন একান্ত নিরাশ হ'য়ে পড়েছি তখন এক বন্ধু আমার দরকারের টাকাটা নিয়ে এলেন। কোর্টে এই টাকাটা দেবার পনের মিনিট আগে এই টাকাটা তিনি এনেছিলেন বলে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক বছর পরে অন্য এক প্রকারে তাঁকে সাহায্য করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম।

অত্যন্ত সঙ্কটকালে ঈশ্বর বিশ্বাস যেন না হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এটা সবসময় সম্ভব হয় না। আবেগের বশীভূত হয়ে কখনো কখনো হয়তো আমরা কেঁদে ফেলি। কতবার আমি এরকম ভাবে কেঁদেছি। একা একা এক জায়গায় বসে একটা বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদা যে কি সান্ত্বনা আর তা কি শান্তিই না দেয়। কেউ কেউ বলবেন, পুরুষের পক্ষে ক্রন্দন একরকমের ভীরুতা। হ্যাঁ ভীরুতা বটে। কিন্তু ভীরুতা একবারও দেখান নি এমন বীর পুরুষ কি কেউ আছেন? সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কত বিরাট বিরাট যুদ্ধ সাহসের সঙ্গে চালিয়ে নেপোলিয়নও কখনো কোনো সময় আবেগের বশীভূত হ'য়ে কেঁদে ফেলেছিলেন বলে শুনেছি! আর আমি তো সামান্য একজন মানুষ।

অন্ধকারে রাস্তা না দেখতে পেয়ে, 'শীতে বৃষ্টিতে অবশ হ'য়ে পথিক আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে শুকনো কুয়োয় পড়ে যাবার মত আর একটা অভিজ্ঞতা আমার এ সময় হয়েছিল। আমার তৃতীয়া কন্যা হঠাৎ এই সময় অসুস্থ হ'য়ে মারা গেল। মৃত্যুর সময় তার 18 বছর বয়স ছিল। পদ্মিনী যেমন ভালো রাঁধতে পারতো, তেমনি ঘরকন্নার কাজেও খুব পটু ছিল। সকলকে সাহায্য করার জন্যে সব সময় সে এগিয়ে আসতো।

এই সময় 'সূর্যাস্ত' নামে বইটি আমি লিখতে আরম্ভ করি। এই বইয়ের পাতায় আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার ছায়া যদি কেউ দেখে থাকেন তাহলে তা খুব স্বাভাবিক। এই বইটা লিখে মনে বেশ শান্তি পেয়েছিলাম। এই বইটির কাটতিও ভালো হয়েছিল।

আমার কিছু বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি কখন লিখতে ভালোবাসি, তার জন্যে বিশেষ কোন সুবিধের দরকার কিনা। অন্য আর একজনের ফরমায়েশ মতো লিখতে গেলে সে লেখা এগোয় না। লেখার একটা প্রেরণা মন থেকে পাওয়া না গেলে লেখা যায় না। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা অবধি লেখা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকে আমি লিখতে ভালোবাসি। যদি তার সুবিধা না পাই, তাহ'লে বেশ ভালো একটা বাগান আমার চোখের সামনে থাকলে আমি লেখায় খুব প্রেরণা পাই। এক জায়গায় একা একা বসে লিখতে আমার ভালো লাগে। যে কোনো পরিবেশে বসে লেখা কয়েকজন বন্ধুকে জানি। আমি তা পারি না।

1934 সালের শেষের দিকে আমাকে একটা কেসের জন্যে বোর্নিও যেতে হয়েছিল। একজন মুসলমান ট্রাস্টীকে বিশ্বাস-বঞ্চনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হ'য়েছিল। তিনি একটা কেসে একবার সিঙ্গাপুর এলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তাঁর হয়ে কোর্টে হাজির হবার জন্যে তিনি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। ভালো পারিশ্রমিকও দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুর থেকে বোর্নিওর রাজধানী সান্‌ডেকে যেতে হ'লে ছ'দিন জাহাজে যেতে হয়। বৃটিশ উত্তর বোর্নিও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত, বোর্নিও কোম্পানী শাসন করতো। বোর্নিওর জঙ্গল কেটে সবে পরিষ্কার করা হচ্ছে। জনবহুল জায়গা থেকে লোক এনে বাস করানোর প্রচুর জায়গা এখানে আছে। ভারতবর্ষ থেকে বেশ কিছু লোক ওখানে নিয়ে গিয়ে বসবাস করানোর জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট যে কথাবার্তা চালাচ্ছিল তা পাঠকদের অনেকের মনে পড়বে। এক সপ্তাহ আমি এখানে ছিলাম। আমার মক্কেল কেসটি জিতেছিলেন। জিতে খুশী হয়ে তিনি আমাকে আরো টাকা দিয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে তাঁর সম্বন্ধে একটা খবর শুনে আমি অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। অকারণে হঠাৎ একদিন তাঁর চোখ ছুটির দৃষ্টি তিনি হারিয়ে ফেলেন। বেশ কিছু অসহায় গরীব লোকের ধনসম্পত্তি তিনি ঠকিয়ে নিয়েছিলেন বলে ভগবান তাঁকে এমনি শাস্তি দিয়েছেন এমন কথা তাঁর শত্রুরা বলতে লাগলো। সত্যি কথা ভগবানই জানেন। ভদ্রলোককে বেশ শান্ত, সৌম্য, দয়ালু, বলে আমার মনে হ'য়েছিল। কারণ যাই হোক্ না কেন, ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছেন শুনে আমার আশ্চর্য আর দুঃখ কম হয়নি।

ত্রিশ

কিছু বিশ্বাস কিছু ধারণা

আমাদের কাজ আর আমাদের আচরণ শুধু আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে না। আমাদের বিশ্বাস আমাদের মতামতেরও তাতে একটা বড় অংশ থাকে। আমাদের ব্যক্তিত্বকে রূপ দেয় এরাই। আমরা যেখানে জন্ম নিয়েছি, যেখানে বড় হয়েছি সেই সব পরিবেষ্টনীর প্রভাব আর অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক প্রভাবে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে তা আবার অভিজ্ঞতার ফলে বদলে যায়। অনেক কাল আগে আমার কতকগুলো বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস এখন আর আমার নেই। এক সময় যে সব মতামত, ধারণা অসংগত, অযৌক্তিক বলে বোধ হয়েছে আজ তাদের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখতে পাই না।

পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে এই বস্তুজগত্‌কে চেনার একটা সীমা আছে। কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অনুসারে জানতে পারি। একজন অন্ধের পক্ষে ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এক বধিরের পক্ষে সঙ্গীতের মাধুর্য অনুভব করা সম্ভব নয়। পুষ্পের সৌন্দর্যের কথা অন্ধের কাছে বধির বললে অন্ধ আশ্চর্য হয়ে গেলে, সঙ্গীতের মাধুর্যের অন্ধ প্রশংসা করলে বধির অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু তারা দুজনে যদি এই নিয়ে তর্ক করে তাহ'লে তারা কোথাও পৌঁছোবে না। অন্যের মতামত, বিশ্বাস, সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করা সংস্কৃতির লক্ষণ। তর্ক করে হারানো যায় কিন্তু এমন ভাবে হারিয়ে কি লাভ? আমার কিছু কিছু বিশ্বাসকে হয়তো কেউ কেউ বোকামি বলে ভাবতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার। আমাকে 'আমি' করে তুলেছে যা কিছু তার একটা অংশ এই বিশ্বাসগুলি। অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার পরিবর্তন এলে মতামত বদলে যায়। যদি না বদলায়, তাহ'লে তাদের আবার নতুন করে বিচার করার আগ্রহ জাগে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলব।

ত্রিবাঙ্কুরের এক পাণিক্কর মালয়ে বাস করতো। সে খুব ভালো হাত দেখতে জানতো। অনেক লোকের হাত দেখে অতীতের অনেক ঘটনা, আর ভবিষ্যতে কি হবে তা বলে দিয়েছিল। সিঙ্গাপুরের আইনানুযায়ী হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা বেআইনী। এই ভাবে হাত দেখার অপরাধে পুলিশ পাণিক্করকে অভিযুক্ত করে।

পাণিক্করের হয়ে এই কেসে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। করকোষ্ঠি গণনা একটা বিজ্ঞান, এটা শুধু মাত্র বিশ্বাস নয় এই ছিল পাণিক্করের যুক্তি। এই কেসের জন্য আমি হস্তরেখা বিচারের অনেক বই পড়লাম। পড়তে পড়তে এই শাস্ত্রে আমার খুব উৎসুক্য বাড়লো। কেস শুনানীর সময় আসামীর বৈদগ্ধ্য পরীক্ষা করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক কিছু প্রশ্ন করলেন। পাণিক্করের উত্তর শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সব শুনে আসামী অপরাধী নয় বলে ছেড়ে দিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট পাণিক্করকে ডেকে তাঁর হাত দেখালেন। একদিন আমার সঙ্গে দেখা হ'লে পর ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বল্লেন—পাণিক্কর আমার হাত দেখে অতীতের সমস্ত ঘটনা যেন বই থেকে পড়ছে এমনি ভাবে একটির পর একটি নির্ভুল ভাবে বলে গেল। ভবিষ্যতের কথাও বলেছে। সেটা অবশ্য পরীক্ষাযোগ্য। ভারী আশ্চর্য!

কেসে জেতার পর পাণিক্করের নাম আরো ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধু তাঁর হাত দেখানোর জন্যে পাণিক্করের খোঁজে এক রাতে আমার বাড়ীতে এলেন। তিনি একটা কেসে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কেসটি গুরুতর, তাই তাঁর ভবিষ্যৎ জানার জন্যে তিনি এসেছিলেন।

আমি তক্ষুণি পাণিক্করকে ডেকে পাঠালাম। পাণিক্কর হাত দেখে এই ব্যারিষ্টারের সম্বন্ধে যা যা বল্ল তা একেবারে হুবহু ঠিক। পাণিক্কর তাঁকে আগে দেখেনি। তিনি কে তাও জানতো না। তারপর ভবিষ্যতে কি হবে তাও বল্ল—ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকটি একটি কেসে জড়িয়ে পড়েছেন। তার থেকে তিনি রক্ষা পাবেন বটে কিন্তু একটা খারাপ নাম তাঁর কিছুদিন থেকে যাবে। এতে তাঁর কাজকর্মের বেশ ক্ষতি হবে। আর ঠিক এই রকমটিই হয়েছিল।

করকোষ্ঠি গণনায় আমার যে বিশ্বাস ছিল তা ভেঙ্গে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে সে আর এক রূপ নিল। এই অভিজ্ঞতাকে কি আমি অবহেলা করতে পারি? বেশ কিছু দিন আগে আমার বিশ্বাস আর ধারণা সম্পর্কে সাপ্তাহিক মাতৃ-ভূমিতে লিখেছিলাম। তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

—এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা এই দুটো বিপরীত জিনিষের ঐক্যসাধন করা অসম্ভব। যে কোন ঘটনারই শুধু কতকগুলো দিক আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়। এর থেকেই আমাদের বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এমনি ভাবে আমরা যা দেখি, যা বলি তাতে রং না চড়িয়ে এবং না বদলিয়ে বলার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তবেই সেটা আমাদের মত বা ধারণা বলে বলতে পারব।

জীবনের রহস্য যাই হোক্ না কেন জীবনের সুখ উপভোগ করতে আমি চাই। জীবনের রহস্য খুঁজতে গিয়ে এই আকাঙ্ক্ষার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। দেহ, মন, বাসস্থান, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে সুন্দর করে তোলার আমার ইচ্ছা। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুবিধাজনক বাসস্থান, অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভালো ভালো বই, খেলায় মত্ত ছোট্ট শিশু, মধুর গান—এ সবই আমার ভালো লাগে। কিন্তু এসব না থাকলে জীবন যে আমার নিরাশায় ভরে যাবে তা আমি মনে করি না।

এই পৃথিবীতে কত কত হতভাগ্য রয়েছে। তারা অনেকেই আমাদের সাহায্যের আশা করে। সকলকে হয়তো সাহায্য করা যায় না তবু কয়েকজনের জীবনের দুঃখ-ভার লাঘব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই তাহ'লে সে ক্ষতি হাসি মুখে সহ্য করা উচিত। এতে সাহায্যপ্রার্থী আশ্বাস পায়। আমাদের নিজেদের নৈতিক মূল্যও এতে বেড়ে যায়। সত্যিকারের সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করতে পারিনি বলে অনেক সময় আমি মনে মনে দুঃখ অনুভব করেছি। আমার মৌনতায় হয়তো তারা ভুল বুঝেছে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না বলে মনকে সান্ত্বনা দিই।

অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি না হ'য়ে পারে না। শত্রু তৈরী করবো না একথা মনে করলে কোনো কাজেই হাত দেওয়া যায় না। আমরা যা করতে চাই তা অন্যের স্বীকৃতি পাবে এমন নাও হ'তে পারে। সামাজিক পদমর্যাদা, টাকাকড়ি, নাম, খ্যাতি যার আছে তার শত্রুও আছে। আমাদের মানসিক বিকাশের জন্যে এর হয়তো দরকার। যারা আমার শত্রুতা করতে চায় তাদের কথা ভেবে আমি আমার মনের শান্তি নষ্ট করি না। প্রতিশোধ নেবার কোনো স্পৃহা আমার মধ্যে কোন দিন জাগেনি। আমার যারা ক্ষতি করেছে তাদের আমি পরে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছি। তাতে তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখে খুশী হবার সুযোগ শুধু একবার না, অনেকবার মিলেছে। "কাউকে কি আপনি ঘৃণা করেন, কাউকে কি আপনি আপনার শত্রু বলে মনে করেন?"—একথা আমাকে জিজ্ঞেস করলে একজন লোকেরও নাম আমি বলতে পারবো না। নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করলেও আমার মনের স্থৈর্য আর শান্তি আমি হারাই নি—এইটাই হচ্ছে এর কারণ।

নাম, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এসবই ক্ষণস্থায়ী। যে হৃদয়ে কোনো কালিমা লাগেনি সেই হৃদয়ের পক্ষেই জীবনের সব রস গ্রহণ করা আর তার থেকে আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয়।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে সব শেষ হয়ে যায় এ বিশ্বাস আমি করি না। মৃত্যুর পর যে কি

হয় তা আমি জানি না। তবে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার জীবন যাতে অন্যের কাজে লাগে সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলার ইচ্ছে আমার আছে।

অনেক লোকে বলে, মানুষ বড় নিষ্ঠুর, বড় ক্রূর। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। মানুষের ভালো মন্দ দুই দিক আছে। যাদের ভালো গুণগুলো এখনো ঘুমিয়ে আছে সেগুলোকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের কর্তব্য। "অন্যদের চোখে ধুলো না দিয়ে তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিতে আমি সাহায্য করেছি"—একথা যদি আমরা বলতে পারি তাহ'লে তা কত আনন্দের কথা।

ঈশ্বরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হয় না। যদি এই বিশ্বাস আমার না থাকতো তাহ'লে জীবনের ঘোর অন্ধকার মুহূর্তগুলিতে আমি যে কি করে ফেলতাম তা আমি এখন বলতে পারি না।

"আমার জীবনের আর কোনো মানে নেই। যা ভেবেছিলাম তা করতে পারলাম না"—এমনি ভাবে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব আমার কাছে দুঃখ করেছেন। তাঁদের দুঃখ—একসঙ্গে পড়া কেউ কেউ খুব ভালো কাজ পেল, ওপরে উঠে গেল, কিন্তু তাঁদের পক্ষে উঠা সম্ভব হ'ল না। যারা নীচুতে ছিল তারা ওপরে উঠে গিয়ে এখন প্রচুর টাকা করেছে, কিন্তু তাঁদের ভাগ্য নেই এই তাঁদের দুঃখ। জীবনের যুদ্ধে তাঁরা হেরে গেছেন, এই হচ্ছে তাঁদের মনোভাব। তাঁদের এই মনোভাব একটা ভুল থেকে গড়ে ওঠে, যার মূল্য আমরা খুবই দিই। টাকাপয়সা, নামযশ, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে যারা জানে তারা এতে ভুল করে না। সম্প্রতি যে কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেল সে কথা স্মরণ করলে একথাগুলোর মানে বোঝা যাবে। ইজিপ্টের রাজা ফারুক একদিন হঠাৎ রাজ্যচ্যুত হয়ে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হলেন। "ফারুককে তাড়িয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়ে সেই ক্ষমতা নাগীবও বেশী দিন ভোগ করতে পারলেন না।" নাসেরকে সেই ক্ষমতা দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। পারস্যের প্রধানমন্ত্রী মোসাদেক পরে জেলের কয়েদী হ'য়েছিলেন। ষ্টালিন ক্ষমতায় এসে ট্রটস্কীর নামধাম তার কাজ সব কিছু ধ্বংস করে ফেল্লেন। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর আবার তাঁর স্মৃতিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন তাঁর পরবর্তী নেতারা। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা সুকর্ণের কি অবস্থা হলো। মানুষের জীবন নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেলতে হয়তো অদৃষ্টের খুব মজা লাগে।

এমনি ভাবে ইতিহাস আর ঘটনাকে বদলে দেবার, ঢেকে রাখবার অপচেষ্টা কতবার এই পৃথিবীতে হয়েছে। তাই নাম, যশ, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির মোহটা কি অর্থহীন নয়? শুধু দুটো জিনিষের বোধহয় স্থায়িত্ব আছে—জন্ম ও মৃত্যু। আর এই দুই

ঘটনার মধ্যেকার সময়ে যা কিছু ঘটে তার কোনটারই স্থায়িত্ব নেই, স্থিরতা নেই। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে একটিমাত্র জিনিষ আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে, আশ্বাস দিতে পারে, তা হচ্ছে দিল খুলে অপরকে সাহায্য করা, আন্তরিক ভাবে সকলকে স্নেহ করা।

দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন—জীবনে জয়লাভ করাটা আমাদের লক্ষ্য নয়। অপরের কাজে লাগাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষ সাধারণতঃ পাওয়াটাকে তার সাফল্য বলে মনে করে। কিন্তু নেওয়ার চেয়ে দেওয়াটাই বেশী দরকার। যে এমন ভাবে দিতে পারে তারই জীবন সফলতায় ভরে যায়।

আমার বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করা আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়নি। কখনো কখনো হয়তো বিশ্বাসের প্রতিকূলে কাজ করতে হয়েছে। এটা হয়েছে, প্রলোভন-গুলোর সঙ্গে আমি সাহসের সঙ্গে লড়াই করতে পারি নি বলে। চরিত্রের দৃঢ়তার ওপর তুলনামূলক ভাবে আমাদের সাফল্য, অসাফল্য, সুখ, দুঃখ নির্ভর করে। আমরা কেমন ভাবে সময়ের ব্যবহার করি, কেমন ভাবে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই, অপরের সঙ্গে কেমন ভাবে ব্যবহার করি, জীবনকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি, এ সবের মধ্যে দিয়েই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। ভাগ্য আমাদের আশীর্বাদ করলেও, আমাদের প্রচুর অর্থ থাকলেও চরিত্র গঠনের দিকে যদি আমরা মানাযোগ না দিই, তাহ'লে অন্য কোন কিছুই আমাদের সুখ বা শান্তি দিতে পারবে না। শত্রুদের থেকে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে অকলঙ্ক বিবেকের ওপর নির্ভর করে থাকাই একমাত্র উপায়।

একত্রিশ

আবার রাজনৈতিক জীবন

1934 সালে একটা কেসে আমি বোর্নিও গিয়েছিলাম, একথা আমি আগেই বলেছি। ওখান থেকে ফিরে আসার পর আমার ঋণভারের বোঝা একটু একটু করে কমতে লাগলো। ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে না পারলেও ঋণ শোধ করার কতকগুলো সুযোগ এল, সমস্ত ঋণ শোধ করতে আমার চার বছর লেগেছিল।

সিঙ্গাপুরে থাকার সময় রাজনৈতিক কাজে যোগ দেবার সুযোগ আমার মেলেনি। সেখানকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে কখনো সখনো কাজ করেছি অবশ্য। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতীয় সঙ্ঘ, মালয়ালী সমাজ ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বেশী করিনি। দেনা যতদিন শোধ করতে না পারছি ততদিন অন্য কোনো দিকে মন দেব না, এই ঠিক করেছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক জীবনে নামব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অনেক সময় আসে যখন কিছু না করে পারা যায় না। এমনি একটা সময় এসেছিল 1935 সালের মে মাসে। সে বছর জুন মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জুবিলী উৎসব সিঙ্গাপুরে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সময় সিঙ্গাপুরের এক কাগজে মার্টিন নামে এক ইংরেজ ভারতবাসীদের নিন্দে করে একটা লেখা লিখেছিল। সে লিখেছিল—"মালয়ে নানা ধরনের ভারতীয় আছে, তাদের মধ্যে এত জাতি বিভেদ যে তারা কখনো এক হ'তে পারে না। তবে একটা বিষয়ে তারা সকলে এক। তাদের মতো এমন অবিশ্বাসযোগ্য আর কোনো লোক পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। সিংহলে আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। মালয়েও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছে। আমি এখানে বড় বড় ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না। এই ধরনের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসায়ী আদব কায়দা পালন করে। ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমার অভিযোগ। এ ধরনের ছোট ব্যবসাদার মালয়ে অসংখ্য আছে। তাদের সঙ্গে ব্যবসা করাটা যে একেবারেই অসম্ভব একথা ইউরোপীয়ানরা স্বীকার না করে পারবে না।"

সমস্ত ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এমনি বিশ্রী মন্তব্য করায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয়েরা খুবই ক্ষুব্ধ হলো। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির একটা বিরাট প্রতিবাদ সভা সিঙ্গাপুরের টাউন হলে ডাকা হলো। মার্টিনের লেখার প্রতিবাদ করে মুখ্য প্রস্তাব আনার জন্যে

আমাকে এই সভায় ডাকা হয়েছিল। এই রকম একটা পটভূমি আর এই একটা বিরাট সভা আমাকে আবেগে ভরিয়ে তুললো। "নিজের দেশের কথা বলতে গিয়ে যেমন আবেগে ভরে যায়, আর সেদিন তাকে এমনিই দেখেছিলাম"—এই সভার কথা সমালোচনা করে একজন ইউরোপীয়ান একটা কাগজে লিখেছিল। কিন্তু আবেগের বশীভূত হ'লেও আমি আমার বক্তব্য সম্বন্ধে খুবই সাবধান ছিলাম। এই বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :—

—এর চেয়ে বেশী নিন্দাজনক কোনো লেখার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এই লেখা পড়লে যে কোনো ভারতীয়ের রক্ত গরম হয়ে উঠবে। নিজের জাতের জন্য অহঙ্কার অনুভব করা মানুষের দুর্বলতা নয়। সেটা তার শক্তি। আমাদের দেশের সংস্কার আর ঐতিহ্যের জন্য আমরা গর্বিত। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নিন্দে করলে তা অবহেলা করার মত মনের জোর আমার আছে। কিন্তু আমার দেশ বা দেশবাসীকে কেউ নিন্দে করলে তাদের উচিত মতো শিক্ষা দেবার ইচ্ছে আমার আছে সেটা মনে রাখলে ভালো হয়।

একজন নামকরা ইউরোপীয়ান উকীল এই সভা সম্বন্ধে সিঙ্গাপুরের এক কাগজে লিখেছিলেন—আমি অনেক বছর ধরে এ শহরে আছে। ভারতবাসী এবং অন্যান্যদের দ্বারা আয়োজিত সভাসমিতিতে যোগ দেবার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু 23শে মে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ভারতবাসীদের যে সভা হ'য়েছিল সে রকম একটা বিরাট সভা সিঙ্গাপুরে আর হয়েছে বলে আমার মনে পড়ছে না।

এর পর সিঙ্গাপুরের কাগজগুলোতে মার্টিনের ক্ষমা প্রার্থনা ছাপানো হ'য়েছিল। মার্টিনের যে লেখা সিঙ্গাপুরে এই রকম একটা বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা এমনি ভাবেই শেষ হলো।

সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম আমাকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির একটা বিরাট বাড়ী এবং ভালো একটি অনাথ আশ্রম ছিল। এর কাজকর্মও খুব ভালো ভাবে চলছিল। আমি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম তখন সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন ভাস্করানন্দ স্বামী।

1936 সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হবে বলে ঠিক হলো। এই উপলক্ষ্যে একটা সর্বধর্ম সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী ভাস্করানন্দ আমায় কিছু বলতে বললে পর আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। নানা ধর্মের লোকেদের মিলিত এই সভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলার জ্ঞান বা

যোগ্যতা আমার ছিল না। কিন্তু ভাস্বরানন্দ স্বামিজীর পেড়াপীড়িতে বেদান্তের মহত্ত্ব, রামকৃষ্ণ মিশনের মহৎ কাজ ইত্যাদির বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলাম, সে কথা এখনো আমার মনে আছে।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আর একটা ঘটনার কথা এখানে বলব। সিঙ্গাপুরে অনেক ভারতীয় শ্রমিক আছে। এরা সব মিউনিসিপ্যালিটিতে, পূর্ত বিভাগে বেশীর ভাগ কাজ করতো। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা ভারতীয় শ্রমিকদের চেয়ে ভালো ছিল। তাদের যে বেতন দেওয়া হতো তা তত ভালো না হলেও তাতে তারা খুশীই ছিল। মাঝে মাঝে বর্ধিত বেতন এবং আরো নানারকম সুযোগ সুবিধার দাবী তারা তুলতো। প্রথম প্রথম তারা তাদের দরকারগুলো মালিকদের বুঝিয়ে বলত। ক্রমে তাদের দাবীদাওয়া চাওয়ার ধরন ধারণ বদলালো। তাহ'লেও তখনো পর্যন্ত ধর্মঘটের জন্য তারা প্রস্তুত হয় নি। তবে মাঝে মাঝে ধর্মঘট যে তারা করেনি তা নয়। 1936 সালের নভেম্বর মাসে এইরকম একটা ধর্মঘট হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরের জনজীবনের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করা শ্রমিকেরা তাদের বেতন বাড়াবার দাবী করলো। আরো একটা দাবী—বরখাস্ত শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। মালিকরা তাদের কোনো কথাই শুনল না। শ্রমিকদের হ'য়ে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছিলাম আমি। উকীল হিসেবেই আমি কাজ করেছিলাম। এতে অবশ্য কোন ফল হ'ল না।

শ্রমিকেরা শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করা ঠিক করলো। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ বন্ধ করল। সিঙ্গাপুরের সমস্ত আবহাওয়া বদলে গেল। উকীল থেকে হঠাৎ আমি শ্রমিক নেতা হ'য়ে দাঁড়ালাম। অফিসের কাজ এবং কোর্টে যাওয়া দু'সপ্তাহের জন্য আমি বন্ধ রাখলাম। শ্রমিকদের দাবীগুলি যাতে মেটে এবং ধর্মঘট তাড়াতাড়ি শেষ হয় তার চেষ্টা আমি করলাম। এই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকর্তাদের সঙ্গে বহুবার দেখা করতে হ'ল। শ্রমিক নেতারা সমস্ত সিদ্ধান্ত আমার ওপর ছেড়ে দেওয়ায় আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। এই সব ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত কিছু করলেও শ্রমিকদের তাতে সন্তুষ্ট করা কঠিন। তাহ'লেও এই দায়িত্ব আমি নিলাম। দু'তিন দিন আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল।

সিঙ্গাপুরের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে অন্বেষণ করতে মিউনিসিপ্যালিটি রাজী হলো। এই অন্বেষণের ফলে মজুরদের যা প্রাপ্য তা 1936 সালের ডিসেম্বর থেকে হবে বলে ঠিক হ'ল। ধর্মঘটের সময় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া শ্রমিকদের আবার কাজে নিতেও তারা রাজী হ'ল। ভারতীয় শ্রমিকদের জায়গায় অন্য শ্রমিকদের নেবার চেষ্টা তাঁরা করবে না বলে কথা দিল।

তখনকার অবস্থানুযায়ী এই সিদ্ধান্ত যে খুবই সন্তোষজনক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। এই ঘটনার অল্প পরেই শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ করার জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র নাম এবং খ্যাতি অর্জন করা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতো ইংরেজীতে বক্তৃতা করার ক্ষমতা খুব বেশী লোকের ছিল না। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শ্রমিকদের ব্যাপারে তিনি কোনো বিপ্লবাত্মক মতামত দেবেন তা কেউ প্রত্যাশা করে নি। তবু মালয়ের ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী যে সব মতামত প্রকাশ করেছিলেন এবং যে সব সুপারিশ করেছিলেন তা আমাদের আশার কাছাকাছি পর্যন্ত ছিল না। এগুলো শুধু শ্রমিকদের নয় অন্যদেরও অবাক করে দিয়েছিল। কুয়ালালামপুরের 'ইণ্ডিয়ান' কাগজে একজন লিখেছিলেন—শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর এই সুপারিশ মালয় গভর্ণমেণ্ট আর বাগানের মালিকের সম্পূর্ণ অনুকূলে। এই রিপোর্টের কর্তারা ভারতীয় শ্রমিকদের সমস্যাগুলি ভালো করে বুঝে রিপোর্ট করেছেন বলে মোটেই মনে হয় না।

মালয়ে ভারতীয় মজুরদের অবস্থা অন্বেষণ করতে এসেছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। তাঁর উচিত ছিল মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণ অন্বেষণ করা। এর জন্য তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন নি।

এই নিয়ে কাগজে কিছু বিবৃতি দেওয়া এবং বাদ প্রতিবাদ চলেছিল। সেই সময় এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমাকে একটা চিঠি দেন। চিঠির কিছুটা এখানে দিচ্ছি। এর থেকে বোঝা যাবে ভারতবাসীদের এই ব্যাপারে তখন কি মত ছিল।

—আপনার বিবৃতি আমি পড়েছি। মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের অবস্থা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে বোঝাবার জন্য আপনি যে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেছিলেন তা এর থেকে বোঝা যায়। জলন্ত আগুনকে নিভোবার জন্য আপনি যা করেছেন তা ভোলা যায় না। মালয়ে যারা আছে তারা খুবই উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই ধর্মঘটের সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। এই রকম একটা মুখ্য ব্যাপারের বিষয় জানার চেষ্টা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কেন যে করলেন না তা আমরা বুঝতে পারছি না।

এ ঘটনা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক। এর জন্য দায়ী শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী অথবা তাঁর উপদেষ্টারা তা আমি জানি না। শাস্ত্রী মশায়ের রিপোর্ট পড়লে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লেও তিনি যে অন্যভাবে রিপোর্ট দিতেন তা মনে হয় না।

বত্রিশ

অন্ধকার অন্তরীক্ষ

জীবন যত অন্ধকারেই ভরা থাক্ না কেন, মাঝে মাঝে তাতে আলোর রেখার দেখা পাওয়াটা দুর্লভ নয়। অন্ধকার থেকে আমিও আলো দেখতে পেলাম। জীবনের সঙ্কীর্ণ রুদ্ধ ঘরখানি থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের নির্মল বায়ুতে আরাম করে নিঃশ্বাস নিলাম। দেনার দাসত্ব থেকে আমি মুক্ত হলাম। আমি স্বাধীন হলাম।

এত টাকার দেনা আমি শোধ করেছি জেনে আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। ফিরে পাওয়া প্রমিসরী নোট, কোর্টের রায়, অন্যান্য কাগজপত্র সব আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেল্লাম। কাগজগুলো যখন পুড়ছিল তখন আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করছিলাম। আর যেন কোনো দিন দেনাদারের দৈন্য আর বেদনা আমাকে পেতে না হয় এই প্রার্থনা করে আমি আমার কাজ করতে শুরু করলাম। আমার আয় বাড়লো, বন্ধুদের সংখ্যাও বাড়লো। কাজকর্মে আমি আবার পূর্ণ উৎসাহ ফিরে পেলাম।

আমার দ্বিতীয় কন্যা তাউকমের বিয়ে 1936 সালের সেপ্টেম্বর মাসে হলো। আমার জামাই সিঙ্গাপুরেই কাজ করতো। অনেক দিন ধরে নানা রকম দুর্ভোগের পর এই সময়টাই একটু সুখের মুখ দেখেছিলাম। তিন বছর পর আমার কনিষ্ঠা কন্যা লীলারও বিয়ে হলো। এই মেয়ের বিয়ের সময় দেশে ফিরবো এরকম একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।

1936 সালে কংগ্রেসের সিলভার জুবিলী কালিকটে পালন করা হ'ল। সেই উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্যে এক নিমন্ত্রণ পেলাম। এই নিমন্ত্রণে আমি সাড়া দিতে না পারলেও কংগ্রেসের জন্য আমি একদিন যে সামান্য কাজ করেছিলাম তা যে আমার বন্ধুরা মনে রেখেছেন তা দেখে আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম।

সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সঙ্ঘের মধ্যে ফাটল ধরাবার একটা চেষ্টা 1939 সালের এপ্রিল মাসে হয়েছিল। এ সময় ভারতবর্ষে একটা রাজনৈতিক জাগরণ এসেছে। সঙ্ঘের সদস্যেরা তাই একসঙ্গে হলেই ভারতবর্ষের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। তখনকার পরিস্থিতিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কঠোরভাবে সমালোচনা না করে ভারতের ব্যাপারে

কিছু বলা সম্ভব ছিল না। এখানে বসে এমনি ভাবে তর্কাতর্কি করা শুধু হঠকারিতা নয়, বিপজ্জনক বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো।

ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় সঙ্ঘের অফিসে কোনোরকম বাদানুবাদ করা যাবে না বলে একটা প্রস্তাব পাশ করা হবে বলে তারা ঠিক করলো। সরকারী অফিসার, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহী নয় এমন কেউ যদি সঙ্ঘের সদস্য হয়ে থাকতে চান তাহলে তারও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে তারা বল্ল। এই ধরনের প্রস্তাব পাশ করা সঙ্ঘের কাজকর্মের পক্ষে হানিকর বলে আমার মনে হয়েছিল। অনেক সভ্য আমার মতোই ভেবেছিলেন। এরকম একটা প্রস্তাব পাশ করানোর দরকার নেই বলে আমি মনে করেছিলাম। সভা হবার বেশ কিছুদিন আগের থেকেই দু'পক্ষ তাদের সমর্থক জোগাড় করতে চেষ্টা করলো। একদিন সকাল বেলায় এই মিটিঙ্ ডাকা হলো। তিনঘণ্টা তর্কাতর্কির পর প্রস্তাব ভোটে ফেললে পর নাকচ হয়ে গেল। আমরা একে আমাদের একটা বিরাট সাফল্য বলে মনে করলাম।

একটার পর একটা ঘটনা খুব দ্রুতবেগে ঘটে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। অনেক কোটি টাকা ব্যয় করে সিঙ্গাপুরে এর জন্যে একটা নৌঘাঁটি তৈরী করাও হলো।

ইউরোপের ঘটনাবলী মালয়ের অধিবাসীরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। হিটলার তখন তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে। জার্মানীর ফুরার কি বলছেন, কি করছেন, সমস্ত বিশ্ব তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। নেপোলিয়নের পর সারা ইউরোপকে এই রকম ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়া ব্যক্তি ইতিহাসে আর কেউ ছিল না। হিটলার আর মুসালিনী বেশ কিছু কাল এই পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে প্রধান অভিনেতা ছিলেন।

1939 সালে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরে এর ছোঁয়া লাগলো। বিপুলভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হলো। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড থেকে সৈন্যরা আসতে শুরু করলো। শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে মতো দরকার ট্রেনিং নাগরিকদের দেওয়া হ'ল। ইউরোপের যুদ্ধ কখন যে মালয়ে এসে উপস্থিত হয় তার জন্যে সকলে শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

যুদ্ধের সময় ভারত যে পথ অবলম্বন করেছিল তা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভালো লাগে নি। গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্য তারা জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ করছে একথা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বল্লেও এর কোনোটাই ভারতবর্ষে ছিল না। এর কারণ অবশ্যই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু ভারতীয়দের কাছ থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে দরকার মতো সাহায্য পাবার জন্য এইসব বড় বড় কথা তারা বলেছিল।

ভারতবাসীদের মধ্যে একতা নেই বলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় না, ভারতে কিছু শাসন সংস্কার করা হয়েছে, এই শাসন সংস্কার সারা দেশে প্রবর্তন করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত, এই সব ছিল তাদের প্রচারণার মুখ্য বস্তু। এই প্রচারকে জোরদার করার জন্য এড্‌উইন হাওয়ার্ড নামে এক অফিসার কিছু লোক সঙ্গে করে সিঙ্গাপুরে এলেন।

যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতীয়দের মনোভাবকে সমালোচনা করে সিঙ্গাপুরের একটি নামী পত্রিকা 'ফ্রী প্রেস' একটা সম্পাদকীয় লিখেছিল। এর উত্তরে ভারতীয়দের ব্যবহারের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আমি ঐ পত্রিকায় একটা দীর্ঘ লেখা লিখেছিলাম। "গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ ইউরোপের যুদ্ধে হচ্ছে না, হচ্ছে ভারতের জেলগুলিতে" একথা আমি বলতে এড্‌উইন্ হাওয়ার্ড খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি ভারতে বৃটিশেরা যে শাসনসংস্কার প্রবর্তন করেছে, সেটা আমার লেখার প্রত্যুত্তরে দেখিয়েছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম—"নতুন শাসন সংস্কার আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে চাই নি। আমাদের নিজেদের শাসন আমরা নিজেরা করবো এই দাবীই আমরা বৃটিশ সরকারের কাছে করছি।" 'ফ্রী প্রেস' কাগজে আমাদের তর্কাতর্কি ভারতীয়দের মধ্যে খুব উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল। কয়েকজন বন্ধু অবশ্য আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—যুদ্ধের সময় এটা, একটু সাবধান হবেন।

আমার সঙ্গে তাঁর দেখা করার খুব ইচ্ছে বলে এড্‌উইন্ হাওয়ার্ড আমাকে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা অনেকক্ষণ ভারতবর্ষের অবস্থা নিয়ে কথাবার্ত্তা বলেছিলাম। বিদায় নেবার সময় আমরা দুজনেই নিজ নিজ মতকে আঁকড়ে ধরে রাখি। আর একবার দেখা করবো বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ আর হ'ল না। ততদিনে মালয়ে যুদ্ধ এসে গেছে।

1941 সালের 8ই ডিসেম্বর সকালে কোন রকম সতর্কীকরণ ছাড়াই সিঙ্গাপুর শহরে দু'টো বোমা পড়ল। এই বোমার ভীষণ শব্দে শহরবাসীরা সব জেগে গেল। জাপান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একথা তারা সকাল হবার পর জানতে পারলো। দু'দিন পরে জানা গেল যে জাপানী সৈন্যরা দ্রুত সিঙ্গাপুরের দিকে এগিয়ে আসছে। ভীষণ ভয় পেয়ে কেউ কেউ মালয় ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। কিন্তু পালিয়ে যাবার যথেষ্ট জাহাজ ছিল না। লোকে ঠেসেঠুসে কোনো রকমে যাত্রা আরম্ভ করলো। কিন্তু জাপানীদের বোমা পড়ে কোনো কোনো জাহাজ শেষ হ'য়ে গেল। কোনো কোনো জাহাজ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারল না। স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, তা কে জানে। যারা পালাতে পারল না তারা আশ্রয়

তৈরী করে খাবার দাবার সংগ্রহ করে কি করে রক্ষা পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। আমিও অফিস যাওয়া বন্ধ করলাম।

রোজ সকালে আমরা খবর পাচ্ছিলাম যে জাপানীরা নতুন নতুন জায়গা অধিকার করে নিচ্ছে। অন্যান্য জায়গা থেকে শরণার্থীরা এসে সিঙ্গাপুরে ভীড় জমালো। আর যাই হোক না কেন, জাপানীরা সিঙ্গাপুর দখল করতে পারবে না এ কথা লোকে পূর্ণ বিশ্বাস করতো। সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি সম্বন্ধে তাদের অতি মাত্রায় বিশ্বাস ছিল। যতদিন এই নৌঘাঁটি এখানে আছে ততদিন জাপানীদের ভয় করবার কিছু নেই বলে উইনস্টন চার্চিল এই সময় বলেছিলেন। কিন্তু কোনো রকম বাধা না পেয়েই শত্রু অনায়াসে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো। জাপানীরা পিনার, কুয়ালালামপুর, মালাক্কা এসব জায়গা দখল করলো।

1942 সালের 31শে জানুয়ারী জাপানীরা সিঙ্গাপুরের কাছে জোহরে এসে উপস্থিত হয়েছে এই খবর জানার পর সিঙ্গাপুর আর তার আশপাশের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। শহর সৈন্য আর যুদ্ধ সামগ্রীতে ভরে গিয়ে একটা বিরাট ছাউনী হ'য়ে দাঁড়ালো।

জোহর থেকে পশ্চাদপসরণ করে বৃটিশ সৈন্য যখন তাদের সঙ্গে অসংখ্য যানবাহন আর যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হলো তখন সে দৃশ্য দেখার মত ছিল। জোহর আর সিঙ্গাপুরের সংযোজক পোলটি শত্রুর গতিকে ব্যাহত করতে বৃটিশ সৈন্যরা ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিল। কিন্তু এতে জাপানীদের গতি রুদ্ধ করা গেল না। সিঙ্গাপুর অধিকার করার যুদ্ধ শীঘ্রই আরম্ভ হবে, আর তা শেষ হতেও বেশী সময় লাগবে না, একথা সকলে বুঝতে পারল। "জাপানীরা সিঙ্গাপুর দখল করার প্রস্তুতি শুরু করেছে" টোকিও রেডিও থেকে একথা বলার পর ভীষণ একটা কিছু হ'তে যাচ্ছে বলে আমরা বুঝতে পারলাম। এমনিভাবে চারদিন কাটলো।

"সিঙ্গাপুর দখল করার ক্ষমতা শত্রুর কোনো দিনই হবে না। তাদের এটা করতেও হবে না। এক ইঞ্চি জায়গাও আমরা ছেড়ে দেব না। জয় আমাদের হবেই"—একথা সিঙ্গাপুরের গভর্ণর বলার পর বৃটিশেরা বিরাট একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে একথা সকলে বিশ্বাস করলো। কিন্তু হলো অন্যরকম। আর যা ঘটলো তা খুব তাড়াতাড়িই শেষ হলো।

তেত্রিশ

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পর

যুদ্ধের সময় আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা 'ভূত ও ভাবীকাল' বইটিতে সবিস্তারে লিখেছি। যুদ্ধ আমার জীবনকে এমন ভাবে স্পর্শ করেছিল যে কতকগুলো ঘটনায় কথা আবার না বলে পারা যায় না। তাই আবার এখানে তার কথা বলছি।

যুদ্ধ আরম্ভের সময় সিঙ্গাপুর থেকে পায়ল্‌বার নামে একটা জায়গায় আমি থাকতাম। আমার পরিবারের লোকেরা ছাড়াও আমার কিছু বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পরিবারেরাও আমার সঙ্গে থাকতো। আমরা আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য যতটা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নিই। বেশ কয়েকদিনের খাবারদাবার জোগাড় করে রাখি। বোমার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শেল্‌টার তৈরী করেছিলাম। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সরকারী ওষুধপত্র সব জোগাড় করে রেখেছিলাম। আমাদের সঙ্গে দু'তিনজন ডাক্তারও ছিল। কবে যে জাপানীরা সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে সেই ভয়ে ভীষণ আতঙ্কে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম।

1942 সালের 8ই ফেব্রুয়ারী আমার বাড়ীর সামনে একটা গোলা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর পাঁচ মিনিট পরে আরো একটা গোলা ফাটলো। জাপানীরা আক্রমণ আরম্ভ করেছে। কোন্ রাস্তা দিয়ে যে তারা সিঙ্গাপুর পৌঁচেছে তা আমরা জানতে পারি নি। আবার দুটো তিনটে গোলা পর পর ফাটলো। আমাদের এখন কি করা উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করলাম। এখানে এখন থাকাটা বিপজ্জনক বুঝে আমরা শহরে যাবো ঠিক করলাম। শহরে একটা বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। চার পাঁচদিন এমনি ভাবে কেটে গেল। জাপানীরা এখানেও বোমা ফেলতে শুরু করলো। শুনতে পেলাম তারা নাকি শহরটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে যাবে। লোকেরা যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। আমরা আবার আমাদের পুরোনো জায়গায় ফিরে যাওয়া ঠিক করে পায়ল্‌বারে ফিরে এলাম।

আমরা যখন আমাদের পুরোনো বাড়ীতে এসেছি তখন তিনটে বেজে গেছে। বোমা আর ট্যাঙ্কের শব্দ মাঝে মাঝে শুনলেও আমরা খিদেতে অবশ হয়ে গিয়েছিলাম বলে অন্ততঃ একটু চা খেয়ে যাহোক কিছু করা যাবে বলে ঠিক করলাম। তার জন্যে আমরা বাইরে বেরিয়েছি আর তখনি একটা গোলা এসে রান্নাঘরের ছাদটা ফাটিয়ে দিল।

আমরা রক্ষা পাবার জন্যে ছুটে গিয়ে শেলটারে আশ্রয় নিলাম। সেখানো পৌছোনোর আগেই আর একটা গোলা এসে রান্নাঘরের দেয়ালটা ভেঙে চুরমার করে দিল। আমরা রক্ষা পাবার জন্যে ছুটে গিয়ে শেলটারে আশ্রয় নিলাম। সেখানে পৌছোনোর আগেই আর একটা গোলা এসে রান্নাঘরের দেয়ালটা ভেঙে চুরমার করে দিল। চারিদিক থেকে লোকের চীৎকার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কারোরই বাইরে বেরোবার সাহস নেই। গোলা একটার পর একটা ফেটে চলেছে। বাড়ীর এক একটা অংশ ভেঙে পড়তে লাগলো। আশে পাশের কিছু বাড়ী আগুনে জ্বলতে লাগলো। লোকেরা আর্তস্বরে ঈশ্বরকে ডাকছে। এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা নরকের মত হয়ে গেল।

এক একটা গোলা ফাটার পর আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিলাম কেউ আহত হয়েছে কি না। যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে নড়ার সাহস আমাদের ছিল না। এমনি ভাবেই কালরাত্রির অবসান হলো।

সকাল হ'লে চারিদিকের যে দৃশ্য দেখলাম তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এ বাড়ীতে আর থাকা সম্ভব নয়। অন্য বাড়ীর সন্ধানেও যাওয়া সম্ভব নয়। আর ঠিক তখনই আমরা শুনলাম যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এ খবর শুনে আমরা যে কি আশ্বস্তই না হলাম। 1942 সালের 16ই ফেব্রুয়ারী সূর্য ওঠার সঙ্গে জাপানীদের সূর্য পতাকা সিঙ্গাপুরের 'কাথে' বাড়ীটির ওপর পত পত্ করে উড়ছে দেখতে পেলাম।

দু'দিন পরে একজন জাপানী মিলিটারী অফিসার আমার বাড়ীতে এল। তার বড় অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার জন্য যেন তার পরের দিন আমি প্রস্তুত থাকি একথা সে আমায় জানালো। পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে এসে এই অফিসারটি আমাকে নিয়ে গেলো।

রাস্তায় যে দৃশ্য দেখলাম তা ভোলার নয়। হাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জাপানী সৈন্য আমাদের গাড়ী পরীক্ষা করে আমাদের সঙ্গে জাপানী অফিসারটিকে দেখে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী একটা বিরাট বাংলোর সামনে থামলো। আমাকে মেজর ফুজিওয়ারার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।

শান্ত বদন, কথাবার্তায় চটপটে মেজর ফুজিওয়ারার বয়স বোধ হয় চল্লিশ বছর হবে। এক একটা জায়গা অধিকার করে সেখানকার ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগ' গঠন করেছিলেন। এই কাজে কিছু জাপানী আর ভারতীয়েরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ফুজিওয়ারা ইংরিজী জানতেন না। একজন দোভাষীর সাহায্যে আমরা প্রায় দু'ঘণ্টা কথা বল্লাম। তিনি বল্লেন, আমি শুনে

গেলাম। ইংরেজরা ভারত শাসন করছে বলে এশিয়াবাসী হিসেবে তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করছেন। ভারতবর্ষকে বিদেশীদের শাসন থেকে মুক্ত করা তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। তার সুযোগ এখন এসেছে। ভারতবাসীদের তার জন্য এখন সংগঠিত হওয়া উচিত। খুব শীঘ্র 'ইণ্ডিয়ান্ ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগে'র একটা শাখা এখানে খোলার জন্য তিনি আমাকে বল্লেন। সম্ভাষণের পর আমাকে আবার গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এমনিভাবে পরপর তিনদিন মেজর ফুজিওয়ারা আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

দু' সপ্তাহ পরে আমার বাড়ীতে একটা সভা হ'ল। সেদিনই 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগে'র একটা শাখা স্থাপন করা হ'ল। সিঙ্গাপুরের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ গুহকে সভাপতি এবং আমাকে সহ-সভাপতি করা হল। মিঃ গুহ ছিলেন বাঙালী এবং বহুদিন সিঙ্গাপুরে থেকে নাম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই লীগ গঠন করা এবং তার ভারবাহীদের বেছে নেবার ব্যাপারে পেছন থেকে জাপানীদের ইচ্ছা কাজ করেছিল।

জাপানীদের সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন তখনকার পরিস্থিতিতে যেন শাপে বর হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর কিছু দিন অবধি লোকেদের মিলিটারীর অত্যাচার খুবই সহ্য করতে হ'য়েছিল। মিলিটারীর ব্যবহার ছিল বন্য পশুর মত। বাড়ীর মধ্যে যখন খুশী ঢুকে জিনিষপত্র খুশী মতো নিয়ে যেত, লোকদের মারধোর করত, মেয়েদের অপমান করতো। লোকে অত্যন্ত ভীত হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। এই ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য মেজর ফুজিওয়ারা আমার বাড়ীর সামনে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিতে বলেছিলেন। সেই নোটিশ দেখে সৈন্যরা বাড়ীতে ঢুকতো না। এতে শুধু আমাদের নয়, আমাদের কিছু বন্ধুবান্ধবদেরও খুব উপকার হয়েছিল। এমনি ভাবে দু' সপ্তাহ কাটলো।

মার্চ মাসের প্রথমে একদিন মেজর ফুজিওয়ারা আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে টোকিও যেতে বল্লেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভ করার বিষয়ে টোকিওতে ভারতীয়দের একটা সভার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাতে আমি এবং আরো কয়েকজন ভারতীয় যেন যোগ দিই। আমার যাবার খুবই আগ্রহ হ'ল। 15ই মার্চ আমি জাপানে রওনা হলাম।

এই বিমানে 28 জন যাত্রীর মধ্যে তিনজন ছিল জাপানী। ফুজিওয়ারা ছাড়া কর্ণেল ইভাগুরু ও আর একজন জাপানী। মেজর ফুজিওয়ারার বদলে নূতন লিয়াসন অফিসার হ'য়েছিলেন এই ইভাগুরু। আমার সঙ্গে আর যে চারজন ভারতীয় ছিলেন তারা হলেন মোহন সিং, কর্ণেল গিল, এন. রাঘবন আর এস. সি. গুহ। মোহন সিং বৃটিশের সৈন্য বিভাগে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। জাপানীদের সাহায্যে গঠিত ভারতীয় জাতীয় সৈন্যের জেনারেল। মোহন সিং খুবই ভদ্রলোক।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার সময় থেকেই আমরা বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম। এখনও সে বন্ধুত্ব ভেঙে যায়নি।

কর্ণেল গিলের পদ বৃটিশ সৈন্য বিভাগে মোহন সিং এর চেয়ে উঁচু হলেও ভারতীয় জাতীয় সৈন্য বিভাগে তিনি মোহন সিং-এর নীচে ছিলেন। কর্ণেল গিলের উপদেশ এবং এবং সাহায্য মোহন সিং-এর খুবই কাজে লেগেছিল। কর্ণেল গিল আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়ে কয়েকটি দেশে কাজ করে এখন অবসর গ্রহণ করেছেন।

এন. রাঘবন পেনাঙে ব্যারিস্টার ছিলেন। মালয়ে ভারতবাসীদের সব ব্যাপারে তিনি ভাগ নিতেন। তিনিও কয়েকটি রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত হ'য়ে কাজ করে এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ ব্যক্তি সিঙ্গাপুরের ব্যারিস্টার মিঃ গুহ। এঁর কথা আগেই বলেছি।

পথে আমরা কয়েক জায়গায় থেমে পঞ্চম দিনে টোকিও পৌছোই। আরো কয়েকজন ভারতীয়দের নিয়ে আমাদের আগে রওনা হওয়া বিমানটি জাপানের এক পাহাড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যায়। সে কথা জাপানে পৌছোনোর দু'দিন পরে জানতে পারলাম। তাঁরাও এই সভায় যোগ দেবার জন্য আসছিলেন। নীলকণ্ঠ আয়্যার, ক্যাপ্টেন আক্রম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী এবং প্রীতম সিং এই চারজন ভারতীয় এই দুর্ঘটনায় মারা যায়। এঁদের মধ্যে নীলকণ্ঠ আয়্যারের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তিনি মালয়ে অনেকদিন ধরে ভারতীয়দের ব্যাপারে খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। যখন বিশ্রাম নিয়ে দেশে ফেরার কথা ভাবছিলেন তখনই যুদ্ধ শুরু হলো। 'ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগ' তৈরী হলে তাতে তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

টোকিওতে রওনা হবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। সেদিন তিনি আমার বাড়ীতেই রইলেন। রাত 8টার সময় জাপানীরা এসে জানালো যে পরের দিন একটি বিমান টোকিও যাচ্ছে। এতে কয়েকজন যেতে পারেন। কিন্তু সেদিন আমার যাবার অসুবিধে ছিল। 'তাহ'লে আমিই কাল যাব'— এমনি ভাবে আয়্যার আমার বদলে সেই বিমানে গেলেন।

টোকিতে আমাদের কাজ আরম্ভ হবার সময় এই ভয়ানক দুর্ঘটনা শুনে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মৃত আত্মার শান্তির জন্য যে প্রার্থনা সভা হ'য়েছিল তাতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো, টোকিওর বড় বড় নাগরিক ও অফিসারেরা যোগ দিয়েছিলেন।

চৌত্রিশ

জাপানে এবং ব্যাঙ্ককে

জাপানের তিনটি দৃশ্য নাকি জাপান সন্দর্শকদের ভালো লাগে। এক: ওখানকার ফ়ুজিয়ামা পাহাড়। দুই: জাপানের গায়েশা মেয়েরা, তিন: অতি সুন্দর ফুলে শোভিত চেরী গাছগুলি। বিমান থেকে ফ়ুজিয়ামার অপূর্ব সৌন্দর্য দূর থেকে দেখে ধন্য হবার সুযোগ আমার মিলেছিল। একবার দেখলে এ দৃশ্য আর কখনো ভোলা যায় না। গায়েশা মেয়েরা ছাড়া জাপানের আমোদ প্রমোদ কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। সুন্দরী মেয়েরা যখন মনোহর সজ্জায় সেজে তাদের আকর্ষণীয় ব্যবহারে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে, তাদের মনোরঞ্জন করে, তখন তা সন্দর্শকদের ভালো লাগবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তখন জাপানের মেয়েরা পুরুষদের সব কিছু আমোদ প্রমোদে ভাগ নিত। এই গায়েশা মেয়েদের অতিথিদের তৃপ্তি দেবার জন্য বিশেষ করে ট্রেনিং দেওয়া হতো।

চেরী গাছগুলি যখন ফুলে ফুলে ভরে যায় তখন সে দৃশ্য দেখার মত। বসন্তকালে দু' তিন সপ্তাহ মাত্র এই দৃশ্য দেখা যায়। এই সময়েই আমরা জাপানে এসেছিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় একের পর এক চেরী গাছগুলোর ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

জাপানে পৌছোনোর দু'তিন দিন পরে জাপানীরা আমাদের একটা ভোজ দিয়েছিল। প্রায় 600 জাপানী এই ভোজে যোগ দিয়েছিল। 'ভারতবর্ষকে বৃটিশের শাসন থেকে মুক্ত করার জন্যে যে কোনো ত্যাগের জন্য জাপান প্রস্তুত'—বলে কয়েকজন জাপানী বক্তৃতা করলো। এর পরেও আমরা কয়েকটি ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। জাপানের বিশেষ বিশেষ জায়গা, প্রতিষ্ঠান, শিল্প, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখার প্রচুর সুযোগ আমাদের মিলেছিল। জাপানীদের দেশপ্রেম, তাদের সংস্কৃতি, নিয়মানুবর্ত্তিতা, শ্রমশীলতা যে কোনো লোকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। জাপানে আমাদের থাকাটা খুবই সুখপ্রদ হয়েছিল, তবে জাপানে আমরা আনন্দ করতে বা সেখানকার দৃশ্য দেখতে যাই নি। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমরা কি করেছিলাম সেই কথাই এখানে বলব।

টোকিওতে পৌছোনোর দু'দিন পরে মালয়, হংকং, সাংহাই, জাপান ইত্যাদি জায়গাগুলি থেকে আগত ভারতীয়দের নিয়ে সভা হলো। এই সম্মেলনে বিশজন লোক

মাত্র যোগ দিয়েছিল। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য জাপান যে কোনো সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কি রকম সাহায্যের দরকার, কেমন করে এর কাজ আরম্ভ করতে হবে ইত্যাদি আলোচনা করে ঠিক করতে হবে বলে ইভাগুরু আমাদের বল্লেন।

অনেকদিন ধরে জাপানে বাস করতেন রাসবিহারী বোস। তিনি এই সভার সভাপতি ছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলার অপরাধে তাঁকে বন্দী করা হবে শুনে রাসবিহারী ভারত ছেড়ে জাপানে পালিয়ে আসেন। তারপর থেকে তিনি জাপানেই রয়ে গিয়েছিলেন। বহুদিন জাপানে বাস করার ফলে তাঁর আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা, রীতিনীতি সব জাপানীদের মত হয়ে গিয়েছিল। বোস বড় ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে কিছু করার মনের জোর তাঁর ছিল না। সে যাই হোক, ইণ্ডিয়ার ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের কাজকর্ম তাঁর নেতৃত্বেই চালানোর সিদ্ধান্ত জাপান নিয়েছিল।

লীগের প্রেসিডেন্টকে উপদেশ দেবার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য একটা কমিটি গঠন করে লীগকে যুদ্ধের আবশ্যক মত ব্যবহার করা জাপানীদের উদ্দেশ্য ছিল। জাপানীদের এই উদ্দেশ্য কয়েকজন জানতে পারলেও তাতে খোলাখুলি সমালোচনা করার সুযোগ আমরা পাই নি। তাই এখন এটা মেনেই জাপানীদের মতানুসারে কাজ করে যাওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চালাবার আগে তার কাজকর্মের ব্যাপারে ঠিক করবার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের প্রতিনিধিদের একটা বড় কন্‌ফারেন্স ডেকে তার থেকে একটা কার্যকরী সমিতি গঠন করে তার হাতে এই আন্দোলনের ভার দেওয়া উচিত বলে আমরা কয়েকজন অভিমত প্রকাশ করলাম। তার জন্যে রেঙ্গুনে বা ব্যাঙ্ককে একটা সম্মেলন ডাকলে ভালো হয় ব'লে বললে এইরকম করা হবে বলে টোকিও কনফারেন্স ঠিক করলো।

টোকিও থেকে ফেরার আগে আমরা জাপানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে দেখা করলাম। তোজো তখন ক্ষমতা আর প্রভাবের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আমরা তাঁর সঙ্গে প্রায় 45 মিনিট কথা বলেছিলাম। তখন কে ভেবেছিল যে নিকট ভবিষ্যতে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠবেন।

আমরা বিমানে করে জাপান থেকে ফেরার সময় আমাদের সেই হতভাগ্য বন্ধুদের কথা মনে পড়ছিল। এমনিভাবে সিঙ্গাপুর থেকে বেরিয়ে আবার একমাস পরে সেখানেই ফিরে এলাম।

এর দু'মাস পরে ব্যাঙ্ককে কনফারেন্স হয়। এতদিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম

কিছুই হয় নি। লীগের কতকগুলি শাখা স্থাপন করে তাদের উদ্দেশ্যের কথা ভারতীয়দের বলা এইটুকু মাত্র করেছিলাম।

এই সময় মালয়ে চীনাদের ওপর জাপানীরা খুব অত্যাচার করেছিল। হাজার হাজার চীনাদের কেটে ফেলেছিল। গুলী করে হত্যা করেছিল। এবং তুলনায় ভারতবাসীদের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। জাপানী সৈন্যরা যে নিষ্ঠুর কাজ করছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস কারো ছিল না, এক মাত্র অসহায় ভাবে দেখা ছাড়া।

1942 সালের 15ই জুন ব্যাঙ্ককে সম্মেলন আরম্ভ হ'ল। এই সম্মেলনে যোগ দিতে মালয় থেকে পঞ্চাশ জনেরও বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যের প্রতিনিধিও ছিল। আমরা একটা বিশেষ ট্রেনে করে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্ককে গিয়েছিলাম।

যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ আমরা সারা পথে দেখতে দেখতে যাই। সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জাপান, মাঞ্চুকো, হংকং, বোর্ণিও, জাভা, মালয়, সান্‌হে, ম্যানিলা, ইন্দোচীন প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। থাইল্যাণ্ড থেকে অনেক ভারতীয়েরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন।

রাসবিহারী বোস এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে বলা হ'ল যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনা ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের লক্ষ্য। তার জন্যে যুদ্ধে জাপানের কাছে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্য এবং সিভিলিয়ানদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি গঠন করা হবে বলে ঠিক হলো। এই সব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য কি কি করতে হবে তাই নিয়েও সম্মেলন আলোচনা করল। ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের সব ক্ষমতা পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত একটি "কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশান"-এর হাতে দেওয়া হয়। এই কাউন্সিলে একজন সভাপতি, দু'জন সামরিক আর দু'জন বেসামরিক সভ্য থাকবে বলে ঠিক করা হয়। এই সভ্যদেরও এই সম্মেলনে নির্বাচিত করা হয়। আমি আর মিঃ রাঘবন ছিলাম বেসামরিক সভ্য, জেনারেল মোহন সিং আর কর্ণেল গিল ছিলেন সামরিক সভ্য, রাসবিহারী বোস ছিলেন সভাপতি।

কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশানের প্রথম মিটিঙে আমরা আমাদের কাজ ভাগ করে নিলাম। আমাকে প্রচার বিভাগের মন্ত্রী করা হ'ল। রাঘবন্ নিলেন ইণ্ডিয়ান ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের শাখাগুলির দায়িত্ব। সেনা বিভাগের দায়িত্ব নিলেন মোহন সিং আর গিল, আর্থিক দপ্তরের ভার ন্যস্ত হ'লো সভাপতির ওপর। এমনি ভাবে কাজের বণ্টন করে আমরা কাজ শুরু করলাম।

লীগের হেডকোয়ার্টার্স ব্যাঙ্ককে করবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এতে কতকগুলো

অসুবিধা ছিল। আমার পরিবারকে সিঙ্গাপুরে রেখে ব্যাঙ্ককে বাস করা আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ন্যাশানাল আর্মির হেড-কোয়ার্টাস সিঙ্গাপুরে করা হোক বলে মোহন সিং মত দিলেন। কনফারেন্স শেষ হবার এক সপ্তাহ পরে আমি সিঙ্গাপুরে ফিরে গেলাম।

পঁয়ত্রিশ

মন্ত্রীর পদে

আমাকে কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশানের একজন সদস্য করা হয়েছে এ খবর ভারতীয়েরা জানতে পেরেছিলেন। আমি যেদিন রাতে ব্যাঙ্কক থেকে ফিরে এলাম তার পরের দিন বহু বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন জাপানী সামরিক অফিসারেরাও ছিলো। এই অফিসারেরা আমাকে অভিনন্দন জানালো। তাদের হাত জোড় করে নমস্কার করা এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের এই আগ্রহ দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগছিল। তাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল যেন আমি একটা বিরাট কাজ পেয়েছি।

দু'দিন পরে জাপানীদের বেতার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারীরা এবং আমি ইনডিপেন্ডেন্স লীগের বেতার প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করে কতকগুলি প্রোগ্রাম ঠিক করলাম। টোকিও থেকে রেঙ্গুন অবধি জাপানীদের অধীনে সমস্ত রেডিও-ষ্টেশনগুলিতে লীগের বেতার প্রচার করার অধিকার আমার রইল। কিন্তু তা সত্বেও জাপানীরা আমার অজান্তে এর অনেক বিপরীত কাজ করেছে। প্রচার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ করা, তাদের বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার আমার ছিল, কিন্তু এতেও তারা বেশ কয়েকবার হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের খুশীমতো কাজ করেছে। এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে তারা কিছু না কিছু একটা অজুহাত দেখাতো। ন্যাশানাল আর্মির বেলায়ও তারা জেনারেল মোহন সিং-এর অজান্তে অনেক কিছুই করেছে। এই নিয়ে মোহন সিং আমার কাছে অভিযোগও করেছিলেন।

1942 সালের 12ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের লক্ষ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য একটা বিরাট জনসভা সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে আয়োজিত করা হয়েছিল। এই দিন ভারতীয়দের গৃহগুলিতে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলিতে দেশীয় পতাকা তোলার নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল। সভায় ইংরাজী, তামিল আর হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া হবে ঠিক হলো এবং স্বাধীনতা লীগের অফিস থেকে একটা বিরাট শোভাযাত্রা করে সভায় যাওয়া হবে তাও ঠিক হলো। এই সভার সব কাজ ভারতে বেতার মারফৎ প্রচার করার ব্যবস্থা করা হলো। প্রচার বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে এ সবের দায়িত্ব আমিই নিয়েছিলাম। সেদিন সকাল দশটায় বাড়ীতে বসে কি একটা

কাজ করছিলাম, হঠাৎ খবর পেলাম যে আরব ষ্ট্রীটে ভারতীয়দের মধ্যে মারপিট শুরু হয়েছে, বহু লোক আহত হয়েছে। আমাকে শীঘ্র সেখানে যেতে বলা হ'ল। আমি তক্ষুনি রওনা হলাম। দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হ'য়ে দেখি রাস্তা সব জনশূন্য। দোকানপাট বন্ধ। একটা দোকানের ওপর থেকে কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমাকে উপরে আসতে বল্লেন। সেখানে গিয়ে কি ব্যাপার একটু আগে ঘটে গেছে আমি তা জানতে পারলাম। জাতীয় পতাকার পরিবর্তে কেউ কেউ লীগের পতাকা তুলতে চেয়েছিল বলে গোলমাল আরম্ভ হয়। অনেকে আহত হয়েছে, অনেককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমি এদের আশ্বস্ত করে নীচে নেমে এলাম। এর পরও তাদের যেন কি বলার ছিল। আমি এদের কথা শোনার জন্য ওপর দিকে তাকিয়েছি হঠাৎ আমার হাঁটুতে কে যেন একটা লাথি মারলো। পেছন ফিরে দেখি একটা জাপানী সৈন্য। "কি করছ তুমি?"—আমি ইংরিজীতে জিজ্ঞেস করতে সে আমার গালে একটা চড় মারলো। আমার চশমা ছিটকে পড়ে গেল। আমার ছেলে উন্নি বল্ল,—"বাবা তুমি ওকে কিছু বলতে যেও না, ও তোমাকে জানে না। চল আমরা বাড়ী যাই।" আমি গাড়ীতে বসলে পর আর একজন জাপানী সৈন্য সেখানে এসে তার হাতের লাঠি দিয়ে উন্নির মাথায় আঘাত করলো। উন্নির মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। সৈন্যেরা আমাকে আর আমার ছেলেকে গাড়ী থেকে বার করে একটা মিলিটারী ট্রাকে উঠিয়ে সামরিক অফিসে নিয়ে গেল। এ ঘটনা অনেকে অসহায় হ'য়ে দেখছিল।

সামরিক অফিসে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সমস্ত ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ালো। কয়েকজন সামরিক উর্ধ্বতন কর্মচারী ইতিমধ্যে ব্যাপারটা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে উপস্থিত হলো। "খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে" বলে তারা মাথা নীচু করে হাত জোড় করলো। আমাকে দাঙ্গাকারীদের একজন বলে ঐ জাপানী সৈনিকটি মনে করে। এখন এই সামরিক অফিসারেরা আমাকে এরকম সম্মান দেখাচ্ছে দেখে সে খুবই ভয় পেয়ে গেল। এই অফিসারেরা বেশ কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আমার গাড়ীটাকেও তারা নিয়ে এল। তখন বেলা দু'টো। বাড়ী গিয়ে খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে শোভাযাত্রায় ভাগ নেবার জন্য বেরোলাম। হাঁটুতে বুটের লাথি মারার দরুণ বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সেদিন এক বিরাট শোভাযাত্রা আমরা সংগঠন করেছিলাম। দশ হাজার সৈন্য আর পঞ্চাশ হাজার নাগরিক এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই জনসভায় প্রথমে আমি ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। ইংরাজীর পর তামিলে বক্তৃতা হবে এই রকম ঠিক ছিল, তারপর জেনারেল মোহন সিং-এর হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা। সৈন্যদের সন্ধ্যের আগে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হবে বলে এই প্রোগ্রামের একটু

রদবদল করার জন্য মোহন সিং বল্লেন। সেই মতো তাঁর বক্তৃতা আগে হলো। মোহন সিং যখন বক্তৃতা শেষ করলেন তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তামিল বক্তৃতা আর হবে না। এইরকম একটা গুজব ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এ সভায় হাজার হাজার তামিল ভাষাভাষী ছিল। তারা এ খবর শুনে খুব রেগে গেল। জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হলো, মাইক বন্ধ হ'ল, আলো নিভে গেল। তামিলে বক্তৃতা আর হবে না এটা আমি নির্দেশ দিয়েছি একথা তাদের কেউ কেউ বললো। ঠিক কি ব্যাপার তা বোঝার ধৈর্য কারোরই ছিল না। ক্ষুব্ধ জনতা আমাকে ভয় দেখাতে লাগলো।

আমি আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্লাটফর্মে ছিলাম, জনতা থেকে কয়েকজনকে এদিকে আসতে দেখে আমার বন্ধুরা আমাকে ঘিরে ধরলো, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও কে একজন আমার চশমাটা কেড়ে নিল। চশমা যাওয়াতে আমার চারপাশে যে কি হচ্ছিল তার কোন হদিশই পাচ্ছিলাম না। বিরাট ময়দানের চারপাশ থেকে ক্ষুব্ধ জনতার গুঞ্জন ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠছিল। এখানে বসে থাকাটা আর নিরাপদ নয় বলে আমার এক বন্ধু আমাকে এই অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু আমি তাতে প্রস্তুত ছিলাম না। সভা হঠাৎ শেষ হ'য়ে গেছে, ততক্ষণে সমস্ত ময়দানে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু হ'য়েছে। এই সময় কয়েকজন জাপানী সামরিক অফিসার তাদের গাড়ীতে করে আমাকে প্রায় রাত দশটার সময় বাড়ী পৌছে দিল। দাঙ্গাকারীরা বাড়ী আক্রমণ করতে পারে এই ভয়ে জাপানী সৈন্যরা সে রাত আমার বাড়ী পাহারা দিল।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার এর আগে এবং পরেও হয়েছে। যারাই রাজনীতি করে তাদেরই এরকম অভিজ্ঞতা হয়। হাঙ্গামাকারীদের চেয়ে তামিল বক্তৃতায় আমারই বেশী আগ্রহ ছিল। বক্তৃতা হবে না একথা আমরা বলি নি, তবু ক্ষুব্ধ জনতা কিছুই জানতে চায় নি। তাদের আক্রোশ বাঁধ ভাঙা জলপ্রবাহের মতো আমার বিরুদ্ধে বয়ে গিয়েছিল। ওপরে বর্ণিত এই দু'টি ঘটনা একদিনেই ঘটেছিল। তাই 1942 সালের 12ই আগস্ট আমি কেমন ভাবে ভুলবো।

স্বাধীনতা লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ক্রমেই মুশকিল হ'য়ে পড়ছিল। জাপানীদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছিল। লীগের কাজকর্ম সব কিছু জাপানীদের উপদেশ আর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ছিল। তাই লীগ যে জাপানীদের অধীনে কাজ করছে তা কেন স্বীকার করা হবে না?— একথা যখন একজন জাপানী সামরিক অফিসার বল্ল, তখন তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি বুঝতে পারলাম।

এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি তা ঠিক করার জন্য কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশানের সদস্যরা আলোচনা করতে লাগলেন। এই আলোচনার পর লীগের কাজকর্মের সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার জানিয়ে জাপানীদের একটা চিঠি লেখা আমরা ঠিক করলাম। ব্যাঙ্কক কনফারেন্স শেষ হবার পরই তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রস্তাব জেনারেল তোজোর দৃষ্টিতে আনা এবং এ সম্বন্ধে জাপানের মনোভাব কি তা ব্যাখ্যা করা দরকার বলে আমরা দাবী করেছিলাম। চার মাস পরেও এই চিঠির উত্তর আমরা পাইনি। সেই চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি না পেলে লীগের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব এ কথাও আমরা এই চিঠিতে জানিয়েছিলাম। অবশ্য এই ব্যাপারে কাউন্সিলের সকল সদস্যেরা যে একমত ছিলেন তা নয়। একজনের মতে জাপানীদের ক্রুদ্ধ করে তোলা খুবই বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও এইরকম চিঠি না লিখলে তা' আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে বলে বেশীর ভাগ সদস্য মত দিয়েছিলেন। এই চিঠি পাবার ছ'দিন পরে কর্ণেল ইভাগুরু আমাদের কথাবার্ত্তা বলার জন্য ডাকলেন।

কর্ণেল ইভাগুরু এবং আরো পাঁচজন জাপানী সামরিক অফিসার এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। আমরা পাঁচজন আর লীগের প্রতিনিধি বি. কে. দাস. এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের মনোভাবে ইভাগুরু যে খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। কেন আমরা এরকম একটা চিঠি লিখেছি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশানের মনোভাব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বল্লাম। ইভাগুরু ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে কথা বলছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে এতটুকুও দমে যাই নি।

ছ'দিন পরে কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশান আবার মিলিত হলো। প্রেসিডেণ্ট রাসবিহারী বোস কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য বল্লেও অন্যান্য সদস্যেরা তাতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যাপারে কিছু একটা ফয়শালা করার অন্য আরো একটা কারণ ছিল। কর্ণেল গিলকে জাপানীরা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাই এই কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

1942 সালের 8ই ডিসেম্বর আমি এবং মোহন সিং কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ ক'রে প্রেসিডেণ্টকে একটা চিঠি দিলাম।

এমনি ভাবে ছ'মাস প্রচার বিভাগের মন্ত্রী থাকার পর ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে আবার আমার আগেকার কাজে ফিরে গেলাম।

ছত্রিশ

জাপানীদের বন্দী

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর জাপানীরা আমাকে সন্দেহ করতে লাগলো। আমার বাড়ীর ওপর তারা নজর রাখতে শুরু করলো। আমার নিকট-বন্ধুরা পর্যন্ত আমার কাছে আসতে ভয় পেল। সান্ধ্য ভ্রমণ ছাড়া বাড়ীর বাইরে বেরোতাম না। অফিস শুধু নামে মাত্র খোলা ছিল। খুব কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটানো অনেক পরিবার তখন সিঙ্গাপুরে ছিল। একবার ভাত বা ফেনাভাত, কোন কোনদিন টোপিওকা খেয়ে লোকের দিন কাটছিল। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেওয়া যাক্। লোকে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। স্ত্রী আর শিশুদের নিয়ে তখন বাস করছিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে কি হতে পারে তা না জানতে পেরে তখন যে আমি কি করে কাটিয়েছি তা এখানে বলা যায় না। জাপানী পুলিশ ইতিমধ্যে দু'একবার আমাকে তাদের অফিসে নিয়ে গিয়ে তিন চার ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করেছে। আমার উত্তর লিখে রেখে তারপর আমাকে বাড়ীতে রেখে এসেছে। এমনি ভাবে কয়েক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে নতুন নেতৃত্বে স্বাধীনতা লীগের কাজকর্ম আবার আরম্ভ হলো। 1943 সালের 2রা জুলাই সুভাষচন্দ্র বোস টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে এলেন। লীগের নেতৃত্ব তিনি হাতে নিলেন্। ভারতবাসীদের মধ্যে আবার নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণা জাগল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল সুভাষ বোসের লক্ষ্য। তা অর্জন করার জন্য যে কোন পথ অবলম্বন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। শুধু মাত্র সিঙ্গাপুর বা মালয়ে নয়, বর্মা, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি জায়গায়ও ঘুরে ঘুরে সুভাষ বোস জনগণের মধ্যে উৎসাহ জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আই. এন. এ.-র মধ্যে নতুন আশার আলো জ্বাললেন। বর্মার পথে তাঁর সৈন্য নিয়ে সব প্রস্তুতি শুরু করলেন। 1943 সালের 2রা অক্টোবর তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ হলেন। যে সব সৈন্যরা লীগ ছেড়ে দিয়েছিল তারা আবার সব ফিরে এল। 1944 সালের প্রথমে আজাদ হিন্দ সরকারের রাজধানী সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হ'ল। সৈন্যদেরও বর্মায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

স্বাধীনতা লীগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হ'লেও আমার সঙ্গে কাজ করা কিছু বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে গল্প করার সময় আমার মতামত খোলাখুলি না বলাই উচিত ছিল ব'লে পরে আমি বুঝলাম।

জাপানীদের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করা হলে তা ভারতের সত্যিকারের স্বাধীনতা হবে না এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল। আমি এই সব কথা আমার বন্ধুদের বলেছিলাম। আমার এই কথাবার্ত্তা যে পরে আমাকে বিপদে ফেলবে তা আমি তখন বুঝতে পারি নি। যত সাবধানই হই না কেন, আমাদের ভালোমন্দ বোঝার অবস্থা মাঝে মাঝে আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই হ'য়েছিল এই সময়। আমার বন্ধুদের কেউ কেউ আমার মতামতের কথা জাপানীদের জানিয়ে দিল। যা আমি বলিনি তাও তারা জানালো।

আমার কিছু বন্ধুবান্ধব অবশ্য আন্তরিক ভাষায় আমায় বলেছিলেন যে আমার মতামত ঠিক হ'লেও এটার প্রচার হলে আমার পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। তাঁরা আরো বল্লেন যে নামে মাত্র হ'লেও ইনডিপেন্‌ডেন্স লীগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা উচিত। এর জন্য তাঁরা অনুরোধ করলেন। কিন্তু এরকমটি করতে আমার বিবেক সায় দেয় নি। জাপানীরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হ'লে কি সব ভয়াবহ ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে তার একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতো। কাজেই এই ব্যাপারে জাপানীদের সাহায্য করা অক্ষমনীয় অপরাধ বলে আমার মনে হয়েছিল, আর আমার এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করা আমার একেবারেই সম্ভব ছিল না। এমন ভাবে চিন্তা করলে ঠিক কি বিপদ যে ঘটতে পারে তা অবশ্য আমার জানা ছিল না। তবে আমার মতো কাজ করতে পেরেছিলাম বলে সেই বিষম সঙ্কটের সময় মনের শান্তি আমি হারাই নি। ঠিকমতো কি করবো না ক'রবো সে সম্বন্ধে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছি। অনেক সময় মনের দ্বন্দ্বে অস্থিরও হয়েছি। কেমন ভাবে এই সংকট পার হবো তা ভেবে পাই নি।

জীবন থেকে আমরা কি পেতে চাই সে সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলোর খুব শান্ত মনেই সম্মুখীন হওয়া যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস শুধু নামে বিশ্বাস হ'লে চলবে না। এই বিশ্বাস আমাদের জীবনে ক্রমে ক্রমে একটা পরিবর্ত্তন আনবে। এই রকমটি হলে বিভ্রান্ত না হয়ে অচঞ্চলচিত্তে জীবনের সব সমস্যার, সব ঘটনার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। অন্যদের যে বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয় আমাদেরও তা হ'তে পারে। অন্যরা যে দুঃখ সহ্য করে আমাদেরও সইতে হ'তে পারে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন শক্তি এই ধরনের বিপদকে শান্তভাবে সম্মুখীন হতে সাহায্য করে। অসহায় বোধ করলে আমাদের সাহস জুগিয়ে, হতাশার মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে এই শক্তি আমাদের পক্ষে যেন একটা আশীর্বাদের মত হ'য়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ আমাদের কাজকর্মে ভুলত্রুটি

খুঁজে পাবে। কেউ কেউ তার কঠিন সমালোচনা করবে। কেউ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে দ্বিধা বোধ করবে না। এইসব অবস্থায় আমাদের আশ্রয় দেবে জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে কতকগুলি দৃঢ় বিশ্বাস।

বেশ কিছু মহান পুরুষের জীবনী আমাকে এই সব সময়ে অনেক প্রেরণা দিয়েছে। এই সব মহান পুরুষদের কথা, কীর্ত্তির কথা মনে করে তাঁদের বিষয়ে আরো বেশী বিবরণ জানার উৎসাহ আমার এই সময় হ'য়েছিল। এক সময়ে খুব সযত্নে সঞ্চয় করে রাখা টাকা যেমন খুব দরকারের সময় সাহায্য করে, তেমনি সেই একই অবস্থায় পড়লে কারোর কারোর অভিজ্ঞতা সে অবস্থা পার হতে আমাদের সাহায্য করে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই শুনছিলাম যে জাপানীরা আমাকে বন্দী করবে। তার আগে দরকার মতো সমস্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আমার কিছু কিছু বন্ধু আমাকে উপদেশ দিল। জাপানীদের হাতে বন্দী হলে খুব কম লোকই ফিরে আসে, এ কথা সকলের জানা ছিল। আমার ভয় ছিল আমার পরিবারকে নিয়ে। আমার সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটলে তারা যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। এ চিন্তা আমার মনে সবসময়ই লেগে থাকতো। সিঙ্গাপুরে তখন আমার বেশ একটা বিরাট পরিবার ছিল। জাপানীদের হাতে যাতে না পড়ে, এর জন্যে আমার কিছু কাগজপত্র আমি বন্ধুবান্ধবদের কাছে রেখে দিলাম।

1954 সালের 24শে এপ্রিল ভোর চারটের সময় আমার বাড়ীর দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে শুনতে পেলাম। দরজা খুলতেই আট দশ জন জাপানী সামরিক অফিসার ভেতরে ঢুকলো। তারা কি জন্য এসেছে তা বুঝতে পারলাম।

বাড়ীর সকলকে ডেকে আমি তুল্লাম। ছেলেমেয়ে চাকরবাকরকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একজন জাপানী সৈন্য রাইফেল হাতে তাদের পাহারা দিতে লাগলো। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে জাপানীরা বাড়ী খানাতল্লাসী করলো। কিছু কাগজপত্র, বই, ছবি ও আমাকে নিয়ে দু'জন সামরিক অফিসার আর একটা গাড়ী করে প্রায় বেলা ন'টার সময় বেরোলো। আমার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে হঠাৎ আমার ভীষণ ভয় ঢুকলো।

বন্দী করার পর জাপানীরা আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে অনুমতি দেয় না। আমি আমার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিতে পারলাম না। জাপানীরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানতে না পেরে যাত্রা করার সময় অজ্ঞাত একটা আশঙ্কা আমাকে ভীত করে তুলছিল। আমার মেয়ে তাক্‌ম তখন রোগশয্যায় শায়িত ছিল। আমার পরিবারের সব লোকেদের সম্বন্ধে চিন্তা আমি ভোলার চেষ্টা করলাম। এই চেষ্টা পর্যন্ত আমাকে অসহ্য বেদনা দিয়েছিল।

আমাকে একটা অন্ধকার সেলের মধ্যে রেখে দেওয়া হলো। তার আগে একটা সার্ট আর প্যাণ্ট ছাড়া আমার পরনের আর সব পোষাক পরিচ্ছদ জাপানীরা খুলে নিল। আমার চশমাটা পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছিল। চশমা ছাড়া আমি ভাল করে দেখতে পাই না বলেও কোনো লাভ হলো না। আমাকে একটা 12 ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া ঘরে রাখা হ'য়েছিল। ঘরে আলো বাতাস ঢোকার জন্য দেওয়ালে ছ'সাতটি ঘুলঘুলি ছিল। এই ঘরে বসে সকাল সন্ধ্যের তফাৎ করা যায় না। ঘরের মধ্যেই এক জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ছিল। আমি ছাড়া এই ঘরে আটজন লোক ছিল। বসার জন্যে কতকগুলো তক্তা পাতা ছিল। বসে থাকা ছাড়া এ ঘরে চলাফেরার কোনো উপায় ছিল না। বন্দীরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারতো না। বন্দীদের সারাদিন দাবার বড়ের মতো এই তক্তাগুলোয় বসে থাকতে হতো। ছ'তিন ঘণ্টা পরে পরে পাঁচ মিনিটের জন্য উঠে এদিক ওদিক একটু চলাফেরা করার অনুমতি দেওয়া হতো।

মহিলা এবং পুরুষদের একসঙ্গে এক ঘরে রাখা হ'য়েছিল। প্রশ্ন করার অথবা মারধোর করার সময় বাইরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া সর্বক্ষণ সময় এই ঘরের মধ্যে কাটাতে হ'ত। বন্দীদের মধ্যে শ্রমিক, বিরাট ব্যবসায়ী, ছাত্র, অসুস্থ ব্যক্তি সকলেই ছিল।

ঘরটা ঠিক একটা জ্বলন্ত উনুনের মতো গরম ছিল। তার মধ্যে ঢুকেই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হলো। খাবারদাবারও সেই রকম ছিল। সকালবেলায় সাতটার সময় একটা ছোট্ট থালায় ফেনাভাত আর এক টুকরো শুটকি মাছ। মাছের বদলে কখনো আলু বা কাঁচকলা সেদ্ধ। সন্ধ্যে পাঁচটায় আবার এই খাওয়া। দু'তিনদিন পরে পরে ফেনাভাতের জায়গায় ভাত দেওয়া হতো।

প্রায় চারমাস আমি বন্দী হ'য়েছিলাম। কখন যে জাপানীরা কি করবে এই ভয়ে সশঙ্ক হয়ে থাকতাম। আমার সব মানসিক শক্তি আর প্রেরণা নষ্ট হয়ে গেল, আত্মবিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুধু নিজের বাঁচার চিন্তায় দিন রাত কাটিয়ে দিয়ে ঠিক একটা পশুর জীবন তখন যাপন করছিলাম। বন্দী থাকাকালীন যে সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছি, যে সব কাতর আর্তনাদ শুনেছি, যে কষ্ট অনুভব করেছি তা চিরকাল আমার মনে অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। মানুষের নিষ্ঠুরতা যে কতখানি হতে পারে তা এখানে দেখেছিলাম।

রোজ প্রশ্ন করার জন্য সামরিক পুলিশ আমাকে অন্য আর এক জায়গায় নিয়ে যেত। ভারী বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা সেখানে হতো। জাপানীদের হাবভাব, আচারব্যবহার একটা মানুষকে ঠিক যেন বাঘের সামনে মেষশাবকের অবস্থার মত ভীরু করে তুলতো।

জাপানীদের মারধোর সহ্য করতে না পেরে পাশের ঘর থেকে হতভাগ্যদের করুণ আর্তনাদ শুনে মনে যে সে কি বিভীষিকা জাগতো তা বলে বোঝানো যায় না। তখন আমার মন আর দেহ একই ভাবে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। নানা ভাবে নানা ঢঙে পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরে আমাকে প্রশ্ন করা হতো। একদিন আমার উত্তরে সামরিক অফিসারটি সন্তুষ্ট হ'ল না। আমাকে উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। এই লোকটির চীৎকার আর হাত পা ছোঁড়া দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হলাম। এই লোকটি যে ভাবে আমাকে জাপানী ভাষায় গালাগালি দিল ঠিক সেই ভাবে এবং ভাষায় একজন কোরিয়ান আমাকে অনুবাদ করে বল্লে—ভীষণ একটা যুদ্ধ হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছি। তার সঙ্গে আর একটি মাথা যোগ হ'লে কিছু এসে যাবে না। কাল সকাল দশটায় তোর সব কথা শেষ হবে, তোকে ফাঁসি দেওয়া হবে, গুলী করা হবে, নয় তো গলা কেটে ফেলা হবে। এখন এই বন্দীকে তার সেলে নিয়ে যাও। এই অফিসারের চীৎকার থেকে জানতে পারলাম কি ভাবে আমাকে মারা হ'বে। তার কথাগুলো আমার কানে ক্রমাগতঃ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। একটা সিগারেট টিনে ফেনাভাত দিতে এলে পর পাঁচটা বেজেছে জানতে পারলাম। খাওয়ার ইচ্ছা আমার এতটুকু ছিল না! বাড়ীর কথা, ছেলেমেয়ের কথা, ফেলে আসা দিনগুলির কথা আমার মনকে ভারী করে তুললো। চোখ বন্ধ করলেই পরের দিন যা হবে তার একটা ভীষণ ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। ফাঁসির মঞ্চের নীচে হাত-পা বাঁধা চোখ বন্ধ করা অবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। ফাঁসির দড়ি পরাবার জন্য জল্লাদ এগিয়ে আসছে। একটা গর্তের সামনে হাত বাঁধা, মাথা নীচু করে, হাঁটু গেড়ে আমি বসে আছি। আমার মাথা এক কোপে সাবাড় করে দেবার জন্য জাপানীটা তলোয়ার তুলছে। চোখ, হাত বেঁধে আমাকে দেয়ালের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একটু দূর থেকে একজন সৈন্য আমাকে গুলী করে মেরে ফেলার জন্য বন্দুক তুলেছে! দু'একবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম একথা আমার মনে আছে। গার্ড এসে বন্দীদের শুয়ে পড়তে বল্ল। আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। রাত তিনটে বাজার সময় আমি উঠে পড়ে মনকে শাসন করে ইহলোকের সব চিন্তা দূর করে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। ভোর হবার একটু আগে মনে হঠাৎ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলাম। তা'হলেও সকালের ফেনাভাত খেতে পারলাম না। আটটার সময় সেলের দরজা খুললো। আমার শেষ যাত্রার জন্যে আমি বাইরে এলাম।

আমাকে একজন সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অফিসারের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো।

গতকালের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখেছি কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু না ভাবা সত্ত্বেও সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম। লোকটি তখন খোলাখুলি আমাকে বল্ল, "এই উত্তর তুমি কাল দিতে পারতে। তা আজ যদি এই উত্তর না দিতে তাহ'লে দুঘণ্টার মধ্যে তোমার ঘাড়ে আর মাথা থাকত না।" এই চব্বিশ ঘণ্টা আমি যে কি অসহ্য মনোকষ্ট পেয়েছি তা লিখে বোঝাতে পারব না।

—তুমি রেডিও শোনো কেন? জাপানীরা হেরে যাচ্ছে সেটা জানতে? অফিসারটি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

—না যুদ্ধ কেমন ভাবে চলছে শুধু তা জানার জন্যে শুনি।

—সত্যি কথা বল। যদি না বল তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ কি বুঝতে পারছ?

একথা শুনে আমি খুব উত্তেজিত হ'য়ে পড়লাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে লোকটির রাগ আরো বেড়ে গেল।

—ঠিকমতো উত্তর না দিলে তোমায় মজা দেখাচ্ছি।—

তারপর আমায় দু'তিনজন অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আগের দিনের প্রশ্ন নীচু সামরিক অফিসারটি জিজ্ঞেস করার পর আমি এমনি ভাবে উত্তর দিয়েছিলাম,

—আমার দেশ বৃটিশদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে বিরাট একটা যুদ্ধ শুরু করেছে। এই যুদ্ধে আমার দেশবাসী কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা জানার আগ্রহ কি আমার থাকবে না? এটার জন্যই আমি রেডিও শুনি।

—তাই বলো, বৃটিশরা ভারত ছেড়ে কবে চলে যায় তাই জানার জন্য—না? এ উত্তর কাল তুমি দিতে পারতে। ঠিক আছে। যাও এখন আর তোমার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

আমি যদি একথা না বলতাম, তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যে আমার ঘাড়ে আর মাথা থাকতো না। সাময়িক ভাবে হ'লেও আমি মরণের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

চার মাস পর আমাকে এখান থেকে মিলিটারী জেলে নিয়ে আসা হলো। এখানে এক একটা ঘরে দুজন করে লোক রাখা হয়েছিল। সকাল ন'টার সময় স্নান করবার জন্য বাইরে নিয়ে যেত, বাকী সব সময় ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে হ'ত। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ এক জাপানী জেলে মাত্র দেখা যায়। সুস্থ অসুস্থ সব বন্দীকে এক ঘরে রাখা হতো। রোগীদের কোনো ওষুধ দিত না। আমার পরিচিত অনেক লোক বন্দী হ'য়ে ঐ জেলে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্শ, বেরিবেরি রোগেও মারা গেল। দু'তিনজনের মৃত্যুর আগে তাদের আমি শুশ্রূষা করেছিলাম। সে সব সাংঘাতিক দৃশ্যের কথা কখনও ভুলবো না। পরে মালয়ের কমিশনার জেনারেল

পদে নিযুক্ত হওয়া স্যার জন স্কট তখন এই জেলে ছিলেন। জাপানী সৈন্যদের বুট পালিশ করার কাজ বেশ কিছু দিন তাঁকে আর আমাকে করতে হ'য়েছিল। কাজের সময় মার না খাওয়াটা খুব অল্প লোকের কপালেই জুটতো। এই জেল থেকে বিচারের জন্য আমাকে মিলিটারী কোর্টে নিয়ে গেল। বিচার অবশ্য সব প্রহসন ছিল। আমার প্রধান অপরাধ কাউন্সিল অফ্ অ্যাকশান থেকে আমি পদত্যাগ করে জাপানীদের বিরোধিতা করেছিলাম। আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গেও আমি সহযোগিতা করিনি, এটা দ্বিতীয় অপরাধ। ছ' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আমাকে এই কোর্ট থেকে দেওয়া হ'লো।

রায় দেবার পর আমাকে অন্য আর একটা জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি আমি সেখানে ছিলাম। একটা কাঠের তক্তা শোবার, আর একটা কাঠের তক্তা বালিশ। খাবার ছিল সকালে ফেনাভাত, তাতে অবশ্য জলের ভাগই বেশী ছিল। দুপুরে আর রাতে দু'মুঠো করে ভাত। রোজ দশ পনেরজন করে বন্দী মারা যেত। অনেক লোককে ফাঁসিও দেওয়া হয়েছিল। নারকেল ছোবড়া পিটিয়ে তার থেকে দড়ি করা, সৈন্যদের বুট পালিশ করা, কাপড় জামা পাট করা, এক এক বার এক এক রকম কাজ আমি করেছিলাম। জেলে যা খাওয়া দিত তা খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। সাধারণত: আমার খিদে একটু বেশী। যদি ভাতের মধ্যে ফেনের পরিমাণ বেশী থাকে তাহ'লে খিদে কি করে মেটে ? জেলে আরো নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করলেও সব সময় এই অসহ্য খিদে আমার দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের দরজা বন্ধ করার পর একজন ওয়ার্ডার আমাকে বল্ল— খানিকটা ভাত আছে, চাই ? ও: এই খবরে যে আমি কি খুশী হলাম সে কথা বলে বোঝাতে পারব না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বল্লাম—চাই। ঘর খোলবার চাবি ওয়ার্ডারের কাছে ছিল না। বাইরে ভাত রাখা রয়েছে তা ঘরের ভেতরের একটা ছোট্ট ফোকর দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, আমি একটা পথ খুঁজে বার করলাম। বন্ধ দরজার নীচে প্রায় ছ' ইঞ্চি জায়গা খালি রয়েছে। আমি আমার ছেঁড়া জামাটা খুলে ঐ জায়গাটা দিয়ে বের করে বাইরে বিছিয়ে দিলাম। ওয়ার্ডার তাতে খানিকটা ভাত ঢেলে দিল। আমি সার্টটার এক কোণ ভেতর থেকে ধরেছিলাম, সব ভাতটা ঢেলে দেবার পর আমি সার্টটা ভেতরে টেনে সেই ভাতগুলো গপ্ গপ্ করে খেলাম। শুধুই ভাত। খাবার একটু জল পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সে ভাতের কি অমৃতময় স্বাদ! খিদে মেটাবার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে!

জেলের ভেতরের সেই অল্প খাওয়া খেয়ে বেশীদিন থাকতে হ'লে জেলের ভেতর থেকে

আমি আর বাইরে আসতে পারতাম না। বেরিবেরি রোগ আমাকেও ধরেছিল। সুযোগসুবিধা হ'লে আমার বাড়ী থেকে খাবার দাবার কিছু পাঠিয়ে দিত। জেলের একজন উচ্চ কর্মচারী এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিল। খুব সামান্য সাহায্যও কখনো কখনো বিরাট একটা আশীর্বাদের মত মনে হয়।

মানুষের স্বভাবের দুটো দিক—তার ভালো আর মন্দ জেলে বসে দেখা যায়। কারো কারোর স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, আবার কারো কারোর আত্মত্যাগ, সহানুভূতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল। মানুষের চরিত্রের প্রকৃত রূপ জানা যায় এই সব সময়ে।

সাঁইত্রিশ

জেলের বাইরে

আমার মেয়ে তাঙ্কমের অসুস্থতার কথা আগেই বলেছি। অসুখ বেড়ে যাবার খবর পেয়ে আমি যখন অত্যন্ত মনোকষ্টে আছি তখন একদিন সকালে জেল সুপারিণ্টেডেণ্টের অফিসে যাবার জন্য একজন ওয়ার্ডার এসে আমাকে জানালো। সেখানে গিয়ে দেখি আমার ছেলে উম্নি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে তাঙ্কমের মৃত্যুর খবর জানাতে এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল, তার দুটি বাচ্চাও ছিল। সে সময় প্রতিদিন অসংখ্য মৃত্যু ঘটছিল। কোনো কোনো পরিবার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে তখন মৃত্যুর কালো ছায়া। কিন্তু এসব আমার মনে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারে নি। আমার মেয়ের মুখখানি সর্বদা আমার মনের আয়নায় দেখে চোখের জল ফেলে আমি দিন কাটাতে লাগলাম।

যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে জেলের কর্মচারীদের কাছ থেকে খবর পাচ্ছিলাম। 15ই আগস্ট জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে একথা শুনেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবে জেলে খুব সাবধানতার সঙ্গে নানারকম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে দেখে এ খবর যে ঠিক তা আমরা বুঝতে পারলাম।

জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে শুনে আমরা যখন আহ্লাদে আটখানা তখন আর একটা খবর শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বৃটিশরা আসার আগে জাপানীরা সব রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা করবে বলে ঠিক করেছে। কেমন ভাবে যে এ গুজবের আরম্ভ হলো, কে যে একথা ছড়ালো তা কেউ জানে না। এটা যে মিথ্যে গুজব নয় তার প্রমাণে একটা ঘটনা ঘটলো। 18ই আর 19শে আগস্ট জেলের নর্দমা দিয়ে প্রচুর রক্ত বয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম অনেক লোকের ঘাড়ে কোপ দেওয়া হয়েছে। তাদেরি রক্ত। আমাদের ভয় পাইয়ে দেবার এর চেয়ে বেশী আর কি ঘটতে পারে? প্রাণান্তে দণ্ডিত আসামীদের মতো আমরা সব মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে রইলাম। এই ঘটনার কথা ভাবলে এখনো আমার গা শিরশির করে। সেদিন দুপুরের পর একজন ভারতীয় জেল কর্মচারী এসে বল্লে পর সব ঘটনা বুঝতে পারলাম। বন্দীদের খাবার জন্য যে সব শূকরগুলোকে মারা হয়েছে তাদের রক্ত নর্দমা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। উঃ কি ভরসা যে পেলাম এই খবর শুনে।

1945 সালের 20শে আগস্ট দুপুরের খাওয়ার পর আমার সেলে বসেছিলাম। একজন ওয়ার্ডার এসে আমাকে সুপারিণ্টেডেন্টের কাছে যেতে বল্ল। সুপারিণ্টেডেণ্টের কাছে গেলে পর জেলের জামা কাপড় ছাড়তে বলে আমাকে আমার ছেঁড়া কাপড় জামা ফিরিয়ে দিল, আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে তারা বল্ল। বাড়ী থেকে পাঠানো নতুন জামা কাপড় পরে আমি বাড়ী এলাম। বাড়ীর সকলে আমার আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। শুধু তাকম সেখানে ছিল না। তাকম বেঁচে থাকলে কত খুশীর সঙ্গেই না সে আমার আগমনের প্রতীক্ষা করতো। তাকে দেখতে না পেয়ে আমার মুক্তির আনন্দ যেন ফুরিয়ে গেল।

প্রায় এক সপ্তাহ আমি বিশ্রাম নিলাম। জাপানীদের আধিপত্য শেষ হয়ে যাওয়াতে সকলেই খুব খুশী হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর আগে বৃটিশরা তাদের ক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে পর জাপানীরা সেই ক্ষমতা অধিকার করেছিল। এখন আবার জাপানীরা তাদের ক্ষমতা ছেড়ে গেলে বৃটিশরা তাদের জায়গা নিল। একজনের আধিপত্য শেষ হবার পর আর একজনের আধিপত্য শুরু হবার সময়টা বড়ই বিপজ্জনক। সে যে কি অরাজকতা, তা না দেখলে বোঝা যায় না। তবু আমার মনে হয় দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন তুলনামূলক ভাবে কম বিপদসঙ্কুল ছিল।

যুদ্ধ শেষ হবার পরও বেশ কিছুদিন সিঙ্গাপুরে সামরিক শাসন জারী ছিল। যুদ্ধের সময় জাপানীদের সাহায্য করার অপরাধে কত লোকদের যে সামরিক কোর্টে বিচার হলো। তাদের মধ্যে ভারতীয়েরাও ছিল। এই ভারতীয়দের কেসে দাঁড়াবার জন্য একদল উকীল ভারতবর্ষ থেকে সিঙ্গাপুরে এলেন। মাদ্রাজ থেকে অ্যাডভোকেট কে. ভাষ্য, বোম্বে থেকে ব্যারিস্টার নরিম্যান, এলাহাবাদ থেকে ব্যারিস্টার সপ্রু এসেছিলেন। এ ছাড়া সার্ভেণ্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং কোদণ্ড রাও ভারতীয়দের অবস্থা মুখোমুখি বোঝার জন্য সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই আমার বাড়ীতে এসে যুদ্ধের সময় যা যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে অনেক অন্বেষণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে অনেক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। তাঁরা যেমন যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছিলেন, আমারও তেমনি দেশের অবস্থা জানার খুবই ইচ্ছে ছিল।

মাস খানেক পরে আমি আবার প্র্যাকটিশ্ আরম্ভ করলাম। অনেক কেস আমার হাতে আসতে লাগলো এবং আমার উপার্জনও খুব বেড়ে গেল। যুদ্ধের সময় বলে সে সময় চালু ছিল। জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে কিছু বন্ধুবান্ধবের এই কোর্টে বিচার হয়েছিল। আমারও বিচার হবার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমার কয়েকজন নিকট বন্ধুদের বন্দীত্বের সময় খুব সামান্য ভাবে আমি তাঁদের সাহায্য করতে পেরেছি বলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

আসামীদের কয়েকজনের জন্য আমি সামরিক কোর্টে হাজির হই। সে সময় অনেক বড় বড় কেস চলেছিল। তাদের মধ্যে একটি কেসের কথা বলব।

কেসটা বোর্নিওতে ঘটেছিল। মোহন সিং নামে একজন শিখ বোর্নিওর রাজধানী সাণ্ডেকানে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। জাপানীরা যখন বোর্নিও অধিকার করে তখন তারা মোহন সিংকে একটা খুব বড় কাজের ভার দেয়। বোর্নিওতে বহু চীনা ছিল। তাদের অনেকে জাপানীদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল। বোর্নিও জঙ্গলে ভরা ছিল বলে এরকম যুদ্ধ করতে সুবিধা ছিল। গরিলা যুদ্ধে চীনাদের গুলী করে হত্যা করার ভার মোহন সিং-এর ওপর দেওয়া হয়েছিল। মোহন সিং একদল পুলিশের সাহায্যে সাতজন চীনাকে জঙ্গলের মধ্যে ধরে তাদের গুলী করে হত্যা করে। জাপানীরা এর পুরস্কার স্বরূপ মোহন সিংকে আরো উঁচু পদে নিয়োগ করলো। কিন্তু যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বৃটিশেরা ফিরে এলে পর জাপানীদের সাহায্য করার অপরাধে মোহন সিংকে বন্দী করে বৃটিশ সামরিক কোর্টে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তখন মালয় এবং তার কাছাকাছি জায়গাগুলোর সামরিক শাসনের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর হেড কোয়ার্টাস ছিল সিঙ্গাপুরে। মোহন সিং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটা আরজি পেশ করে—জাপানীর আদেশানুসারে সে চীনাদের হত্যা করেছে তাই আইনানুযায়ী সে দোষী নয়। তার কেস শুনানীর সময় সে উকীলদের সাহায্য পায় নি, তাই সামরিক আদালতের রায় বাতিল করে কেস দ্বিতীয়বার শুনানীর জন্য আদেশ দেওয়া হোক। মাউণ্টব্যাটেন সব শুনে মোহন সিং-এর কেস দ্বিতীয়বার শুনানীর আদেশ দিলেন।

বোর্নিওর কাছে লাবুবান বলে একটা জায়গায় কেসের দ্বিতীয় শুনানী শোনা হবে বলে ঠিক হ'ল। ভারত সরকারের আদেশ মত মোহন সিং-এর জন্য সামরিক কোর্টে হাজির হবার জন্য আমি সিঙ্গাপুর থেকে 1946 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাবুবান যাই। যেদিন আমি লাবুবান পৌঁছই সেদিনই মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করে কেসের সব বিবরণ সংগ্রহ করি। দু'জন পরামর্শদাতার সাহায্যে একজন বৃটিশ জজ এই কেসের বিচার করেন। যুদ্ধের সময় বোর্নিও জাপানের অধিকারে ছিল বলে মোহন সিং তাদের আদেশ শুনতে বাধ্য হয়ে চীনাদের হত্যা করেছিল, তাতে তার অপরাধ হয়নি এই কথাই আমি বলি। যা ঘটেছে তা ঘটেনি এ কথা আমি বলিনি। আইনানুযায়ী মোহন সিং অপরাধী নয়,

এ কথাই আমি বলেছি। জজের পরামর্শদাতারা দু'জনেই ভারতীয় সামরিক অফিসার ছিলেন। তাঁরা মত দিলেন যে বন্দী অপরাধী নয়। জজ তাদের মতের সঙ্গে একমত হ'লেন না। তিনি রায় দিলেন যে বন্দী অপরাধী এবং তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে আমি সিঙ্গাপুরে ফিরে গেলাম।

একমাস পরে এই আপীলের শুনানী আরম্ভ হল। প্রধান বিচারপতি, বোর্নিওর গভর্ণর ও অন্যান্য বিচারপতিরা এই আপীল শুনলেন। আমার আর গভর্ণমেণ্ট উকীলের বক্তৃতা শেষ হলে জজেরা কেসের আলোচনা করে পনের মিনিটের মধ্যে আপীল বাতিল করা হয়েছে বলে রায় দিলেন। একটু পরে প্রধান বিচারপতি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি মোহন সিং-এর জন্য খুব জোরালো সওয়াল করেছি বলে তিনি আমায় অভিনন্দন জানালেন। "আপনার এই সওয়াল বৃথা হয়েছে বলে দুঃখিত হবেন না। মোহন সিং-এর ফাঁসি হবে না এ কথা আমি আপনাকে দিচ্ছি। শাস্তি কমাবার জন্য আমি সুপারিশ করেছি। আপনি খুশী মনেই সিঙ্গাপুরে ফিরে যেতে পারেন।" প্রধান বিচারপতি তাঁর কথা রাখলেন। মোহন সিং-এর প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করে দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল।

যুদ্ধের সময় 'মাতৃভূমি' কাগজটা দেখার সুযোগ আমার ঘটেনি। যুদ্ধের শেষে কয়েকজন মালয়ালী সামরিক অফিসার সিঙ্গাপুরে এলে পর প্রথম আমি 'মাতৃভূমি' দেখলাম। বেশ কিছু দিন ছেড়ে যাওয়া সন্তানকে দেখলে পর যে আনন্দ হয়, মাতৃভূমি দেখে আমি তেমনি খুশী হ'য়েছিলাম। মালয়ের ঘটনাগুলো সম্বন্ধে মাতৃভূমির অভিপ্রায় জানতে আমার খুবই আগ্রহ হলো। একজন সামরিক অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,

—এখানকার অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে মাতৃভূমিতে কিছু লিখবেন না?

—আর কিছু দিন যাক—আমি উত্তর দিলাম।

এই ভদ্রলোকের জিজ্ঞেস করার আগেই মাতৃভূমিতে লিখবো বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তখন লেখার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। আই. এন. এর বিচারের সময় তখন কংগ্রেস ভারতে সাধারণ নির্বাচনের জন্যে তৈরী হচ্ছে। যুদ্ধের সময় মালয়ে যা ঘটেছে তার সঙ্গে এই দু'টোরই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই আমার লেখার আর তা ছাপার সময়টা নির্বাচন করার ব্যাপারে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে বলে আমি মনে করলাম। ঐতিহাসিক প্রাধান্য ভরা এই ঘটনাগুলি আমার দেশবাসীকে জানানো আমার কর্তব্য। আমি যুদ্ধের সময় যে পথ অবলম্বন করেছিলাম তা হয়তো কেউ কেউ ঠিক বলে মনে করবে না। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে যোগ দিয়ে তারপর তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তখনকার পরিবেষ্টনীতে আমার মনোভাব একেবারে খোলাখুলিভাবে দেশবাসীকে বলবো

বলে ঠিক করলাম। উত্তেজনাটা একটু কমলে মাতৃভূমিতে সব লিখবো বলে অপেক্ষা করে রইলাম।

যুদ্ধ শেষ হবার আট মাস পরে আমি যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মাতৃভূমিতে লিখতে শুরু করলাম। প্রথম ছ'সাতটি লেখা বেরোবার পর এই লেখাগুলো কি লিখে যাওয়া উচিত বলে আমার কোনো কোনো বন্ধু আমাকে লিখে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি যা বলছি তা হয়তো ঠিক, কিন্তু সেগুলো ছাপা উচিত কিনা এই ছিল তাদের বক্তব্য। এই লেখাগুলো নিয়ে পরে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল, তার আভাস দেশে ফিরে পেলাম।

আটত্রিশ

দেশে তিন মাস

যুদ্ধ শেষ হবার পর দেশে ফেরার জন্য অধৈর্য হ'য়ে বহু ভারতীয় তখন সিঙ্গাপুরে বাস করছিল। এত লোকের ফিরে যাবার জাহাজ ছিল না। যুদ্ধের পর এস. কে. চেট্টুর ভারতের প্রতিনিধি হ'য়ে সিঙ্গাপুরে এসেছিলেন। সময়টা তখন খুবই খারাপ ছিল। ভারতীয়দের নানা সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হ'তে হয়েছিল। হাজার হাজার ভারতীয়ের দেশে ফেরার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা তাঁকে করতে হ'য়েছিল। চেট্টুর খুব কাজের লোক ছিলেন। কারোর নিন্দা বা প্রশংসায় কান না দিয়ে যা তিনি প্রয়োজন বলে মনে করতেন তা সঙ্গে সঙ্গে করতেন।

1946 সালে অক্টোবর মাসে আমি দেশে ফিরলাম। মাদ্রাজ দিয়ে যাবার পথে জাহাজ ছিল না বলে আমরা কলকাতা দিয়ে গেলাম। মালয়ে থাকতে কাক দেখিনি। কলকাতার কাছাকাছি এলে পর কাকগুলোকে 'কা', 'কা' চীৎকার করে উড়ে যেতে দেখে আমার খুব নতুন নতুন লাগলো। 1927 সালের আগস্ট মাসে আমি মালয়ে গিয়েছিলাম। দীর্ঘ 19 বছর পরে দেশে ফিরছি। জাহাজ থেকে নেমে কলকাতা বন্দরে পা দেবার পর আমার মনে কতরকম চিন্তার উদয় হলো।

আমার পুরোনো বন্ধু ভি. এম. নায়ার তখন কলকাতায় ছিলেন। দু'দিন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করলাম। কলকাতায় 'কেরল সমাজ' আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য একটা সভার আয়োজন করেছিল। সেই সভায় যুদ্ধকালীন আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি প্রথম বক্তৃতা দিলাম। দু'দিন পরে মাদ্রাজে এলে সেখানেও আমাকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানানো হলো। মালয়ের যুদ্ধকালীন ঘটনা সম্বন্ধে এবং আমার মতামত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করা হলো। তার থেকে আমি বুঝতে পারলাম, দেশে আমার সম্বন্ধে নানারকম ভুল ধারণা রয়েছে।

তিনদিন মাদ্রাজ থাকার পর আমি মালাবারে গেলাম। ওলাভাকোট ষ্টেশনে আমার বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মাতৃভূমিতে লেখা আমার প্রবন্ধগুলি দেশে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে সম্বন্ধে কিছু না বলে তাঁরা থাকতে পারলেন না। ওলাভাকোট থেকে আমি কালিকটে রওনা দিলাম। সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং আরো কয়েকজন ছিল। ট্রেন কাল্লাই ষ্টেশনে পৌঁছোলে পর বহু লোকে কালো

পতাকা হাতে নিয়ে আমার কামরার দিকে অগ্রসর হ'ল। তারা স্লোগান দিচ্ছিল "গো ব্যাক কেশব মেনন।" এদিকে কালিকট ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বহু লোক অপেক্ষা করছিল। ট্রেন ষ্টেশনে থামলে পর এক ক্রুদ্ধ জনতা আমার কামরার দিকে অগ্রসর হলো। তারা আমার বন্ধুদের আমার কামরার দিকে অগ্রসর হ'তে না দিয়ে মারামারি শুরু করে দিল। আমি দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম। ট্রেন থেকে নামবারও কোনো উপায় নেই, পুলিশও নেই। ক্রুদ্ধ জনতার পশুর মতো আচরণের সামনে নতজানু হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। পরে যে ঘটনা ঘটলো তা পরের দিনের মাতৃভূমিতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেই রিপোর্ট থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি।

—কাল সন্ধেবেলার গাড়ীতে শ্রী কে. পি. কেশব মেনন ওলাভাকোট ষ্টেশনে এলে পর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিরাট একটা জনতা ষ্টেশনে এসেছিল। এদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট নেতারাও ছিল। কিছু লোক কালো পতাকা আর কালো ব্যাজ হাতে লাগিয়ে শ্রীকেশব মেননের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কালো পতাকাধারী কিছু লোক কাল্লাই ষ্টেশন থেকেই গাড়ীতে উঠেছিল। এরা শ্রীমেননকে গাড়ী থেকে নামতে দেয় নি। "কেশব মেনন ফিরে যাও", "মাতৃভূমি নিপাত যাক", ইত্যাদি শ্লোগান তারা দিচ্ছিল। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কেশব মেননকে মাল্যদান করে। কিন্তু বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা মালা টেনে ছিঁড়ে ফেলে, কেশব মেননের সার্টও ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে ফেলে। অনেক কষ্টে কেশব মেননকে বাইরে আনা হয়। ষ্টেশনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করে। কেশব মেনন গাড়ীতে ওঠার সময় তারা কাদা ছুঁড়ে মারে। গাড়ীর উইণ্ড স্ক্রীন্ ভেঙে ফেলে। ঢিল ছোঁড়ার ফলে গাড়ীর মধ্যে একজন আহত হয়। তারা জাতীয় পতাকা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। মাতৃভূমির কর্মচারীদের কেউ কেউ সামান্য আহত হয়েছে, কারোর কারোর জিনিষপত্র খোয়া গেছে। কেশব মেনন ছেঁড়া সার্ট পরা, কাদামাখা অবস্থায় মাতৃভূমির অফিসে আসেন। শ্রীমেনন অত্যন্ত শান্ত ভাবে হাস্যমুখে এই অত্যাচার সহ্য করেছেন। বিক্ষোভকারীরা মাতৃভূমির অফিসের সামনেও কালো পতাকা প্রদর্শন করে।

ক্রুদ্ধ জনতার সঙ্গে যুঝে লাভ নেই। জনতা চিন্তা করে না, তাদের ধৈর্য নেই, দয়া নেই, দাক্ষিণ্য নেই। একজন যা করবে অপরে তা করবে। একজন যা বলবে, অন্যরাও তাই করবে। বিখ্যাত নাট্যকার গলস্‌ওয়ার্দির 'মব্' নাটকের নায়ক ক্রুদ্ধ জনতার সম্মুখীন হয়ে যে কথাগুলো বলেছিল তার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত—তোমরা জানো শুধু শক্তি প্রয়োগ করতে। যারা অসহায় তাদের ঢিল ছুঁড়ে মারতে তোমরা

জান। তোমরা মেয়েদের অপমান করো। যাদের কথা তোমাদের ভালো লাগে না তাদের নিন্দা কর। আজ এক রকম, কাল এক রকম এই তোমরা জানো। তোমাদের বুদ্ধি নেই, সাহসও নেই। তোমাদের যদি খারাপ না বলা হয় তো কাদের বলা হবে? তোমাদের কি দেশপ্রেম বলে কিছু নেই? আমাকে হয়তো তোমরা শেষ করতে পারবে, কিন্তু আমার বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমি একা, আর তোমরা হাজার হাজার হলেও পারবে না।

কালিকটে আসার তৃতীয় দিনে ভিক্টোরিয়া টাউন হলে কেরল রাজ্য কংগ্রেস কমিটি আমাকে একটা মঙ্গলপত্র দিল। এখানেও এক ক্রুদ্ধ জনতা ভীড় করেছিল। আমি বক্তৃতা দিতে উঠলে পর তারা এমন গোলমাল শুরু করলো যে দশ মিনিট আমি মুখই খুলতে পারলাম না। বক্তৃতার সময় বহুবার তারা গোলমাল আর প্রতিবাদ করেছিল। সভার পর ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার বন্ধুরা আমাকে ঘিরে হাঁটছিল। আমি তিনদিন কালিকটে ছিলাম। এর মধ্যে নানারকমের উড়ো চিঠি পেলাম। বেশীর ভাগ চিঠিগুলোতে আমাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

নিজের বিবেকের কাছে খাঁটি থেকে, নিজের বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করলে এবং জীবনকে চালনা করলে অপরের বিরোধিতা, নিন্দা, সমালোচনা সব কিছু সইতে হয়। এটা বিশেষ করে সামাজিক আর রাজনৈতিক কাজে যারা যোগ দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই ঘটে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের এইরকম অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। 1903 সালে ইংল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন ইংল্যাণ্ডের জনগণের বিপরীত মত পোষণ করতেন লয়েড জর্জ। তিনি খোলাখুলিই এক জনসভায় বলেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। এই জনসভায় সকলে যুদ্ধজ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে এসেছিল। তাঁর বক্তৃতা শুনে জনতা রেগে গিয়ে হাঙ্গামা আরম্ভ করলো। তাঁকে আক্রমণ করার জন্য তারা এগিয়ে আসতে রক্ষার কোনো উপায় না দেখে পুলিশের পোষাক ধারণ করে সকলের অজান্তে তিনি পালিয়ে গেলেন।

আর একজন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কথাও এখানে বলা যেতে পারে। এটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। ম্যাকডোনাল্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এতে তাঁর সমস্ত স্বাধীনতা খর্ব হ'য়ে গিয়েছিল। ঘরের বাইরে বেরোনো পর্যন্ত তাঁর মুশকিল হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধের পক্ষে একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে এর প্রস্তুতি করছিল। তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা, তিনি যত বড় লোকই হোন না কেন, ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। সে সময় একদিন ফ্রান্সে যাবার জন্য ম্যাকডোনাল্ড

জাহাজে চড়েছিলেন। একথা জাহাজের কর্মচারীরা জানতে পেরে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানালো যে হয় ম্যাকডোনাল্ড জাহাজ থেকে নামবেন নয় তাঁকে নামাবার জন্য তাদের অনুমতি দিতে হবে। ম্যাকডোনাল্ড জাহাজে থাকলে তারা জাহাজের কোনো কাজ করবে না। আর কোনো উপায় না দেখে ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ডকে জাহাজ থেকে নেমে যেতে বল্লেন। ম্যাকডোনাল্ড নেমে গেলেন। যুদ্ধের পর লেবার পার্টি বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করলো। ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হলেন।

এরকম অভিজ্ঞতা আরো অনেকের হয়েছে। শুধু জনগণের স্বীকৃতি পেতে হলে স্বাধীন ভাবে অনেক কিছুই করা সম্ভব নয়। এতে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন করার আনন্দ আর তৃপ্তি মেলে না। জনগণের স্বীকৃতি অস্বীকৃতি, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি বদলে যায়। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ চিন্তাহীন ভাবনাহীন জনতার প্রয়োজনে মাথা নত করে না। এই জনতার থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভাল। তারা কি পাগলামি করছে একথা তারা নিজেরাই পরে না ভেবে পারবে না।

কালিকট থেকে ফেরার আগে ঐক্য কেরল সম্বন্ধে আলোচনা করবার একটা সভায় সভাপতিত্ব করতে চেরুতিরুতি গিয়েছিলাম। কলামণ্ডলের বাড়ীতে এই সভা হয়েছিল। মহাকবি ভল্লতোল, কেলপ্পন, দামোদর মেনন প্রভৃতি এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। কেরল রাজ্য গঠন করার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য কেরলের নানা দিক থেকে প্রতিনিধিদের দিয়ে একটা কনভেনশন ডাকার ব্যবস্থা করার ভার একটি কমিটির ওপর দেওয়া হলো। ঐক্য কেরল সংগঠন করার প্রথম প্রস্তুতি ছিল এটা। এরপর আমি পালঘাট ফিরে যাই।

কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের ঝগড়ার ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত হ'য়ে যাবার সময় এটা। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের ভাইসরয়ের ক্যাবিনেটে একসঙ্গে কাজ করা পর্যন্ত মুশকিল হ'য়ে পড়লো। প্রতিদিন একটা না একটা গোলমাল লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে দু'ভাগ করার কথা কেউ ভাবেনি। সমস্ত ব্যাপারটা জানার জন্য আমি দিল্লী গেলাম। জেনারেল মোহন সিংও সেখানে এসেছিলেন। যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে বাস করা বহু সামরিক অফিসারদের সঙ্গেও দিল্লীতে দেখা হয়েছিল। জেনারেল মোহন সিং-এর সঙ্গে আমি মীরাটে কংগ্রেস মিটিঙে যাই। পণ্ডিত নেহরু একটা তাঁবুতে সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে আর মোহন সিংকে ডেকে পাঠালেন। সিঙ্গাপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে এখানে বসে কথাবার্তা বলি।

রাজা গোপালাচারী তখন বড়লাটের ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন। দিল্লীতে তাঁর সঙ্গেও

আমি দেখা করলাম। কুড়ি বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো। সিঙ্গাপুরে যুদ্ধের সময় জাপানীদের সম্বন্ধে আমি যে মনোভাব দেখিয়েছিলাম তার তিনি প্রশংসা করলেন।

এমনি ভাবে দু'সপ্তাহ উত্তর ভারত পর্যটন করে আমি আবার মালাবারে ফিরে গেলাম। আরো কিছুদিন দেশে থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরে যেতে দেরী হয়ে যাবে বলে আমি পরের জাহাজেই সিঙ্গাপুর রওনা হলাম।

উনচল্লিশ

মালয় থেকে বিদায়

যুদ্ধ শেষ হবার পর মালয় আর সিঙ্গাপুরের বিরাট পরিবর্ত্তন হয়েছে। যুদ্ধ শেষে এই জায়গাগুলোয় একটা নতুন জাগরণ দেখা যায়। একটা নতুন উৎসাহ আর আত্মবিশ্বাস লোকদের মধ্যে জেগে ওঠে। রাজনৈতিক ব্যাপারেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা গেল। ব্যবসা বেড়ে উঠল। জনগণের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্খা আর যেন চেপে রাখা যাচ্ছিল না। একটা নতুন মালয় গড়ে তোলবার উৎসাহ লোকের দিনের পর দিন বেড়ে উঠছিল।

এসময় আমার পসার খুব বেড়ে গেল। যুদ্ধের ফলে নানা রকম মামলার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের বৈচিত্র্য আর সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল। আয়ও প্রচুর বাড়লো।

ভারতে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার ঢেউ বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এই সব রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। ভারতের স্বাধীনতা উৎসব আমরা সিঙ্গাপুরে পালন করলাম। ভারতের সব ঘটনা মালয়ের অধিবাসীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছিল।

1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতের শাসনব্যবস্থা বৃটিশদের তরফ থেকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবাসীদের হাতে তুলে দেবার সময় দিল্লীতে যে সব অনুষ্ঠান আমি রেডিওতে শুনলাম, তাতে আবেগ আর উচ্ছ্বাস আমি দমন করতে পারলাম না। দুশ' বছরের বৃটিশ শাসন শেষ হয়ে গেল, এ যেন বিশ্বাস করতেই পারলাম না। অন্যান্য দেশে এর জন্যে ভারতের মর্যাদা বেড়ে গেল। এই সব দেশ থেকে দলে দলে ভারতীয়েরা দেশে চলে আসতে চাইল। স্বাধীনতা লাভ করায় ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাস কি ভাবে বেড়ে গেল তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ইংরেজদের অধীনে তাদের আদেশ মেনে কাজ করা ছাড়া আমাদের নিজেদের শাসন করার ক্ষমতা নেই এই কথাই আমাদের বিদেশী প্রভুরা এতদিন আমাদের বুঝিয়ে এসেছে এবং আমরা তা বিশ্বাস করে এসেছি। আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা এই ব্যাপারটা চিন্তাও করতে পারবে না। তারা স্বাধীনতার মধ্যে বেড়ে উঠেছে। তারা আজ যত উঁচুতে উঠতে চায় উঠতে পারে। যে কোনও কাজ তারা পেতে পারে। তাদের উন্নতির পথে কেউ আজ বাধা দিতে পারে না।

স্বাধীনতা পালনের উৎসব তখনো শেষ হয়নি, এমন সময় গান্ধীজীর মৃত্যুর খবর আমাদের স্তব্ধ করে দিল। অহিংসাকে তাঁর জীবনের ব্রত স্বীকার করে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যবহার করে পৃথিবীতে একটা আদর্শ সৃষ্টি করে মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার বলি হয়ে এক ঘাতকের গুলীতে বিদ্ধ হ'য়ে মারা গেছেন, একথা জানার পর নিষ্ঠুর নিয়তিকে আমরা অভিশাপ দিলাম। গান্ধীজীর এই শোচনীয় মৃত্যুতে সিঙ্গাপুরে আমরা একটা বিরাট শোকসভা করেছিলাম। এর কিছু পরে গান্ধীজীর চিতাভস্ম সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসা হলে তাকে অভ্যর্থনা করে নেবার বিপুল ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয়েরা ছাড়া কিছু ইউরোপীয়ান বন্ধুরাও এই ব্যবস্থায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলাকে প্রতিদিন ভিক্টোরিয়া টাউন হলে এসে সেখানে রাখা গান্ধীজীর চিতাভস্মকে ভক্তি ভরে আরাধনা করতে দেখে আমার মন এক অদ্ভুত আবেগে ভরে ওঠে। ইনি ছাড়া আরো অনেক ভারতীয়েরা এসে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। কোটি কোটি লোকের হৃদয় জয় করা মহাত্মা গান্ধীর অদ্ভুত শক্তির কথা ভাবলে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তাঁর জীবিতকালে যারা তাঁর মহৎ প্রভাব অনুভব করতে পেরেছে তারা সত্যিই ভাগ্যবান। গান্ধীজী যে দেশে জন্মেছেন সেই দেশে আমরা জন্মেছি। একথা ভাবলে দেশের ওপর আমাদের দায়িত্ব বোধ এবং সেবা করার আগ্রহ না বেড়ে পারে না। অনলস পরিশ্রম, সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে মানুষ যে কত উঁচুতে উঠতে পারে তার একমাত্র উদাহরণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন। একজন মানুষের পক্ষে কতখানি নৈতিক উন্নতি সম্ভব, সেটা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

এই সময় আমার হৃদয়কে স্পর্শ করা একটা ঘটনার কথা এখানে বলবো। একজন পাওনাদার তার পাওনা টাকার জন্যে আমাকে খুবই বিরক্ত করছিল। সে আমাকে 1200 ডলার ধার দিয়েছিল! তা শোধ করতে আমার বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তাকে আমি সবশুদ্ধ ফেরৎ দিয়েছিলাম 4300 ডলার। এই টাকাটা দেবার আগে সে তেরোবার আমার বাড়ীর আর অফিসের আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল। লোকটির প্রচুর পয়সা ছিল। একটু অপেক্ষা করলে তার কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু সে আমাকে এতটুকু শান্তি দেয় নি। এই অবস্থায় আমার তার ওপর রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। যা হোক, এর পর দশ বছর কেটে গেছে। সেই রাগ আর ঘৃণার উষ্ণতা তখন কমে গেছে। আমার অবস্থা ভালো হয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠুর কালচক্রের আবর্তনে তার অবস্থা খারাপ হয়েছে। যুদ্ধের সময় তার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তার সংসার খুব বড় ছিল। ক্রমে তার সংসার চালানো মুশকিল হ'য়ে পড়লো। আমার কাছ

থেকে সাহায্য চাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। একদিন তার ছেলে এসে আমার কাছে 500 ডলার চাইল। আমি সে টাকাটা দিতে গেলে আমার বন্ধুরা বল্ল—ওরা আগে কি রকম ব্যবহার করেছিল তা ভুলে গেছ ?

—ভুলিনি, আর সেই জন্যেই টাকাটা দিচ্ছি। এখন তারা আমার তখনকার অবস্থা বুঝতে পারবে। এ পৃথিবীতে কিছুই স্থির নয়। সবই চঞ্চল। ভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সম্পদ, দারিদ্র্য, ঐশ্বর্য, অসৎ কাজ সবই বদলে যায়—আমি বল্লাম।

একই ধরনের আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি যখন জাপানীদের জেলে ছিলাম, তখন আমার সঙ্গের একজন অর্ধনগ্ন কয়েদীকে আমার প্যাণ্টটা একবার পরতে দিয়েছিলাম। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে আমার প্যাণ্ট দেওয়াতে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে বলেই আমি দিয়েছি এবং সেটা কিসের সম্পর্ক সেটা বলার জন্য জেলের কর্মচারীরা পীড়াপীড়ি করে। "লোকটির কষ্ট দেখে আমার প্যাণ্টটা তাকে দিয়েছি"—আমার এ উত্তরে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না। আমি মিথ্যে কথা বলছি বলে একটা জাপানী অফিসার তার হাতের লোহার ডাণ্ডা উঁচিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল। এটা শুধু একবার নয়, বেশ কয়েকবার এমন ঘটেছিল। এই অফিসারটি আমার কাছাকাছি এলেই আমি ভয় পেতাম।

যুদ্ধের পরে কিছু জাপানীদের যুদ্ধের সময় জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার অপরাধে বিশেষ কোর্টে বিচার হয়। তাদের মধ্যে একজনের হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে তার বন্ধু আমায় অনুরোধ করলো। আমি রাজী হলে জেলে গিয়ে আসামীর বক্তব্য জানতে গিয়ে দেখি, আমাকে মারবার জন্য প্রায় হাত তুলতো যে জাপানী অফিসারটি তার হয়ে আমি দাঁড়িয়েছি। আমাকে দেখে যুবকটি একটা বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে ফেলে বল্ল—আমি আপনাকে গালাগালি করেছি, আপনার ওপর হামলা করেছি, আপনার সামনে দাঁড়াতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করবো আপনি তা বলে দিন।

—"যা হয়ে গেছে তা ভুলে যান। এখন আমি আপনার কেসের বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য এসেছি"—বলে তাকে আমি সান্ত্বনা দিলাম।

শুনানীর পর আসামী দোষী সাব্যস্ত হলো। রায় দেবার সময় বিচারক এই ভাবে বল্লেন—

"অসহায় নিরপরাধী লোকদের ওপর আসামী পশুর মতো অত্যাচার করেছে একথা কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে। দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড তাকে আমি দিলাম। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি। আসামীর কাছ থেকে মার খেয়ে কিন্তু তার কিছুই মনে

না রেখে আসামীর হয়ে কেসে হাজির হ'য়েছেন যে কৌঁসুলি, তাঁর কথা মনে রেখে আসামীকে 21 মাসের কঠিন সাজা দেওয়া হলো।"

খুব খুশী হয়ে আসামী এই রায় শুনলো। তখনকার পরিস্থিতিতে এই লোকটির সাজা যে খুবই লঘু হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির উপদেশের কথা মনে পড়ছে,—তোমার যদি কারোর ওপর ঘৃণা হয় তাহ'লে সেই অনুভূতি তোমার ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করবে। তার ফল শুধু তোমাকে নয়, তোমার পরিবারের সকলকে স্পর্শ না করে পারবে না। অন্যদের ঘৃণা করে লাভ নেই। যারা দোষ করেছে তাদের ঘৃণা না করা, তাদের ক্ষমা করাই হচ্ছে মহত্ব। এমন করলে তোমার মন শান্ত হবে, তোমার শক্তি সামর্থ্যও বেড়ে যাবে।

1946 সালের শেষে আমি যখন একবার দেশে গিয়েছিলাম তখন আমার বন্ধুবান্ধবেরা আর বেশী দেরী না করে সিঙ্গাপুর থেকে আমাকে ফিরে আসতে বলেছিল। আমি অবশ্য নিজের থেকেই ফিরে আসার কথা ভাবছিলাম। কুড়ি বছর আগে আমি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম কিছু টাকা রোজগারের জন্যে। টাকা রোজগারের বদলে বেশ কয়েক বছর আমি দেনার দায়ে বিকিয়ে গিয়েছিলাম। সেই দেনা শোধ করতে অনেক সময় লেগেছিল। আর যখন টাকা জমাতে আরম্ভ করলাম তখন যুদ্ধ লেগে গেল। যুদ্ধের পর রোজগারের দিক থেকে সময়টা খুবই ভালো ছিল। আরো চার পাঁচ বছর থাকতে পারলে যে উদ্দেশ্যে আমি এসেছিলাম সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'ত, বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে আমি ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু সিঙ্গাপুরে থাকতে আমার আর ভালো লাগছিল না। আমার মন দেশের জন্য কাঁদছিল। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে এ চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। বন্ধুবান্ধবেরা অবশ্য আমার এই বোকামি আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল। আমার সংসারের ভার বিরাট। সেই ভার সামলানোর মত আমার অর্থ সামর্থ্য নেই। দেশে গিয়ে আমি করবোটা কি ? আমি যদি আবার রাজনীতি করতে চাই তাহ'লে সংসারের খরচ চালাবার জন্যে অন্যদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। এই ভাবে নানারকম কথা তারা বল্ল। সবই ঠিক। আমার মন জীবনের ব্যবহারিক দিকটা ভাবতে পারছিল না। দেশ থেকে যে সব বন্ধুরা আমাকে দেশে ফিরে যেতে লিখছিলেন, তাঁরা হয়তো আমার আর্থিক অবস্থার কথা ভালোভাবে জানতেন না। যারাই সিঙ্গাপুরে যায় তারাই প্রচুর রোজগার করে। আমিও করেছি এটাই ছিল তাঁদের ধারণা। আমি তাঁদের ধারণা ভেঙে দিতে চেষ্টা করি নি। তা সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরা ঠিক করলাম।

কুড়ি বছর কাজ করে যে অফিসটাকে গড়ে তুলেছিলাম, সেই অফিসই ছিল আমার

সম্পত্তি। এই অফিসটা কোনো উকীলকে বিক্রী করতে পারলে সেই টাকাটা হবে আমার উপরি উপার্জন। এর সুযোগও মিলে গেল। কিন্তু যে টাকা আমি এর থেকে পেলাম তার চেয়েও বেশী টাকা আমার বিদেশে পড়া ছেলের খরচের জন্য দরকার ছিল। এর জন্যে আমাকে আবার টাকা ধার করতে হলো। তাই মালয় থেকে আমি খাতক হ'য়েই ফিরে এলাম। জীবনের বেশ কিছুটা দীর্ঘ সময় ঋণী ছিলাম বলে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হ'য়ে থাকার কল্পনা পর্যন্ত আমি করতে পারি নি। আগের তুলনায় আমার অবস্থা এখন ভালো হলেও ঋণের হাত থেকে আমি সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই নি। ডিকেন্সের উপন্যাসের মিকাবারের মতো সুসময়ের জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। আয় আমি যথেষ্টই করেছি, কিন্তু ব্যয়ের ব্যাপারে আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। হবে বলে মনেও হয় না।

কুড়ি বছর ধরে বাস করা সিঙ্গাপুর ছাড়তে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। 1948 সালের 17ই জুন আমি সিঙ্গাপুর ছাড়ি। বন্দরে আসা সব বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি জাহাজে চড়লাম। জাহাজ ছেড়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের দেখতে লাগলাম। কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে করতে কখন যে সিঙ্গাপুর আমার চোখের সামনে থেকে মুছে গেল তা জানতে পারি নি। তবুও ডেকে দাঁড়ানোর সময় খাওয়ার সময়, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সিঙ্গাপুর আমার মন থেকে মুছে যায় নি।

প্লেনের চেয়ে জাহাজে যেতে আমার খুবই ভাল লাগে। জাহাজে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্বার্থপর, নিঃস্বার্থপর, ভাগ্যবান, হতভাগ্য, বুদ্ধিমান, মূর্খ, সব লোকই এর মধ্যে পাওয়া যায়। সময়ানুবর্তিতা, অপরের সুবিধা অসুবিধা দেখে কাজ করার প্রবৃত্তি, এ সমস্তের শিক্ষা জাহাজেই হয়।

তিন দিন হলো সিঙ্গাপুর ছেড়েছি। জাহাজ এখন বঙ্গোপসাগরে। সকালবেলায় প্রাতঃরাশ সেরে ডেকে দাঁড়িয়ে আমরা একটার পর একটা আছড়ে পড়া ঢেউ আর তার ওপর সূর্যকিরণ পড়ে যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে তা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। সমুদ্রের এই বিরাট সৌন্দর্য দেখে মনে কতরকম চিন্তারই না উদয় হয়। বিরাট শিলাখণ্ড আর ছোট্ট বালুকণাকে সমুদ্র একই ভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার কাছে ছোট বড়র ভেদ নেই। সামান্য কীট থেকে চিন্তাশীল মানুষ ভাবে সেই সর্বব্যাপী অনন্ত সমান শক্তির স্পর্শ লাভ করে। আমরা সেই অনন্ত শক্তির অংশ, এ কথা জানতে পারলে জীবনকে একটা নতুন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়। ঘৃণা, ভালোবাসা, উঁচুনীচু, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, সব কিছুই এক নিয়ন্ত্রিত নিয়মের অধীন। এ সব জেনেও আমরা ভুল করি। আমাদের

নিজেদের অপরাধের জন্য অপরের দোষ দিই। নাম যশের জন্য আমরা অযথা কঠিন পরিশ্রম করি। যাদের শত্রু বলে মনে করি, তাদের শেষ করার চেষ্টা করি। অনাগত বিপদের কথা ভেবে ভয়ে কাঁপি। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করি। একদিন এসব ছেড়ে চলে যেতে হয়। জীবন শেষ হ'য়ে যায়। তারপর? তারপর?

জাহাজের বাঁশী বাজছে। লোকেরা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। জাহাজ এখন মাঝ সমুদ্রে দাঁড়িয়ে। নৌকোগুলো নামানো হচ্ছে? কি হয়েছে? একজন যাত্রী জাহাজ থেকে পড়ে গেছে? পড়ে গেছে, না ইচ্ছে করেই লাফ দিয়েছে তা কে জানে? অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটিকে পাওয়া গেল না। চারদিন পরে আমরা মাদ্রাজ এসে পৌছোলাম।

আমার কয়েকজন পুরনো বন্ধু বন্দরে আমাকে অভ্যার্থনা করতে এসেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় রাজাজী হলে মালয়ালীদের তরফ থেকে এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন হয়।

জাহাজ থেকে নেমেই 1948 সালে 27শে জুন মাতৃভূমির ডাইরেক্টরদের একটা চিঠি পাই। চিঠিটা এই রকম—

'মাতৃভূমি'র ডাইরেক্টরেরা এর প্রথম সম্পাদক কে. পি. কেশব মেনন দেশে ফিরে আসায় তাঁকে স্বাগত করছে।

যথাসম্ভব শীঘ্র তিনি যেন 'মাতৃভূমি'র সম্পাদকের পদ আবার গ্রহণ করেন, এই অনুরোধ আমরা তাঁকে জানাচ্ছি।

এমনিভাবে 'মাতৃভূমির' সঙ্গে আবার সম্পর্ক স্থাপন করার এবং কেরলের রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার আর একবার সুযোগ আমার মিললো।

চল্লিশ

আবার সম্পাদকের পদে

1948 সালের 1লা আগস্ট আমি আবার 'মাতৃভূমি'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলাম। বারো বছর ধরে এর সম্পাদক ছিলেন কে. এ. দামোদর মেনন। তিনি এই পদ আমাকে ছেড়ে দিলেন। দামোদর মেনন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই ক'বছর মাতৃভূমির কাজ চালিয়েছেন। এখন তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেবেন বলে ঠিক করলেন।

সম্পাদকের পদ গ্রহণ করে 1948 সালের 1লা আগস্ট আমি মাতৃভূমিতে এই রকম ভাবে লিখেছিলাম—

1925 সালের 31শে জানুয়ারী আমি মাতৃভূমির পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলাম। সেদিনকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম যে এই কাজ করে যাবার ভাগ্য যদি আমার থাকতো তাহ'লে আমি কৃতার্থ বোধ করতাম। সেই ভাগ্য আমি এখন লাভ করেছি। সেদিনকার সেই শিশু মাতৃভূমি আজ তার যৌবনে পৌচেছে। সেদিনকার বিদেশী আধিপত্য দূর করে ভারতকে স্বাধীন করার আন্দোলনে মাতৃভূমির অংশ কিছু কম নয়, একথা সকলেই স্বীকার করবে। একটা সংবাদপত্রের কাজ দেশের, ব্যক্তির, সমাজের বহুমুখী অভিবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা। এই ব্যাপারে দুটো জিনিষ মনে রাখা উচিত। প্রথম হচ্ছে অন্যান্য ব্যবসার মতো সংবাদপত্রও একটা ব্যবসা—এ সত্যতা ভোলার নয়। আয় ও ব্যয় যদি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে কোনো ব্যবসাই বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। এই সত্য কাগজ চালানোর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। তবে ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য লাভ। কাগজের উদ্দেশ্য তা নয়। জনসাধারণের সেবা করা কাগজের উদ্দেশ্য। আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাগজ চালাতে পারলে তা জনসাধারণের সেবায় লাগে। দলগত ঝগড়া বা সঙ্কীর্ণ মনোভাব যেন একে স্পর্শ করতে না পারে। এই আদর্শ সামনে রেখে, জনসাধারণের মঙ্গল লক্ষ্য করে, তাদের সব রকম সুখসুবিধা স্বাধীনতা বাড়িয়ে তোলার একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি নিরন্তর চেষ্টা করব।

আমার এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে একথা যদি আমি বিনয়ের সঙ্গে দাবী করি তাহ'লে তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর থেকে আরম্ভ করে

একেবারে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। গণ্ডগোল সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যেই থাকে। একটা প্রতিষ্ঠান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে নানারকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু দূরদর্শিতা আর মানসিক স্থৈর্যের সঙ্গে কাজ করা দায়িত্বশীল লোকের কর্তব্য।

মাতৃভূমির ডাইরেক্টরেরা সকলেই আমার অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে আমি কারুর নীলকণ্ঠ নাম্পুতিয়ারকে জানি। প্রথম থেকেই তিনি মাতৃভূমি কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টার ছিলেন। আজ তিনি ডাইরেক্টার বোর্ডে না থাকলেও মাতৃভূমি কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

করুণাকর মেনন আর একজন ডাইরেক্টার। মালাবারের কংগ্রেসে এবং হরিজন উদ্ধার আন্দোলনে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাঁর স্বভাবের সততা ও নিয়মানুবর্তিতা অনুকরণযোগ্য।

টি. ভি. সুন্দর আয়্যার একজন নামকরা উকীল, নামের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। আরম্ভ থেকে আজ অবধি তিনি মাতৃভূমির ডাইরেক্টার। টাকা পয়সার ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনতা একটু বেশী থাকলেও মাতৃভূমির দায়িত্ব পালন করতে তিনি কোনরকমই আলস্য দেখান নি।

শ্রীমতী কুট্টিমালু আম্মা আর একজন ডাইরেক্টার। কেরলে কংগ্রেসের কাজে যে কয়জন অল্প সংখ্যক মহিলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান খুব উঁচুতে।

শ্রী কে. মাধব মেনন অন্য আর একজন ডাইরেক্টার। এখন তিনি মাতৃভূমি ডাইরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং কোম্পানীর জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টার। শ্রী ভি. এস. নায়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। মাতৃভূমির অভিবৃদ্ধির জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর একজন ডাইরেক্টার হচ্ছেন শ্রীকেশবন নায়ার। শ্রীজিনচন্দ্রন, কে. কুমারন্ নায়ার, কে. কুট্টিকৃষ্ণ মেনন ডাইরেক্টার বোর্ডের অন্যান্য সদস্য।

তেইশ বছর পরে আবার আমি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলাম। দু'একজন ছাড়া সম্পাদকীয় বোর্ডে আর সকলেই নতুন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তাঁদের সঙ্গে আমার এমন সৌহার্দ্য গড়ে উঠলো, মনে হ'ল যেন আমরা কত পরিচিত। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহুদিন কোনো সম্পর্ক না থাকায় এঁদের সাহায্য এবং উপদেশ আমার খুবই কাজে লেগেছিল।

এ সময় কেরলের রাজনৈতিক আর সামাজিক জীবনে অনেক নতুন চিন্তাধারা এসে মিশেছে দেখতে পেলাম। অনেক নতুন লোককে নেতার জায়গায় বসে থাকতে দেখলাম। বহুদিন দেশে না থাকায় তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা আমার সহকর্মীদের

সাহায্যের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কাগজ চালানোর ব্যাপারে এই একই কথা বলা চলে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য মাতৃভূমি প্রচার করবে এটা আরম্ভতেই ঠিক হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই পথ অবলম্বন করে কাজ করা কঠিন হয় নি। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের লক্ষ্য বদলে গেল। একটা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গড়ে তুলবে বলে কংগ্রেস ঠিক করলো। সেই মতো মাতৃভূমির নীতিও বদলাতে হ'ল। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর কতকগুলো বাস্তব অসুবিধা দেখা গেল। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা মানে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যা করছে তা সব ঠিক বলে তাকে পূর্ণ অনুমোদন করা। একটা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যদি এমন কাজ করে যা আমাদের সেই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নি, তাহ'লে তার দোষ দেখিয়ে দিতে মাতৃভূমি এতটুকু ইতস্ততঃ করে নি। দলগত স্বার্থ না দেখে, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করা, নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত ব্যাপারটার সমালোচনা করা, এই রকম একটা ধারণা মাতৃভূমি তার পাঠকদের দিতে পেরেছে। তাই মাতৃভূমি আজ দেশবাসীর মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

মাতৃভূমি কোম্পানীর বিশেষত্বের ব্যাপারে বেশী লোকে হয়তো কিছু জানে না। কোম্পানীর মূলধন এখন 17000 হাজার টাকা মাত্র। এর থেকে প্রতি বছর লাভ বেড়ে আসছে। এই লাভ কাগজের অংশীদাররা পায় না। একটা সামান্য অংশ মাত্র তারা পেয়েছে। আর সব মাতৃভূমির সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এমনি ভাবে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনে একটা ভালো খবরের কাগজ চালানোর দরকারী যন্ত্রোপকরণ সব মাতৃভূমির আছে. কর্মীদের নিয়ম মতো ভালো মাইনে দেওয়া হয়। তাদের বোনাস, গ্র্যাচ্যুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেনশান, সব আছে। সরকারী অফিসে যে ভাবে ছুটি দেওয়া হয়, সে ভাবে তারাও ছুটি পায়। মাতৃভূমি একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। তার উদ্দেশ্য লাভ নয়, দেশের সেবা। ভারতবর্ষের কাগজগুলোর মধ্যে মাতৃভূমির যদি একটা উঁচু জায়গা থাকে তা এ সবের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নেহেরু 1955 সালের 28শে ডিসেম্বর মাতৃভূমির অফিস সন্দর্শন করে এই কথাগুলি বলেছিলেন—'মাতৃভূমি' কেরলের সংবাদপত্র হ'লেও সারা ভারতবর্ষ এর কথা শুনেছে। এই পত্রিকাটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। বহু লোকের ওপর তার প্রভাব বিস্তার ক'রে মাতৃভূমি যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে তা দেখে আমি খুশী হয়েছি।

মাতৃভূমির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে একটা বিষয়ে কেশব মেনন তাঁর স্বাগত সম্বর্ধনায় বলেন নি, তা হচ্ছে, মাতৃভূমি আমার বইগুলি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। তাই এক লেখক আর প্রকাশকের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক আমার আর মাতৃভূমির মধ্যে। আমি মাতৃভূমির কুশল কামনা করি।

মাতৃভূমির এই উন্নয়নে অনেকেই সাহায্য করেছেন। মাতৃভূমির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীকুঞ্জাপ্পার কথা এখানে বলা উচিত। কেরলের সাংবাদিকদের মধ্যে শ্রীকুঞ্জাপ্পার মতো দক্ষ এবং এবং অভিজ্ঞ লোক খুব কমই আছে, তাঁর গদ্য লেখার ষ্টাইল অত্যন্ত মনোহর। তাঁর অনূদিত 'ভারত আবিষ্কার', 'বিভক্ত ভারত', 'নেহেরুর আত্মজীবনী'র গদ্যশৈলী থেকে বোঝা যায়, তাঁর মালয়ালম শৈলী কত উচ্চ মানের।

মাতৃভূমি সাপ্তাহিকের দায়িত্ব যিনি বহন করেছেন, সেই এন. ভি. কৃষ্ণ ওয়ারিয়ারের সম্বন্ধে কিছু এখানে বলা উচিত। ওয়ারিয়ার এক বিরাট পণ্ডিত ও লেখক। তাঁর গ্রহণ করবার শক্তি অদ্ভুত। অনেক গভীর বিষয় এমন দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বোঝেন যা খুবই আশ্চর্যজনক। অনেক বিষয়ে তাঁর কতকগুলো সুদৃঢ় মতামত আছে। সে মতের সঙ্গে সকলের মিল না হ'লেও একজন পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে কৃষ্ণ ওয়ারিয়ারের স্থান অত্যন্ত উচ্চে।

মাতৃভূমির জীবন-নাড়ী হচ্ছেন তার ম্যানেজার শ্রীএম. কৃষ্ণন নায়ার। অত্যন্ত দক্ষ ও বিনয়ী এক মানুষ কৃষ্ণন নায়ার। মাতৃভূমি প্রেস ও কাগজের সমস্ত বিভাগের পরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। একজন সওদাগরের চোখ, একজন অভিজাত ব্যক্তির চালচলন, একজন ব্যবসায়ীর কার্যক্ষমতা, একজন মিশনারীর নিয়মনিষ্ঠা এসব যদি একজনের মধ্যে দেখতে হয় তাহ'লে মাতৃভূমির ম্যানেজার কৃষ্ণন নায়ারকে দেখলেই হবে। কৃষ্ণন নায়ারের কোনো কিছুতেই তাড়া নেই, অথচ কোনো কাজই তিনি ফেলে রাখবেন না। তাঁর অধীনে যারা কাজ করছে তাদের যেন একটা অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। কিছু লোক আর কিছু প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে সেই লোকগুলি ছাড়া সে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা চিন্তাও করা যায় না। এমনি সম্পর্ক কৃষ্ণন নায়ারের মাতৃভূমির সঙ্গে।

আর একজন লোকের কথাও এখানে বলা উচিত। সে হচ্ছে মাধব পাণিক্কর। মাধব পাণিক্কর কুড়ি বছর অ্যাটেণ্ডার হিসেবে মাতৃভূমির সেবা করেছে। তার সত্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্ত্তিতা যে কোনও লোকের অনুকরণযোগ্য। 1948 সালে আমি মাতৃভূমিতে ফিরে আসি। পাণিক্করের বয়স তখন পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। স্নান ক'রে, কপালে ফোঁটা কেটে, পরিষ্কার কাপড় পরে ঠিক সময় পাণিক্কর অফিসে এসে হাজির হবে।

তার নিজের লোক বলতে কেউ ছিল না। মাতৃভূমিই ছিল তার পরিবার। দু'বছর পরে অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে যাবার আগে অবধি পাণিক্কর আমার বাড়ীতেই বাস করতো। তার মৃত্যুতে মাতৃভূমির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

আজকাল পাঠকদের রুচির কত পরিবর্তন হয়েছে। খবর জানার আগ্রহ তাদের বেড়েছে। খুব যত্ন নিলেও তাদের সব সময় সন্তুষ্ট করা সহজ নয়।

মাতৃভূমিতে প্রকাশিত বেশীর ভাগ খবরগুলিই নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত। এই সব খবরগুলোর ব্যাপারে পাঠকদের কাছ থেকে প্রায়ই অভিযোগ আসে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ঠিক খবর জানাবার জন্যে যত নির্দেশই দেওয়া হোক না কেন, রিপোর্টারের অজান্তেও অনেক সময় খবরগুলোর রংচং বদলে যায়। মানুষের সাধারণ দোষত্রুটি তাদেরও থাকে।

বিভিন্ন রুচির পাঠকদের পছন্দ এবং আগ্রহের তৃপ্তি দেওয়া কঠিন। একজনের যা ভালো লাগে, অন্যজনের তা লাগে না। তাই তাদের অপছন্দমত কিছু কাগজে দেখলে তারা সম্পাদকের কাছে অভিযোগ করে। এই ধরনের কত বেনামী চিঠিই না আমি পাই। আমি সে সব চিঠি পড়ি। দরকার মনে করলে উত্তরও দিই।

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মাতৃভূমি যে নীতি অবলম্বন করেছে তা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হলে সেই নীতি বদলাবার জন্যে তারা মাতৃভূমির ওপর চাপ দেবার চেষ্টা করেছে। যারা ক্ষমতাশালী, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জনগণের পক্ষে যা অশুভকর, সে রকম নীতি মাতৃভূমি কখনই অবলম্বন করতে রাজী হয় নি। এর ফলে কিছু কিছু বন্ধুর বিরোধিতা আমি অর্জন করেছি। কিন্তু আমার মনে এই সান্ত্বনা যে, যা উচিত বলে মনে করেছি তা করেছি।

আজকাল কাগজে লেখা এবং আলোচনা করার ব্যাপার অনেক বেড়েছে। যে সব ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে তার থেকে আলাদা যে ঘটনা সেইগুলোই বিশেষ খবর। এই সব খবরগুলোকে বেছে নেওয়া এবং তার বিবরণ দেওয়ার বিচক্ষণতার মধ্যে একটা কাগজের খ্যাতি ও তার প্রভাব তৈরী হয়। এমনি ভাবে বেছে নেওয়া খবর এবং তার বিবরণ হয়তো অনেক সময় সন্তোষজনক নয় বলে মনে হয়। কিন্তু আমার সহকর্মীরা তাদের সামর্থ্য এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী যে কাজ করেছে তা ঠিক নয় একথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আবার তাদের ভুলটা না দেখিয়ে দিলেও হয় না। ভালো মন্দের রিপোর্ট সুন্দর করে দেওয়ার ক্ষমতা সাংবাদিকদের পক্ষে একটা বিরাট আশীর্বাদের মত। কিন্তু খুব কম লোকেরই এ ক্ষমতা আছে।

আমি নানা রকম কাজ দেখেছি আর করেছি, কিন্তু মাতৃভূমির অফিসে বসে কাজ

করতে যে সুখ আর তৃপ্তি পেয়েছি তা আর অন্য কোন কাজে পাই নি। হয়তো মাতৃভূমির সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে আমার এরকম মনে হয়। কাগজে কোনো ভুল দেখলে, এর নীতির বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো অভিযোগ করে তাহ'লে আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করি। কাগজের ব্যাপারে যত সাবধানই হওয়া যাক না কেন, কেউ না কেউ এ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করবেই। একবার একজন বড় অফিসার বলেছিলেন—"সংবাদপত্রের মধ্যে মাতৃভূমিকে আমি একটা মডেল কাগজ বলে মনে করি।" তাঁর এই প্রশংসা শুনে খুশী হ'লেও আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মাতৃভূমি চালানোর ব্যাপারে আমার একটা উঁচু আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে আমি বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এটা করতে পারবো কিনা সে সম্বন্ধে মনে ভয়ও আছে। এইটাই আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়। মাতৃভূমির মহৎ আদর্শকে সামনে রেখে তাকে পূর্ণ রূপ দেবার জন্য এর কর্মীরা যদি প্রত্যেকেই আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে তাহলে তা একটা আশীর্বাদের মতোই হবে।

মাতৃভূমিতে যে খবর বেরোয় তা পড়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এমন পাঠক আছে বলে মাতৃভূমিতে যদি কোনো ভুল খবর থাকে তাহ'লে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি। মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারেও তাই। জনগণের কল্যাণ লক্ষ্য রেখে পক্ষপাতহীন ভাবে মাতৃভূমির মতামত জানানো হয়। সম্পাদকীয় বিভাগে নানা মতের লোক কাজ করে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত মতামত কাগজের মধ্যে দিয়ে তারা প্রকাশ করতে পারে না। জনসাধারণের অভিপ্রায় একমুখী করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুধু নয়, তাকে রূপ দেওয়াও কাগজের দায়িত্ব। মাতৃভূমির মত এবং সম্পাদকের মত যে সব সময় এক হবে তা নয়। এ সম্পর্কে কতগুলো ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। তখন মাতৃভূমির মতের কাছে আমার মত মাথা নীচু করেছে। সম্পাদকীয়তে 'আমরা' এই শব্দটা বলতে কারা বোঝায় তা বলা মুশকিল। তবুও মত প্রকাশের ব্যাপারে 'আমরা' শব্দটির মতো এত সুবিধাজনক শব্দ আর আছে কিনা সন্দেহ। কাগজের ধর্ম সম্বন্ধে আমি একবার মাতৃভূমিতে এই রকম লিখেছিলাম—স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়ে গেছে। নানা ধরনের সংবাদপত্রও বের হচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং অন্যান্য কাগজপত্র একসঙ্গে করলে দেখা যায় যে ভারতে 6900 কাগজ আছে। এর মধ্যে ছশ'টি দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিক ধরে দেখা যায় যে আমাদের দেশে তার প্রচার 40 লক্ষের মতো। ভারতের সংখ্যা গণনা করলে এ যে কত কম তা বোঝাই যায়। ইংল্যাণ্ডে 'News of the World' শুধু এই কাগজেরই আশী লক্ষ

গ্রাহক আছে এটা জানতে পারলে আমাদের যে এখন কত এগিয়ে যাবার দরকার তা বলে বোঝাতে হবে না। এটা শুধু গ্রাহকের সংখ্যা। কাগজের পাঠক এবং শ্রোতার সংখ্যা এর ছ'গুণ অথবা আট গুণ তো হবেই। জনসাধারণের ওপর সংবাদপত্রের প্রভাব যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে কাগজগুলির দায়িত্বও বেড়ে যাচ্ছে। কাগজ শুধু সংবাদ বিতরণ বা তার সমালোচনা মাত্র করে না। জনগণের জ্ঞান, সংস্কৃতি বাড়িয়ে তাদের আনন্দ দেওয়া, তাদের স্বভাব গড়ে তোলা, এসব দায়িত্বও সংবাদপত্রের। কাগজের মতামত শুধু নয়, এর ভাষাও জনগণ পড়ে। একথা জানার পর মতামত ব্যক্ত করা এবং ভাষা ব্যবহার করার ব্যাপারে কাগজের কতখানি সাবধান হওয়া দরকার তা আমরা বুঝতে পারি। কাগজের সংখ্যা বাড়লে তার মান কমে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক। আমাদের দেশের কতকগুলো কাগজ সম্বন্ধে এ কথা খুবই প্রযোজ্য। মতামত ব্যক্ত করার নামে মিথ্যা অপমানকর লেখা, সমালোচনা ইত্যাদি কাগজের অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে। কিছু কাগজের ভাষা, তার ষ্টাইল পড়লে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি সে স্বাধীনতার আমরা যোগ্য কিনা এ কথা মনে না হয়ে পারে না। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে দোষারোপ করা, নিন্দে করা ইত্যাদিতে সাময়িক ভাবে কাগজের প্রচার বাড়তে পারে, কিন্তু গ্রাহকের সংখ্যা দিয়ে একটা কাগজের মূল্য হিসাব করা যায় না। শুধু মাত্র গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যদি কোন কাগজ কোনো নীতি অনুসরণ করে, তাতে কাগজের মান বাড়ে না। ব্যক্তির মত কাগজেরও মানমর্যাদা রক্ষা করা উচিত। সত্য খবর দেওয়া, পক্ষপাতহীন ভাবে সমালোচনা করা, প্রতিশোধ না নেওয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকের ব্যক্তিগত জীবনকে আক্রমণ না করা, এগুলোই কাগজের ধর্ম। সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু বল্লে তা কাগজে ছাপানোর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। অপরের নিন্দা শোনার বাসনা সকলেরই থাকে। কিন্তু এই বাসনা তৃপ্ত করার দায়িত্ব কোনো কাগজেরই থাকা উচিত নয়। 'কৃশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' কাগজ আরম্ভ করার সময়ে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—

"কারোর ক্ষতি করবে না, প্রত্যেকের ভালো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর।"

মানুষের মতো কাগজেরও কতকগুলো আদর্শ থাকা উচিত। সেই আদর্শগুলোকে রূপ দেবার জন্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেনের সম্পাদক সি. পি. স্কট্ যেমন বলেছিলেন—"ভালো যোগ্যতা, ভালো শিক্ষা, ভালো সূক্ষ্মদর্শিতা দরকার। শুধু তাই নয়, নির্মল বিবেক এবং প্রলোভনের সামনে মাথা নত না করার নৈতিক বোধও থাকা উচিত।" একটা

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংস্কার ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার যারা অংশীদার সেই আমাদের কাগজের এই পবিত্র কর্তব্য সম্বন্ধে মনে রাখলে ভালো হয়।

মাতৃভূমি আজ কত সাফল্য অর্জন করেছে। এর গ্রাহক সংখ্যা, এর প্রভাব, এর আর্থিক অবস্থা দেখলে ভারতের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এর যে একটা উঁচু স্থান আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

1962 সালে এর্ণাকুলম থেকে মাতৃভূমি প্রকাশ করার সঙ্গে এর প্রচারও খুব বেড়ে গেছে। এখন প্রতিদিন দু'লক্ষর বেশী কপি ছাপা হয়। গত বছরে সবশুদ্ধ আয় এককোটি টাকারও বেশী হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় কেরলের জনগণের হৃদয়ে মাতৃভূমির স্থান কত উঁচুতে। বেশীর ভাগ গ্রাহক জানে যে মাতৃভূমি তাদের অতি আপনার। মাতৃভূমির এই ঈর্ষাউদ্রেককারী মর্যাদা ক্ষতি করার জন্য যদি কেউ কোন অন্যায় কাজ করে তবে তা অক্ষমনীয় অপরাধ বলে ভাবা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই দু:সাহসিক কাজের ঝুঁকি কেউ যেন না নেয় এই আমার তাদের কাছে হৃদয় খোলা প্রার্থনা আর অনুরোধ।

একচল্লিশ

আরো কতকগুলি কর্মক্ষেত্রে

বহুদিন দেশ ছাড়া একটি লোক যখন দেশে ফিরে আসে তখন পুরোনো সম্পর্কগুলো আবার নতুন করে গড়ে তুলতে, নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'তে, রাজনৈতিক দলগুলো এবং দেশের নেতাদের মনোভাব বুঝতে বেশ কিছু সময় লাগে। আমারও তাই হয়েছিল। তাই দেশে ফিরেই হুড়োহুড়ি করে রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়াটা আমি পছন্দ করি নি। যেদিন মাদ্রাজে আমার জাহাজ এসে পৌছলো সেদিন তখনকার কেরল কংগ্রেস কমিটির সভাপতির কাছ থেকে একটা তার পেয়েছিলাম এই মর্মে যে আমাকে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর একজন সভ্য হতে হবে। মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে আমি খুবই ইচ্ছুক ছিলাম, তাই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর সভ্য হবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কাজ করার উৎসাহও আমার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেরল কংগ্রেসের কাজ এবং তার কর্মীদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার ছিল। কংগ্রেসীদের মধ্যে জোট বাঁধানো এবং একের অপরের ওপর বিদ্বেষ দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা আর স্বীকৃতি পাবার মোহ বেশীর ভাগ লোকের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, নিজের স্বার্থ আর জনগণের কল্যাণ একসঙ্গে মিলিয়ে চলা যায়। তার জন্যে খুব একটা বড় ত্যাগের দরকার নেই। শুধু কতকগুলো মার্জিত ব্যবহারের দরকার। সেগুলো যদি না থাকে তাহলে সত্যিই সমস্ত কিছু খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এই অবস্থার এখনো বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। শুধু তাই নয়, অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কয়েকজন নামকরা কংগ্রেস নেতার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করেছি। তাতে আমি সাফল্য লাভ করেছি এ কথা বলার সাহস আমার নেই।

কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে আমি বাহ্যিক ভাবে না থাকলেও কংগ্রেসের লক্ষ্য ও প্রোগ্রামে আমি বিশ্বাস করতাম। 1915 সালে কংগ্রেসে যোগদানের সময় থেকে আজ অবধি এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির ওপর আমার ভালোবাসা ও বিশ্বাস রয়ে গেছে। কিছু কংগ্রেস কর্মী এবং তাদের কাজকর্মের নিন্দা না করে অবশ্য আমি পারি নি। সেটা কংগ্রেসের ওপর আমার অশ্রদ্ধা বলে নয়। কংগ্রেরের নামে এই সব লোকের

গর্হিত কাজকর্ম দেখে সহ্য করার ধৈর্য না থাকায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া রাজনৈতিক দল ছিল শুধু কংগ্রেস। স্বাধীনতার পর দেশে আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলো। তাদের সঙ্গে কংগ্রেসও একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা চালানো দল বলে তার একটি বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

নতুন গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য বা দল গড়ার জন্য আমরা ইংল্যাণ্ডে যে রীতি প্রচলিত আছে তাই অনুকরণ করার চেষ্টা করছি। কংগ্রেসের সংগঠনের ব্যাপারে একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত। খদ্দর পরলেই কংগ্রেস কর্মী হওয়া যায়, এমন বিশ্বাস করার লোক এখনো বহু আছে। খদ্দর না পরলে কংগ্রেস কর্মী নয়, এমন তর্কও তারা করে। আমি মনে করি—আন্তরিক ভাবে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য বিশ্বাস করে সেই একজন কংগ্রেস কর্মী। দলে কার কি রকম স্থান হবে তা নির্ভর করা উচিত তার কাজ আর যোগ্যতার উপর। খদ্দরে বিশ্বাস না থাকলেও কংগ্রেসের লক্ষ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করার বহু লোক আছে। কিন্তু তাদের যথাযথ কংগ্রেস কর্মী বলে স্বীকার করা হয় না। আমাদের বিশ্বাসানুযায়ী জীবন কাটিয়ে তার থেকে তৃপ্তি আর আনন্দ পেতেই আমরা চাই। অন্য লোককে খুশী করার জন্যে যা আমরা বিশ্বাস করি না তা বলা বা সেরকম কাজ করা আত্মবঞ্চনা। তাতে জনজীবনের উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়।

কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দিয়ে কাজ না করলেও অন্যান্য অনেকগুলো ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ আমার ঘটেছিল। কেরলের ভেতরে এবং বাইরে নানা রকম জনসভায় যোগ দেবার নিমন্ত্রণ যে আমি কত পেয়েছি। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকদের সভায় ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা ধরনের সভায় ভাগ নেওয়া আমার পক্ষে যেন একটা সাধারণ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো। এমনি ভাবে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার, তাদের প্রয়োজন এবং মতামত জানার অবসর আমার মিলেছে। এর থেকে যে কাজ এবং অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি তা আমার কাছে একটা আশীর্বাদের মতো। যতই বই পড়া থাকনা কেন, জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে যা জানা যায় তা একেবারে অন্যরকম।

1948 সালের অক্টোবর মাসে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে আমি একটা বই লিখি। যুদ্ধের সময় আমার কতকগুলো অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মাতৃভূমিতে যে লেখা লিখেছিলাম সেগুলো একটু এদিক ওদিক বদলে এই বইতে লিখেছি। ইতিহাসের ঘটনাগুলি আমার যে রকম জানা আছে সেই ভাবে তার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছি।

'মালাবার লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি'র একবছর আমি সভাপতি ছিলাম।

মালাবার জেলার লাইব্রেরীগুলির সংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট এই সংস্থাটি গঠন করেছিলেন। আমরা পঞ্চায়েত, গ্রাম আর শহরগুলিতে লাইব্রেরী গঠন করার পদ্ধতি তৈরী করি। এর কাজ এখন বেশ এগিয়ে গেছে।

1949 সালে কালিকটে রোটারী ক্লাব স্থাপন করার সময় থেকে আমি এর সভ্য। রোটারী সংগঠনে এর আগের থেকেই আমার আগ্রহ ছিল। কতকগুলি প্রশংসনীয় কাজ কালিকট রোটারী ক্লাব করতে পেরেছে।

সর্বভারতীয় সম্পাদক কনফারেন্সের সাংবাদিক সঙ্ঘের আমি একজন সদস্য ছিলাম। সাংবাদিকতায় লিপ্ত সংগঠনগুলো দেশে ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। এই কাজে যুক্ত অনেক বড় বড় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় এবং কাজের ব্যাপারে মতামত আদান প্রদানের সুযোগ এই কনফারেন্সেই পাওয়া গেছে।

সেই সময় দিল্লীতে আহূত এক সর্বভারতীয় সম্পাদকদের কনফারেন্সের একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। কনফারেন্সের কাজকর্ম হিন্দী ভাষায় হওয়া উচিত বলে উত্তর ভারতীয় এক ভদ্রলোক একটি প্রস্তাব আনেন। কনফারেন্সে দক্ষিণ ভারতীয় বহু সদস্য ছিলেন যাঁরা হিন্দী জানতেন না। এই ভদ্রলোক এক হিন্দী পাগল। ইংরাজীতে কথা বলাটা তিনি অক্ষমনীয় অপরাধ বলে গণ্য করতেন। প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে তিনি রাজী হলেন না। আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করলাম। ভোটে তাঁর প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। এই ধরনের মনোভাব হিন্দী প্রচারে একটা বিরাট বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দী প্রচারের এখন বিরোধিতা করা হচ্ছে। হিন্দী যারা বাধ্যতামূলক করার জন্য তর্ক তুলেছে তারা হিন্দী বিরোধীদের মতই দেশের ঐক্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিয়াল্লিশ

সিংহলের হাই কমিশনার

1951 সালের মার্চ মাসে নিখিল ভারত সম্পাদকীয় কনফারেন্সের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিঙে আমি দিল্লী যাই। মালাবার ফেরার দিন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠালেন। কেন যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তা অনুমান করতে পারলাম না।

পরের দিন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে সিংহলের হাইকমিশনার হ'য়ে যেতে বল্লেন। প্রায় আধঘণ্টা আমরা এ বিষয়ে কথাবার্তা বল্লাম। মালাবারে ফিরে তাঁকে খবর জানাবো বলে ফিরে এলাম।

সিঙ্গাপুর থেকে সবে আড়াই বছর হ'ল দেশে ফিরেছি। এক্ষুণি আবার দেশ ছাড়তে মন চাইল না। কিন্তু তাহ'লেও প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত বলে আমার মনে হ'ল। সি. রাজাগোপালাচারী তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ছিলেন। তিনিও আমাকে যাবার জন্যে উৎসাহ দিলেন। দিল্লী থেকে ফেরার অল্প দিনের মধ্যেই বৈদেশিক বিভাগ থেকে যথারীতি এ বিষয়ে একটা চিঠি পেলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে সিংহলে যাব বলে ঠিক করলাম।

মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ নেবার জন্য একজন যোগ্য লোকের খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম। প্রথমেই আমার শ্রী ভি. এম. নায়ারের কথা মনে হলো। মাতৃভূমির প্রথম থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। সাংবাদিকতায় তাঁর নাম আছে। তিনি একজন প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আমি তাই তাঁকে মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে বল্লাম। প্রথমটা রাজী না হ'লেও আমার পীড়াপীড়িতে তিনি পরে রাজী হলেন। আমি এতে খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। পরের 15মাস তিনি যে ভাবে মাতৃভূমির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাতে তাঁর ওপর আমার বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ঠিক তার প্রমাণ হলো। এখন তিনি দৈনিক মাতৃভূমির ম্যানেজিং এডিটার এবং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

1951 সালের 30শে মে 'মাতৃভূমি' আর কালিকটের কাছে বিদায় নিয়ে আমি পরিবার নিয়ে সিংহল যাত্রা করলাম। পালঘাট আর মাদ্রাজে দু'দিন থেকে মণ্ডপমের পথে 7ই জুন সকালে আমি কলম্বোয় এসে উপস্থিত হলাম। কলম্বো ষ্টেশনে আমি যে

সম্বর্ধনা পেলাম তা আমি কোনো দিনই ভুলব না। এটা একজন হাই কমিশনারের প্রতি সিংহলবাসীদের সম্বর্ধনা নয়। এটা ভারতবাসীদের ওপর তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন। সেদিন বেলা 11টার সময় অ্যাকটিং হাই কমিশনারের হাত থেকে আমি চার্জ নিলাম।

ভারত আর সিংহলের সম্পর্ক বহুদিনের পুরানো। প্রায় 2500 বছর আগে আর্যরা ভারতবর্ষ থেকে সিংহলে গিয়েছিল ব'লে বলা হয়। সিংহলীদের পূর্বপুরুষেরা বাংলার কাছাকাছি জায়গাগুলো থেকে এসে বসবাস করেছিল তাও বলা হয়। সিংহলের আধিপত্য নিয়ে বহুদিন তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধে কোনো কোনো পক্ষ তাদের দল ভারী করবার জন্য মালাবার থেকে সৈন্য সিংহলে নিয়ে যায় বলে ইতিহাসে বলা হয়। আর্যরা এখানে আসার আগে দক্ষিণ ভারত থেকে তামিলেরা সিংহলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। উত্তর ভারত থেকে বিজয় নামে এক রাজপুত্র তাঁর সাতশ' অনুচর নিয়ে লঙ্কায় আসার সময় থেকে সিংহলের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করে। এটা খৃষ্ট পূর্ব 600 শতাব্দীতে।

এর প্রায় 300 বছর পরে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মের বাণী নিয়ে লঙ্কায় আসেন। তিনি সিংহলীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন লঙ্কার রাজধানী ছিল অনুরাধাপুর। বৌদ্ধ ধর্মে জনগণের অসীম বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য সিংহলে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার গড়ে ওঠে। এগুলো এখনো এখানে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার সিংহলে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। কিন্তু তাহ'লেও ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে এই দ্বীপের লোকেরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

সিংহলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পাওয়া গেলেও সিংহলী আর তামিলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। সিংহলের আশী লক্ষ জনসংখ্যার শতকরা সাতষট্টিজন সিংহলী। এরা সব বৌদ্ধ। তামিলদের সংখ্যা দশ লক্ষ, তারা বেশীর ভাগ জাফনায় বাস করে। এরা ছাড়াও আরব, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের লোকও এখানে বাস করে।

ভারতবর্ষ থেকে কুলীর কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া 8 লক্ষ ভারতবাসীও সেখানে আছে। এদের বেশীর ভাগই সিংহলের চা বাগানে কাজ করে। তা ছাড়া কেরানী, অফিসার, ব্যবসায়ীরাও আছে। সিংহল আর ভারতের সমস্যা নিয়ে আমরা অনেক কিছু শুনছি। কুলী আর অন্য কাজে লিপ্ত সিংহলে বসবাসকারী ভারতবাসীদের নিয়ে এই সমস্যা।

সিংহল একসময় মাদ্রাজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1802 সাল অবধি এই শাসন চলেছিল। এরপর সিংহল ক্রাউন কলোনী হয়েছিল। ক্রাউন কলোনী হ'য়ে যাবার

পর সেখানকার চা, কফি এবং রবারের বাগানগুলিতে কাজ করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর লোক সিংহলে যায়। এরা বেশীর ভাগই তামিল। পরে তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। এদেরই কঠিন পরিশ্রমের ফলে সিংহলের আবাদের এত উন্নতি হয়।

চা, রবার এবং শুকনো নারকেল সিংহলের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এর মধ্যে প্রথম স্থান চায়ের। 1952 সালে সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকার চা সিংহল বিদেশে রপ্তানী করে। $8\frac{1}{2}$ লক্ষ লোক চায়ের বাগানে কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে। এদের মধ্যে শতকরা আশীজন ভারতীয়। চা বাগানে কাজ করা লোকেদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তাদের মতো কাজ করা সিংহলী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের সম্ভব নয়। এমনি ভাবে সিংহলের ঐশ্বর্য যারা বাড়িয়ে এসেছে তাদের সিংহলের নাগরিকত্ব দিতে সিংহল গভর্ণমেণ্টের পছন্দ নয়। বাগানের কাজে এখন ভারতবর্ষ থেকে সিংহলে লোক নিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। কিন্তু যারা সিংহলে রয়েছে সেই সব ভারতীয়দের সিংহলের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে কিনা এটা একটা বিরাট সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সিংহল তাদের দেশ মনে ক'রে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বাস করছে যে ভারতীয়েরা তাদের সেই দেশের নাগরিক অধিকার দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার দেবার জন্য সিংহল সরকার কতকগুলো আইন পাশ করেছেন। সেই আইনানুযায়ী সিংহলের নাগরিকত্ব দাবী ক'রে বহু ভারতীয় দরখাস্ত করেছে। এই দরখাস্তের বিরাট একটা সংখ্যা একটা না একটা কারণ দেখিয়ে নাকচ করা হয়েছে। এমনি ভাবে ভারত আর সিংহলের সমস্যা যখন একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে তখন আমি সেখানে যাই।

হাই কমিশনারের কাজে যোগ দেবার তিন দিন পরে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী সেনানায়েকের সঙ্গে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করি। আধঘণ্টা আমরা কথা বলি পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এরপর বহুবার তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছি। আমাদের পরস্পরের মত না মিললেও আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুই ছিলাম। সেনানায়েকের অদ্ভুত নেতৃত্ব, সংচরিত্র ও কার্যক্ষমতা দেখে জানার সুযোগ আমার হয়েছিল, সিংহলের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তাঁর স্থান যে বহু উঁচুতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সেনানায়েক যে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন তা নয়। তিনি একজন ভালো বক্তাও ছিলেন না, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অগাধ জ্ঞানও তাঁর ছিল না। এসব গুণ ছাড়াই তিনি দেশের লোকের চোখের মণি হ'য়ে উঠেছিলেন।

সেনানায়েকের প্রধান গুণ কি একথা তাঁর অনেক দিনের বন্ধুকে আমি একবার জিজ্ঞেস করলে পর তিনি জবাব দিয়েছিলেন—সেনানায়েকের আন্তরিকতা। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, আশ্রিত, সকলের ওপর দিলখোলা ভালোবাসা সেনানায়েকের আর একটি গুণ।

যে কোন সমস্যার অন্তর্নিহিত অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন। তর্ক ক'রে তাঁকে হারিয়ে দেবার লোক পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের সকলের বক্তৃতা শেষ হবার পর সেনানায়েক বলতে আরম্ভ করলে—"ও: সমস্ত ব্যাপারটা এত সোজা" এই রকম মনে হবে। একবার কোনো কিছু ঠিক করলে তার থেকে তাঁকে টলানো যাবে না। অহঙ্কার অথবা ধৃষ্টতা তাঁর ছিল না। সেনানায়েক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই তিনি সমস্ত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতেন।

হাই কমিশনার হিসেবে আমার কাগজপত্র গভর্ণর জেনারেলকে দিতে তিন দিন অপেক্ষা করতে হ'ল। আমি যখন কলম্বোতে যাই তখন সিংহলের গভর্ণর জেনারেল লর্ড সল্‌বারী সেখানে ছিলেন না। নির্দিষ্ট দিনে আমি হাই কমিশনের প্রথম সেক্রেটারীর সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট হাউসে উপস্থিত হলাম। একটু পরে গভর্ণর জেনারেল সেখানে এলে পর আমি আমার কাগজপত্র তাঁকে দিলাম। এইভাবে আমি যথারীতি হাই কমিশনারের কাজে যোগ দিলাম।

লর্ড সল্‌বারী একজন কূট রাজনীতিবিদ। সিংহলের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অন্বেষণ ক'রে রিপোর্ট দেবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হয় তিনি তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাই সিংহলের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁকে তার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। লর্ড সল্‌বারীর তখন সত্তর বছর বয়স, কিন্তু তখনো তিনি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপূর। সব রকম লোকের সঙ্গে বড় সুন্দর ব্যবহার করতে তিনি জানতেন। যে কোন বিষয়ে তিনি সম্ভাষণ চালিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর এই সব গুণের জন্য তাঁকে সিংহলের গভর্ণর জেনারেল করা হয়েছিল। তাঁর অবসর গ্রহণের পর সিংহলে আর বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় নি। এর পরে সিংহলীরাই এই পদে নিযুক্ত হয়।

গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের, ভারতীয় সংগঠনগুলি এবং অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ ভোজে যোগ দিতে আমার বেশ কিছু দিন কাটলো। হাই কমিশনারের নানা কাজের মধ্যে এই সব ভোজসভায় যোগ দেওয়া এবং অন্যদের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করাও একটা কাজ। এই সব ভোজসভাগুলোর একটা সৌন্দর্যেরও দিক আছে। আগের থেকে প্ল্যান করে সমস্ত ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। অতিথিদের অবহেলা না হয়, তাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেগুলো সব খেয়াল রাখতে হয়।

1952 সালের জানুয়ারী মাসে 'রিপাবলিক' দিবস উপলক্ষে আমার বাড়ীতে একটা

ভোজসভার আয়োজন করি। দু'শর ওপর অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েকজন ইউরোপীয়ান অতিথি পরে আমাকে বলেছিলেন—"এই ভোজে যোগ দিতে পেরে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। শুধু তাই নয় আপনার দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো অনেক উঁচু হয়েছে।"

বাস করার সব রকম সুখসুবিধা হাই কমিশনারের বাড়ীতে ছিল। সিংহলে হাই কমিশনারের অফিসটি খুবই বড়। এই অফিস দেখলেই বোঝা যায় যে সিংহলে ভারতীয় হাই কমিশনের অফিসটি অন্যান্য দেশের হাই কমিশনের অফিসের চেয়ে অনেক বড়। আমি প্রতিদিন ঠিক সময়ে অফিসে যেতাম। কত লোক যে কত রকম দরকারে হাই কমিশনের অফিসে আসতো। তাদের দাবীদাওয়ার দিকে আমি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতাম। এবং অন্যান্যদেরও রাখতে বলেছিলাম।

লঙ্কার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এর সৌন্দর্য এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ কত জায়গা যে এখানে দেখার আছে। ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ করবার সব রকম সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা এখানে আছে। আমি মাঝে মাঝে দেশের ভেতরে ভ্রমণ করতে যেতাম।

প্রতি বছর কাণ্ডীতে 'পেরানীরা' বলে একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক যোগ দিত। এই উৎসব উপলক্ষে বুদ্ধের দাঁত হাতীর পিঠে চড়িয়ে যে শোভাযাত্রা বেরোতো তা একটা দেখার মত দৃশ্য।

বুদ্ধদেবের এই দাঁত চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলা দেশ থেকে সিংহলে নিয়ে আসা হয়েছিল। যে ঘরে এটা রাখা হয়েছিল তার দরজা রূপো আর হাতীর দাঁত দিয়ে কাজ করা ছিল। সেই ঘরে একটা উঁচু রূপোর সিংহাসনে নানা রকম অলঙ্কারের মধ্যে সযত্নে রাখা দাঁতের চারপাশে লোহার জাল দেওয়া ছিল। পৃথিবীর সব বৌদ্ধদের এটা একটা মহাতীর্থ স্থান। হলুদ রঙের কাপড় পরা ভিক্ষুদের মন্ত্রোচ্চারণ করতে আর পূজোর ফুল হাতে নিয়ে দর্শকদের এই মন্দিরের চারিপাশে সব সময়ই দেখা যায়।

প্রতি বছর জুলাই আর আগস্ট মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। খুব সুন্দর ভাবে সাজানো একটা দাঁতালো হাতীর পিঠে ভক্তেরা এই দাঁত বসিয়ে ভক্তি ভরে হাতীকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই উৎসব দেখতে শুধু সিংহলীরা নয়, বিদেশ থেকেও বহু লোক আসে।

আমি বেশ কয়েকবার কাণ্ডী গেছি। একবার কাণ্ডী থেকে কলম্বো ফেরার পর একটা ঘটনা ঘটেছিল যা আমি আজো ভুলতে পারি নি।

সেদিন কাণ্ডী থেকে কলম্বোতে ফিরতে রাত আটটা হয়েছে। কলম্বোতে হরটন রোডে আমাদের বিরাট বাড়ী। দু'তিনজন চাকর, মালী, বেয়ারা, রাঁধুনী, ড্রাইভার,

তারা সব নীচে ঘুমতো। ওপরে আমরা। সেদিন আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ রাত প্রায় দুটোর সময় পাশের ঘর থেকে আমার মেয়ে লীলার চীৎকার শুনতে পেলাম। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি লীলার মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট গোঙানি বার হচ্ছে। চাকরবাকরেরা সব ছুটে এল। ঘরের দিকে নজর করে দেখি বাক্স, আলমারী সব খোলা। গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। নীচের দরজা খোলা। একটু পরে ডাক্তার এলেন। লীলার মূর্চ্ছা ভাঙতে প্রায় এক ঘন্টা লাগলো। তার কাছ থেকে শুনলাম যে ঘুমের ঘোরে ওর মনে হ'লো কে যেন ওর গলার হারটা টানছে। চোখ খুলে দেখে সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট পরা একটা লোক তার খাটের সামনে দাঁড়িয়ে। চীৎকার করতে গেলে লোকটা তার মুখে কি যেন একটা গুঁড়ো ছুঁড়ে মারলো। সেই সময় ও চীৎকার করে। তারপর কি হ'ল সে জানে না। এই ঘটনার পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে তার দু'তিন দিন লেগেছিল।

দু'তিনজন লোক বোধহয় ঘরে ঢুকেছিল। প্রায় 2000 টাকার গয়না, শাড়ী তারা নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হলো। তারপর দু'তিন দিন আমার বাড়ীতে লোকের পর লোক আসতে লাগলো। প্রধানমন্ত্রীও এলেন। বহু চেষ্টা করেও চোরকে ধরা গেল না। অপহৃত জিনিষেরও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সিংহলের ঘটনাবহুল জীবনে এটা আমার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা।

তেতাল্লিশ

সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তন

ভারত-সিংহল সমস্যার সমাধানের জন্য আমি বেশ কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী সেনানায়েকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু ভারতীয়দের নাগরিকত্বের প্রশ্ন সহানুভূতির সঙ্গে দেখার মন তাঁর ছিল না। যত কম ভারতীয়দের সিংহলের নাগরিকত্ব দেওয়া যায় তার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। আর প্রধানমন্ত্রীর এই ইচ্ছাই অফিসারেরা কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করছিল।

গণতন্ত্রের ভিত্তি ভোটের ওপর নির্ভর করে। সিংহল একটা স্বাধীন দেশ। সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মাত্র ভোটের অধিকার থাকা উচিত একথা সিংহলীরা বলেছিল। এরই ভিত্তিতে 1948 সালে সিংহলের নাগরিকত্ব লাভ করার আইনটি পাশ হয়। এর আগে নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণ করার কোনো আইন ছিল না। ভারতীয়দের নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 1949 সালে একটা বিশেষ আইন পাস করা হয়। এই আইনানুযায়ী বহু ভারতীয় সিংহলের নাগরিকত্ব লাভ করার জন্য দরখাস্ত দেয়। একটা না একটা কারণ দেখিয়ে এই দরখাস্তগুলোর বেশীর ভাগই বাতিল করে দেওয়া হয়। এই দরখাস্তগুলো খুঁটিয়ে দেখার সময় একটু সহানুভূতি আর ন্যায়বিচার যেন দেখানো হয় বলে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর হাতে বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্ব থাকলেও ভারতীয়দের নাগরিকত্বের বিভাগটির ভার ছিল স্যার অলিভার গুণতিলকের হাতে। ইনিই পরে সিংহলের গভর্ণর জেনারেল হয়েছিলেন। এই সময় তিনি সিংহল মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী ছিলেন।

ভারতীয়দের নাগরিকত্ব দেবার ব্যাপারে আমি গুণতিলকের সঙ্গে কয়েকবার দেখা করি। সকলকে মোহিত করার ক্ষমতা তাঁর অদ্ভুত রকমের ছিল। খুব মিষ্টি করে কথা বলবেন। খুব সুন্দর তাঁর ব্যবহার। তাঁর মত যাই হোক না কেন, সেনানায়েকের পছন্দমত কাজ করতে তিনি বাধ্য। সেনানায়েক ভারতীয়দের বেশী সংখ্যায় সিংহলের নাগরিকত্ব দেওয়া পছন্দ করতেন না। যতদিন সেনানায়েক ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন ভারত-সিংহল সমস্যার সমাধান হবে না বলে আমার মনে হ'ল। আমি তবু হাল ছেড়ে দিই নি।

ভারতীয়দের সিংহলের নাগরিকত্বের অধিকার আদায় করার জন্য সিংহল-ভারতীয়

কংগ্রেস বলে একটা সংগঠন ছিল। পরে এই সংগঠনের নাম ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস হয়। এর সভ্যরা বেশীর ভাগই বাগানের শ্রমিক। আমি এদের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলাম। তবে এদের কাজ আর পথের প্রতি আমার পূর্ণ সম্মতি ছিল না। যখন দরকার মনে করেছি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি বা তাদের মতামত জানতে চেয়েছি। তাদের পথ ঠিক নয় ব'লে আমার মনে হ'লে আমার পথও ঠিক নয় বলে হয়তো তাদের মনে হয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তা বলা যায় না।

1952 সালের প্রথমে সিংহল গভর্ণমেণ্ট বিরাট একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। বহু দেশ এবং ভারতবর্ষ এতে ভাগ নিয়েছিল। সময় কম ছিল বলে সব কিছুর খুব দ্রুত ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বিভাগটি সবচেয়ে বেশী লোককে আকৃষ্ট করেছিল। এক মাস ধরে এই প্রদর্শনী চলেছিল। এই প্রদর্শনী শেষ হবার আগে সিংহলে একটা খারাপ ঘটনা ঘটলো। সে বিষয়ে এখানে বলবো।

প্রধানমন্ত্রী সেনানায়েক ঘোড়া চড়তে ভালোবাসতেন। এটাই ছিল তাঁর ব্যায়াম। প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা তিনি ঘোড়ায় চড়তেন। একদিন সকালে সমুদ্রতীরে গিয়ে তিনি ঘোড়া ছোটালেন, কিন্তু হঠাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁর জীবন রক্ষা করা গেল না। 1952 সালের 22শে মার্চ তিনি মারা যান।

সেনানায়েকের মৃতদেহ জনগণের সন্দর্শনের জন্য এক সপ্তাহ একটা প্রকাশ্য স্থানে রাখা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোক সিংহলের নানা ভাগ থেকে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। ছ'দিন ধরে সকাল বিকাল সেনানায়েকের মৃতদেহের সামনে জনপ্রবাহ দেখে সিংহল বাসীদের হৃদয়ে তাঁর স্থান যে কোথায় তা বোঝা যাচ্ছিল।

সেনানায়েকের মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। অবশেষে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাডলী সেনানায়েককে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করা হ'ল। তিনি সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হলেন।

পিতার যোগ্যতা অথবা জনগণের ওপর প্রভাব কোনোটাই ডাডলী সেনানায়েকের ছিল না। কিন্তু তবুও ভারতীয়দের ব্যাপারে তিনি একটু অনুকূল মনোভাব দেখাবেন এটা আমি আশা করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা বলে এই রকমই আমার মনে হয়েছিল। নাগরিকত্ব দেবার আবেদন জানিয়ে যে সব দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলোর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করা, দরখাস্তগুলো পরীক্ষা করার সময় ছোটখাট খুঁটিনাটির দিকে নজর না দিয়ে, দরখাস্তকারীদের সাহায্য করার জন্য আমি আবেদন জানিয়েছিলাম। এই ব্যাপারে সিংহল গভর্ণমেণ্টের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় লোকের

সমর্থনও আমি পেয়েছিলাম। আর তখনই সিংহল-ভারতীয় কংগ্রেস তাদের নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলো।

ডাডলী সেনানায়েক তখন সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ভারতীয়দের সিংহলীয় নাগরিকত্ব দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তখনো আসে নি। তার আগেই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করাটা আমার মতে অবিবেচনার কাজ হবে বলে আমি ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল না।

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করতে আরম্ভ করলো। নাগরিকত্ব লাভ করার দরখাস্তগুলো কি ভাবে পরীক্ষা করা দরকার সে বিষয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী, গুণতিলক, এবং বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী বৈদ্যনাথের সঙ্গে কয়েক বার কথা বলেছিলাম। তাঁরা আমার মতে সায়ও দিয়েছিলেন। এই সমস্ত আমি সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীকে জানিয়েছিলাম। এমনি ভাবে যখন চলছে তখন হঠাৎ দিল্লী থেকে আমাকে জানানো হলো যে সিংহল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা এখন বন্ধ রাখতে। আমি এই খবর পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সিংহল-কংগ্রেসের উস্‌কানীতে দিল্লী এইরকম করেছে বলে আমার মনে হলো।

এই সময় শ্রী আর. টি. চারীকে সিংহলের ডেপুটি হাই কমিশনার হিসাবে ভারত সরকার নিয়োগ করলেন। তিনি সিংহলে এসে তাঁর কাজের ভার নিলেন। এ সম্বন্ধে আমাকে কিছুই জানানো হয় নি। এর ওপর আবার কিছু দিন পরে দিল্লীর কাগজ গুলোতে খবর প্রকাশ করা হ'ল যে আমার সিংহল থেকে চলে আসার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়দের নাগরিকত্বের ব্যাপারে আমি যে নীতি গ্রহণ করেছি তা হয়তো ঠিক হয়নি ব'লে ভারত সরকারের মনে হয়েছে।

এই অবস্থায় হাই কমিশনারের পদে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। 1952 সালের 6ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের প্রয়োজন মত আমি হাই কমিশনারের পদ থেকে বিদায় নিলাম। সেই দিনই প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে আমি একটা চিঠি লিখি। চিঠিটা এই রকম—

সিংহল হাই কমিশনারের কাজে যোগ দেবার পর 15 মাস কেটে গেছে, এবং এই 15 মাস আমার কর্ত্তব্য আন্তরিক ভাবে করতে চেষ্টা করেছি। সিংহল সরকারের বিশ্বাস অর্জন ক'রে আমি ভারতের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। প্রধান প্রধান ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত না ক'রে ভারত সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকৃত রিপোর্ট দিয়েছি। আমি নিজের জন্য এই কাজ চাই নি। প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ পেয়ে এবং

দেশের আদেশ ভেবে এই কাজে যোগ দিয়েছি ইত্যাদি আমি এই চিঠিতে লিখেছিলাম।

সিংহল সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দেবার আদেশ কেন আমাকে দেওয়া হলো সে সম্বন্ধেও আমি এই চিঠিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে যাই হোক, যে তর্কাতর্কি চলছে তা যাতে সন্তোষজনক ভাবে মেটে তার জন্যে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছি এই তৃপ্তি নিয়ে আমি সিংহল থেকে দেশে ফিরছি, একথাও চিঠিতে লিখেছিলাম।

কোনো রকম রাগ বা বিরক্তির সঙ্গে আমি এই চিঠি লিখছি না। কিন্তু দিল্লীতে এই ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তাতে আমার খেদ আমি প্রকাশ করছি একথাও আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম।

17ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই চিঠির জবাব দেন। এই চিঠির বক্তব্য ছিল এই যে, সিংহল আর ভারতের সমস্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের মত আর আমার মতের মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর কিছু বলার নেই। সিংহলের ভারতীয়েরা যে পথ অবলম্বন করেছে তার সবগুলো ভারত সরকার অনুমোদন করে না; একথা তাদের জানানোও হ'য়েছে। তবুও তারা যদি এমন কোনো কাজ করে যাতে তাদের ভালো হবে বলে তারা মনে করে তাহ'লে তার থেকে তাদের নিবৃত্ত করা ভারত সরকারের নীতি নয়। আমি যে পথ নিয়েছি তাতে যে ভালো কিছু নেই তা নয়, কিন্তু ভারত সরকারের মত অন্য। ভারত সরকারের এই মত সরকার যে ভাবে চায় সে ভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারায় মতবৈষম্য দেখা দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী এই চিঠিতে বলেন।

এই চিঠির উত্তর আমি 26শে সেপ্টেম্বর দিই। এই চিঠির বক্তব্য সংক্ষেপে এখানে বলছি। সিংহলের ভারতীয়দের ব্যাপারে ভারত সরকারের নীতি থেকে ভিন্ন এক নীতি আমি অনুসরণ করেছি এ কথা ঠিক নয়। তবে আমার অভিজ্ঞতার আলোতে আমি বলেছি যে ভারত সরকারের নীতি আর একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। এ কথাও এই চিঠিতে লিখেছিলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজতে, তাকে জিইয়ে রাখতে নয়। সিংহলের হাই কমিশনারের পদে থাকার সময় আমি অনেক কিছু শিখেছি। এ শিক্ষা ভবিষ্যতে আমার রাজনৈতিক জীবনে কাজে লাগবে বলেও এই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম।

আমি হাই কমিশনার আর থাকছি না, এ খবর বাইরে বার হলে পর বহু লোক এর কারণ সম্বন্ধে অন্বেষণ করলো। নানা রকম ভিত্তিহীন খবর কাগজে বেরোলো। কিন্তু আমার চুপ করে থাকা ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না।

হাই কমিশন অফিসে আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে আমি যে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তা আমার মনে রাখা উচিত। তাঁরা এখন অন্যান্য দেশে কাজ করলেও তাঁদের সঙ্গে এখনো আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সিংহলে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী ভেঙ্কটাদ্রির কথা আমার মনে পড়ছে। অত্যন্ত সুযোগ্য কর্মচারী তিনি ছিলেন। কোনো কাজ তিনি ফেলে রাখতেন না। ছুটিও চাইতেন না।

কলম্বোতে আমার কয়েকজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে পাকিস্থানের হাই কমিশনার সত্তার শেঠের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তর মালাবারের তালাশেরীতে থাকতেন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি একজন বড় কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। তিলক ফাণ্ডে টাকা তোলার জন্য তিনি আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। আমরা দুজনেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লক্ষ্য রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম। কলম্বোতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো দুটি বিভিন্ন রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে।

আমি এবং আমার স্ত্রী ক্যাণ্ডীতে লর্ড সল্‌বারীর সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিলাম। তাঁর বাড়ীতেই সেদিন খেলাম। লর্ড সল্‌বারীর সাহিত্য ও ইতিহাসে খুব অনুরাগ ছিল। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার এক সপ্তাহ পরে আমি তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। চিঠিটা এই প্রকার—

—আপনি এবং আপনার পত্নী আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলে মনে করি। আপনার বিদায়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি একথা জানানোর জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমাদের পরস্পরের অনেকবার দেখা হয়েছে। সেই সময় আপনার মতামতের ন্যায্যতা ও হৃদয়ের বিশালতার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

আপনার স্ত্রীও এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ভাবলে সত্যিই খারাপ লাগে। আমি তাঁকে যে ইংরাজী শিখিয়েছি আশা করি তিনি তা ভুলবেন না।

ইতি আপনার বন্ধু সল্‌বারী।

এই ধরনের চিঠি আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে পেয়েছি। 1952 সালের 7ই সেপ্টেম্বর আমি আর আমার স্ত্রী কলম্বো ছাড়লাম। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত, বন্ধুবান্ধব, এবং আরো বহু লোক এয়ারপোর্টে আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলাম। এমনি ভাবে আমার জীবননাট্যের আর একটা দৃশ্যের শেষ হলো।

চুয়াল্লিশ

মা আর আম্মু

হাই কমিশনারের পদ ছেড়ে আমি চলে আসছি জানতে পেরে শ্রী ভি. এম. নায়ার আমাকে মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ আবার গ্রহণ করবার জন্য একটা তার পাঠান। কিছু দিন ওলাভাকোটে আমার বাড়ীতে বিশ্রাম করার পর আমি আবার মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলাম।

সিংহলে যাবার আগে মা'র সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন মা আমাকে বলেছিলেন—"আমি মরার সময় তুই আমার কাছে থাকবি। আমার অসুখ করেছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবি।" তখন মায়ের বয়স প্রায় পঁচাশী। আমি সিংহল থেকে ফিরে আসায় সকলের চেয়ে মা'ই বেশী খুশী হয়েছিলেন। মায়ের স্মৃতিশক্তি একটু কমে গেলেও স্বাস্থ্য তাঁর ভালোই ছিল। শরীর সুস্থ থাক বা না থাক, ইজিচেয়ারে শুয়ে তিনি নিয়মিত মাতৃভূমি পড়তেন। একবার আমি পালঘাটে একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে সভাপতি হয়ে গিয়েছিলাম। এই সভায় মা আসতে চেয়েছিলেন। "সভায় যেতে এখন তোমার কষ্ট হবে"—একথা আমি বল্লে পর তিনি বল্লেন—"এর পর আমি আর কবে তোর বক্তৃতা শুনতে পাব জানি না, তাই এই সভায় যাবার আমার খুবই ইচ্ছে।" সভায় পৌছোনোর পরই মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সভা শেষ না হওয়া অবধি সেখানে বসেছিলেন। ফিরে আসার পর বাড়ীতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। দু'ঘণ্টার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলেও সেই যে তাঁর ক্লান্তি শুরু হ'ল তা আর গেল না। যতই শরীর অসুস্থ থাক, মা স্নান না করে একদিনও থাকতে পারতেন না। বাচ্চারা গান করার সময় তালে বা সুরে ভুল করলে মা সঙ্গে সঙ্গে তা শুধরে দিতেন।

সিংহল থেকে ফিরে এসে আমি 'জীবন চিন্তা' এই বইটি লিখতে শুরু করি। এই ধরনের একটা বই লেখার আগ্রহ আমার অনেক দিনেরই ছিল। 'জীবন চিন্তা' ছাপিয়ে বেরোনোর পর লোকে যে ভাবে এই বইটিকে স্বাগত জানালো তা দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। নানা ধরনের লোকের কাছ থেকে এই বইটি সম্বন্ধে আমি চিঠি পেয়েছি। এই বইটি যে কি ভাবে তাদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে তা জেনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি।

সিংহল থেকে ফিরে আসার এক বছর পূর্ণ হ'তে না হ'তে আম্মু অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। রোগ ক্যান্‌সার। এর জন্যে চার বছর আগে মাদ্রাজে একটা অপারেশন করা হয়েছিল। অপারেশনের পর এই রোগের সম্পূর্ণ উপশম হয়েছে বলে ভেবেছিলাম। তারপর আমরা কলম্বো গেলাম। মাঝে মাঝে ডাক্তারেরা আম্মুকে দেখে যেতেন। ভয়ের কিছু নেই বলেই তাঁরা বলেছিলেন। একজন ডাক্তার অবশ্য বলেছিলেন ক্যানসারের অপারেশনের পরও শতকরা নব্বইটি রোগীর পাঁচ বছরের মধ্যে আবার এই রোগ ধরে। ঠিক এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় বার আম্মুর অসুখ শুরু হলো। অন্য কাউকে বিরক্ত না করার জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণার সময়ও আম্মু মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছে।

আম্মুর চিকিৎসার জন্য আমরা মাদ্রাজে গেলাম। চার সপ্তাহ চিকিৎসার পর আবার কালিকটে ফিরে এলাম। কিন্তু আম্মু কিছু দিন ভালো থাকলেও আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। তখন আমি কবিরাজী করে দেখলাম। কিন্তু রোগের উপশম হ'ল না।

1954 সালের এপ্রিল মাসে আম্মুকে কালিকট থেকে আমার বাড়ী ওলাভাকোটে "আত্তার চিরা'তে নিয়ে এলাম। এখানে আমার নাতনী নলিনীর বিয়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল। আম্মুর রোগের অবস্থা আশঙ্কাজনক হ'লেও নলিনীর বিয়েটা যেন নির্ধারিত দিনে হয়, আম্মু বলেছিল। তাই নলিনীর বিয়েটা এখানেই দিলাম।

আমি জানতাম, আম্মুর রোগ সারা খুবই কঠিন। কিন্তু আম্মু বিশ্বাস করতো যে সে খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। এটা অবশ্য সান্ত্বনার কথা। আম্মু মাঝে মাঝে কালিকটের বাড়ীতে শীঘ্র ফিরে যাবার আগ্রহও প্রকাশ করতো। এই সময় আমি 'ফেলে আসা দিনগুলি' বইটি লিখতে শুরু করি। আমার লেখাটা তাকে পড়িয়ে শোনাতে আম্মু খুব আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু বইটা শেষ হবার পর তাকে পড়িয়ে শোনানোর আর সুযোগ ঘটল না। তার দিন শেষ হয়ে আসছিল। লোকেদের আসা যাওয়া, কথাবার্তা কিছুই অসুস্থ আম্মুর ভালো লাগছিল না। তার চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে তাতে আম্মুর আগ্রহ ছিল না। "আর পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না" এই কথাগুলি মাঝে মাঝে সে উচ্চারণ করতো, দু'তিনজন লোক তাকে শুশ্রূষা করার জন্য নিযুক্ত ছিল। 'আত্তার চিরা' আমার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। আম্মু যখন অসুস্থ ছিল তখন সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাইরে এসে মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আত্তার চিরার পরিবেশটা অত্যন্ত শান্ত। আত্তার চিরার ডান দিকে বেশ কিছু দূরে মলমপুড়া বাঁধের বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে, বাঁদিকে ওলাভাকোট রেলষ্টেশনের কত আলো দেখা যায়। সামনের পাহাড়গুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা যায়। সে আগুনের রূপ বৈদ্যুতিক আলোর চেয়ে কত

বেশী মনোহর। নিস্তব্ধ এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় রোগিণীর ক্ষীণ স্বরে কাতর ক্রন্দন সমস্ত হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দেয়। ভগবান কেন মানুষকে এত কষ্ট দেন? এত শাস্তি দেন? কোনো রকমে যদি আম্মুর এই কষ্ট লাঘব করতে পারতাম!

"আজকে আমার অন্য দিনের চেয়েও কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠাও"—সেদিন ভোর চারটের সময় আম্মু আমাকে বল্ল। সেদিন ছিল 23শে জুন। ডাক্তার এসে আম্মুর ব্যথা কমাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো। আমরা তার অসহ্য যন্ত্রণা দেখে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আম্মু বল্ল, সে উঠে বসতে চায়। তাকে বালিশে ভর দিয়ে বসানো হলো। ঐ রকম ভাবে বসে বসে আম্মু তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। 29 বছর আগে এই জায়গাতেই লক্ষ্মী তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। আম্মুর দেহ বাড়ীতেই দাহ করা হলো।

আম্মু তার সারা জীবন আমার সুখসুবিধার জন্য অর্পণ করেছিল। বই আর কাগজ পড়তে সে ভালোবাসতো। কিন্তু রাজনীতিতে তার আগ্রহ ছিল না। বাড়ীর কাজ করে বাড়ীর গৃহিণী হ'য়েই সে থাকতে ভালোবাসতো। তার দক্ষতাও তার ছিল। সে খুব ভালো রাঁধতেও পারতো। আমি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে জানি যাদের দাম্পত্য জীবন একটা অভিশাপের মত। এ ব্যাপারে আমি সত্যিই ভাগ্যবান ছিলাম। এর জন্য লক্ষ্মী আর আম্মুর কাছে আমার ঋণ অসীম। তাদের মধুর স্মৃতি আমার মন থেকে কোনদিনই মুছে যাবে না।

আম্মুর মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে আমার মা মারা গিয়েছিলেন। একটা পাকা ফল যেমন টুপ করে পড়ে যায়, তেমনি ভাবে মায়ের মৃত্যু হলো। ভগবান তাঁকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছিলেন। তবুও মায়ের শূন্যস্থান পূরণ করার কেউ নেই। মায়ের জীবন নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর ভালোবাসার জীবন। এমনি ভাবে অল্প দিনের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসার দু'জন লোক চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেল।

1955 সালে আমার ছেলে উন্নির বিয়েতে যোগ দেবার জন্যে আমি আবার সিঙ্গাপুরে গেলাম। সিঙ্গাপুরের ডাক্তার মেয়ে লীলা ছিল আমার পুত্রবধূ। লীলাও ডাক্তার। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে কাজ করতো।

সাত বছর পরে সিঙ্গাপুরে এসে আমার মনে একটা মিশ্র ভাব জেগেছিল। এই অল্প কয় বছরের মধ্যে সিঙ্গাপুরের পরিবর্ত্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। যুদ্ধের পর সিঙ্গাপুরের যে নানা রকম শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তা সেখানকার বাড়ীগুলো দেখলেই বোঝা যায়। বাড়ী তৈরীর ঢংও বদলে গেছে। রাস্তায় গাড়ীর প্রবাহ দেখেও আমি আশ্চর্য হ'লাম।

প্রায় তিনমাস সিঙ্গাপুরে ছিলাম। পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করলাম। কয়েকজন নতুন লোকের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হ'ল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সঙ্গে জেলে ছিলেন। এমন একজন ছিলেন তখনকার সিঙ্গাপুরের কমিশনার স্যার রবার্ট স্কট। আমাকে দেখে তিনি বল্লেন—"আমাদের খুব ভালো সময়েই দেখা হলো।" তাঁর বাড়ীতে একদিন তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। পুরানো মুখ, পূর্বের সুপরিচিত জায়গা আর এক বার দেখলে পরে মনের মধ্যে একটা মিশ্র ভাব জাগে। জীবনের অজ্ঞাত ও নিগূঢ় সৌন্দর্য এই সময়েই জানবার সুযোগ হয়।

নভেম্বরের শেষে আমি দেশে ফিরলাম।

পঁয়তাল্লিশ

ঐক্য কেরল আন্দোলন

ঐক্য কেরলের একটা ছবি আমার চিন্তায় বহুদিন আগে থেকেই ছিল। কেরলের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন রকমের শাসনব্যবস্থা চলতে দেখে আমার আশ্চর্য লাগতো, আবার খারাপও লাগতো। রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগ দেবার আগে থেকেই এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু তখনকার আবহাওয়ায় কেরলের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে যুক্ত করে ঐক্য কেরল গঠন করার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু এই চিন্তা সবসময় আমার মনে ছিল। 1919 সালে মাদ্রাজের মালয়ালী ক্লাবের এক সভায় আমি প্রথম ঐক্য কেরলের কথা বলি। ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন আর মালাবার একসঙ্গে যুক্ত করে একটা প্রদেশ গঠন করা উচিত বলে আমার মত প্রকাশ করলে সভাপতি খুব অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমার এই মত প্রকাশের বিরুদ্ধে খুব কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যখন দেশের সামনে কত কি জরুরী কাজ রয়েছে তখন দেশের যুবকদের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ না করিয়ে অন্য পথে চালানো উচিত নয় ব'লে তিনি মনে করেন। শুধু তখন নয়, কখনোই এ লক্ষ্যে পৌছোনো যাবে না ব'লে তিনি বলেছিলেন, কিন্তু এর দু'বছরের মধ্যেই ঐক্য কেরলের একটা ছবি আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হ'তে লাগলো। ওট্টাপালমে প্রথম কেরল রাজ্য কন্‌ফারেন্সে এ নিয়ে আলোচনা হ'ল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার সময় কংগ্রেসের কাজের সুবিধার জন্য নতুন কংগ্রেস প্রদেশ কমিটিগুলো গঠিত হ'য়েছিল। এমনি ভাবে কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর আর মালাবার নিয়ে একটি কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আমি তখন এই কমিটির সেক্রেটারী ছিলাম। ওট্টাপালমের কনফারেন্সে কোচীন, ত্রিবাঙ্কুর আর মালাবারের প্রতিনিধিরা যখন কেরলীয় হিসেবে সম্মিলিত হলেন, সে দৃশ্য সত্যিই দেখার মত ছিল। কংগ্রেসের কাজের সুবিধার জন্য দেশগুলি এমনি ভাবে সংগঠিত করা হলেও এইটাই কেরল প্রদেশ হিসেবে রূপ নেবার প্রথম ধাপ ছিল।

এক বছর পরে কংগ্রেসের কাজে আমি কুইলনের এক জনসভায় কেরল প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে বলেছিলাম। কেরল যদি একটা প্রদেশ হিসেবে গঠিত হয় তাহলে কোচীন আর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার কি অবস্থা হবে? একথা এক ভদ্রলোক সেই সভায় আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর উত্তরে আমি বলেছিলাম, "অবস্থা বদলে গেলে রাজাদের

ব্যাপারটা বড় সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে না।"

1923 সালে মাতৃভূমি বের হবার সময় আমি আমার প্রথম সম্পাদকীয়তে ঐক্য কেরল সম্বন্ধে এমনি ভাবে লিখেছিলাম,

—একই ভাষায় কথা বলা, এক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বাঁধা, একই আচার বিচার পালন করা কেরলীয়েরা এখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বিভিন্ন শাসনের অধীনে থাকলেও কেরলীয়দের ভালোর জন্য, তাদের উন্নতির জন্য, তাদের মঙ্গলের জন্য, কেরলের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসী লোকেদের মধ্যে এখনকার চেয়ে আরো বেশী মিলন আর ঐক্য হওয়া যে কত দরকার সে কথা বুঝেই মাতৃভূমি নিরন্তর উৎসাহ দেখাচ্ছে।

ঐক্য কেরলের আদর্শ প্রচার করার কোনো সুযোগই আমি হারাই নি। তাই 1925 সালে আমি যখন মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিলাম তখন আমার পরবর্তী সম্পাদক রামুন্নি মেননকে ঐক্য কেরল সম্বন্ধে আমি যা করেছিলাম সেই বিষয়ে তিনি তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—দূরে গেলেও একটুও অস্পষ্ট না হ'য়ে তাঁর মনের আয়নায় সেই মহৎ আদর্শের সফলতা দেখার জন্য শ্রীকেশব মেনন চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। এই চেষ্টা বৃথা হয়েছে একথা কে বলতে পারে? গত চার বছরের অভিজ্ঞতায় এই নবীন কেরলের আবির্ভাব চার বছর আগের চেয়ে একটুও এগিয়ে আসে নি এ কথা কে বলতে পারে?

1927 সালে আমি মালয়ে গিয়েছিলাম। 20 বছর সেখানে ছিলাম। এর মধ্যে দু'তিনবার আমি ঐক্য কেরল সম্বন্ধে মাতৃভূমিতে লিখেছিলাম। 1934 সালের 'ওণম' সংখ্যায় তখনকার পরিস্থিতিতে ঐক্য কেরল গঠন করা সম্বন্ধে আমি এমনি ভাবে লিখেছিলাম—

—কোচীন এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাজ পরিবারের লোকেরা তাঁদের পদমর্যাদা এবং জায়গা জনগণের কল্যাণে ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত না হ'লে এই পদমর্যাদার কিছু পরিবর্তন ক'রে একটা ফেডারেল রাজ্য গঠন করা সম্ভব। মালয় দেশে 'ফেডারেটেড মালয় ষ্টেট্স' -এর একটা উদাহরণ। সেখানে চারজন রাজকুমারের অধীনে চারটি রাজ্য একসঙ্গে ক'রে একটা ফেডারেল ষ্টেট গঠন করা হ'য়েছে। তাঁদের নিজেদের রাজ্যগুলিতে এই রাজারা রাজ্য শাসন করলেও একটা প্রদেশ হিসেবে শাসনব্যবস্থাও এই রাজ্যগুলোতে চালু করা হয়েছে। এটার অনুকরণ করলে ভালোই হয়। আমাদের আদর্শ হচ্ছে, রাজা না থাকা। কিন্তু সেটা যদি এখন সম্ভব না হয়, তাহ'লে ফেডারেল রাজ্য গঠন করার জন্য শীঘ্রই এর তোড়জোড় শুরু করতে হবে। তবে এই ফেডারেল রাজ্য সংগঠন সাময়িক ভাবে, স্থায়ীভাবে নয়।

1945 সালে 'ভবিষ্যতের কেরল' এই নামে মাদ্রাজের মালয়ালী ক্লাবের জুবিলী উৎসবের সময় বার করা একটা স্যুভ্যেনিয়ারে আমার একটা লেখা থেকে কেরল বলতে কি বোঝায় তা জানা যাবে।

—শুধু একটা মালয়ালী রাজ্য আমার লক্ষ্য ছিল না। ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন, মালাবার ও তাদের সঙ্গে যে সব প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকে যুক্ত করা সম্ভব সেগুলো যুক্ত করে আমি কেরল রাজ্য দেখতে চাই। এই কেরলে অন্য ভাষাভাষী লোকেও থাকবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ঐক্য কেরলের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে সংগ্রাম করা সম্ভব হয় নি। তবুও তখন এর সমর্থকের সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

1946 সালের অক্টোবর মাসে বিশ বছর পরে আমি সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরলে পর ঐক্য কেরল রাষ্ট্র গঠন করার ব্যাপারে আমার সভাপতিত্বে একটা সভা ডাকা হয়। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একটা সাব কমিটি গঠন করেছিল। সেই সাব কমিটির অধীনে বেরুতীরুতিতে এই সভা ডাকা হয়েছিল।

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ত্রিচূরে 1947 সালের এপ্রিল মাসে শ্রীকেলপ্পনের সভাপতিত্বে ঐক্য কেরল কনফারেন্স ডাকা হয়।

এর আগে কোচীনের মহারাজা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে তাঁর একটা বাণীতে বলেছিলেন—আমার দৃঢ় অভিপ্রায় যে কেরলের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তা একটা শাসনের অধীনে আনতে হবে। তার জন্যে মালাবার, কোচীন আর ত্রিবাঙ্কুরকে একসঙ্গে যুক্ত ক'রে কেরলের জন্য একটা সাধারণ শাসনব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। কিন্তু কোচীনের মহারাজার এই মতে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজা সম্মত হন নি। কেরলের নানা ভাগ থেকে প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিল। এই সভায় ঐক্য কেরল গঠন করার পক্ষে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করার জন্য একশ'জনের একটা কাউন্সিল ওখানেই বেছে নেওয়া হয়। এই ভাবে কেরল রাজ্য গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। এই কনফারেন্স যখন ডাকা হয় আমি তখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম। সেখান থেকে আমি শুধু একটা শুভেচ্ছা পত্র পাঠাতে পেরেছিলাম।

1946 সালের 2রা ফেব্রুয়ারী আলওয়েতে ঐক্য কেরল কনভেনশন ঐক্য কেরল আন্দোলনে এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি করে। উপরে বর্ণিত কাউন্সিলের একশ'জন সদস্য ছাড়াও কোচীন ও মাদ্রাজ নিয়মসভার মালাবারের সদস্যেরা, কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যেরা মিলিয়ে দশ'জন প্রতিনিধি এই কনফারেন্সে যোগ

দিয়েছিলেন। ঐক্য কেরল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীকেলপ্পন এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

কেরলের ভৌগোলিক একতা ও কেরলীয়দের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির কথা মনে রেখে ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন ও মালাবার এবং তাদের সঙ্গে আশেপাশের কতকগুলো মালয়ালম ভাষা-ভাষী জায়গা যোগ করে একটা রাজ্য গঠন করার ইচ্ছা এই সভা প্রকাশ করছে। এ ছাড়াও এখন ভারতের কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী নতুন রাজ্য গঠন করার ব্যাপারে যে সংবিধান তৈরী করছে, উপরে বর্ণিত কেরল প্রদেশও এই সংবিধানের আওতায় আনা হোক বলে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর 15 জন সদস্য নিয়ে ঐক্য কেরল কমিটি গঠন করা হয়। দরকার হ'লে নতুন সদস্যদের এই কমিটির সদস্য করে নেবার অধিকারও এই কমিটিকে দেওয়া হয়। এই কমিটি ঐক্য কেরলের কাজ আরম্ভ করল। শ্রীকেলপ্পন ছিলেন এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট, আর. কে. এ. দামোদর মেনন ছিলেন সেক্রেটারী।

আলওয়ে কনভেন্‌শনের ছ'মাসের মধ্যে একটা স্মরণীয় ব্যাপার ঘটল। 1949 সালের 1লা জুলাই কোচীন আর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য যুক্ত হলো। এই সংযোজন কেরল রাজ্য গঠনে সাহায্য করবে বলে অনেকে আশা করলেও অন্য বেশ কিছু লোক এই সংযোজনের ফলে ঐক্য কেরল গঠন করায় দেরী হবে বলে মত প্রকাশ করলো। তখন মিনিষ্ট্রির সেক্রেটারী ভি. পি. মেননের অক্লান্ত চেষ্টায় কোচীন আর ত্রিবাঙ্কুর যুক্ত হয়েছিল।

ত্রিবাঙ্কুর আর কোচীন যুক্ত হবার ফলে ঐক্য কেরল কমিটির সদস্যদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিল। শ্রীকেলপ্পন ঐক্য কেরল কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন এবং আমাকে এর সভাপতি নির্বাচন করা হলো। ঐক্য কেরল গঠন করতে আর একটুও দেরী না করার জন্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ নিয়ে আবেদন জানাবার জন্য একটা সাব কমিটিও গঠন করা হ'ল। এই সাব কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবার জন্য একটা মেমোরাণ্ডাম তৈরী করে এবং পালঘাটে ঐক্য কেরল কনফারেন্স ডাকার ব্যবস্থা করে।

1949 সালের 6ই নভেম্বর পালঘাটে কনফারেন্স হয়। প্রতিনিধি এবং দর্শক হিসাবে বহু লোক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। ত্রিচূর এবং আলওয়ের থেকে এই সম্মেলন একটু অন্য ধরনের ছিল। তার কিছু কারণও ছিল।

1950 সালের জানুয়ারী মাসে নতুন শাসনব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে ঐক্য কেরল তার রূপ নেবে এটা ছিল আমাদের কয়েকজনের অভিপ্রায়। ত্রিবাঙ্কুর আর কোচীন যখন যুক্ত হয়েছে তখন কেরল প্রদেশের সঙ্গে মালাবার এবং অন্যান্য কাছাকাছি জায়গা

গুলোও যোগ করা উচিত এই মতের সমর্থকদের যোগাড় করতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছু লোক এর বিরুদ্ধে ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল—

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিকশিত প্রদেশ হিসেবে মাদ্রাজের অনেক নীচে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিবাঙ্কুর কোচীন। তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ষ্টেট, মালাবার তখন মাদ্রাজ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অবস্থায় ত্রিবাঙ্কুর কোচীনের সঙ্গে মালাবার যুক্ত হলে মালাবার তার রাজনৈতিক মর্যাদা হারাবে। যতদিন না ত্রিবাঙ্কুর কোচীনের রাজনৈতিক পদমর্যাদা মাদ্রাজের মত হয় ততদিন মালাবারকে ত্রিবাঙ্কুর কোচীনের সঙ্গে যুক্ত করাটা ঠিক হবে না বলে তারা তর্ক করলো।

দ্বিতীয় কারণটি, কে রাজপ্রমুখ হবে তাই নিয়ে। ত্রিবাঙ্কুর কোচীনের সঙ্গে মালাবার যুক্ত হলে সেই প্রদেশের যিনি মাথা তিনিই রাজপ্রমুখ হবেন। এদিকে ত্রিবাঙ্কুর কোচীন সংযুক্ত হয়েছিল এই সর্তে যে যতদিন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি এই সংযুক্ত রাজ্যের রাজপ্রমুখ হ'য়ে থাকবেন। রাজপ্রমুখ আর গভর্ণরের মধ্যে ক্ষমতার ব্যাপারে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। কেউ কেউ আবার 'গভর্ণর' আর রাজপ্রমুখ এই নাম নিয়ে এবং রাজপ্রমুখকে দেওয়া সময় নিয়েও আপত্তি করলো। তারা এও বলল যে, যে সময় জনগণের প্রতিনিধিদের শাসনের ব্যাপ্তি ও শক্তি বাড়ছে সে সময় একটা রাজ্যের নেতা নিয়ে রফা হওয়া একেবারেই উচিত নয়। এমনি ভাবে খুব বাদপ্রতিবাদ চললো। রাজপ্রমুখহীন কেরল প্রদেশের সমর্থন করে একটা প্রস্তাবও পাশ করা হলো। এমনি ভাবে পালঘাটের কনফারেন্স শেষ হলো।

এর মাস দুই পরে সাব কমিটি দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, সরদার প্যাটেল আর কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে ঐক্য কেরলের ব্যাপারে একটা মেমোরাণ্ডাম দেয়। মিঃ ভি. পি. মেনন তখন এ বিষয়ে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন।

এঁরা সব উপদেশ দিলেন যে কেরল প্রদেশ গঠন করবার বাধা বিশেষ কিছু নেই, তবে অন্ধ্র প্রদেশ স্থাপন করবার আগে অন্য প্রদেশ গঠন করাটা ঠিক নয়। উপযুক্ত সময়ে গভর্ণমেণ্ট নিজে এই ব্যাপারে চেষ্টা করবে। তাই একটু অপেক্ষা করা ভালো। আমরা ডিসেম্বরে দিল্লী থেকে ফিরে এলাম।

পালঘাট কনফারেন্সের পর ঐক্য কেরলের বিরুদ্ধে আন্দোলন মাঝে মাঝে হচ্ছিল। কেরল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা জায়গাগুলো সম্বন্ধে অস্পষ্ট মতামত কেউ কেউ কাগজে বার করলো। ঐক্য কেরল কমিটি মাঝে মাঝে সভাসমিতি করলেও উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ বেশ কিছু সময় করতে পারে নি। এই সময় আমি সিংহলের হাই কমিশনার হ'য়ে

গেলাম। 1952 সালের সেপ্টেম্বরে আমি দেশে ফিরে এলে পর আবার ঐক্য কেরলের কাজ আরম্ভ হলো।

এর মধ্যে 1952 সালের জুন মাসে কেরল কংগ্রেস কমিটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ত্রিবাঙ্কুর কোচীন কংগ্রেস কমিটি আর মালাবার কংগ্রেস কমিটি। কংগ্রেস দু'ভাগ হ'য়ে যাওয়াতে এতদিন পর্যন্ত ঐক্য কেরল ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল তাতে বেশ পরিবর্তন হলো। 1953 সালের এপ্রিল মাসে পালঘাটে মালাবার প্রদেশ রাজনৈতিক কনফারেন্স দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সমর্থনে একটা প্রস্তাব পাশ করে—"ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন ষ্টেট আর মালাবারের সঙ্গে মাদ্রাজ যুক্ত করে একটা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ গঠন করা হোক্।" ঐক্য কেরল কমিটি যখন একটা কেরল প্রদেশের দাবী করছিল এবং তার জন্যে কাজ করছিল তখন মালাবার প্রদেশ কংগ্রেসের এই প্রস্তাব কতকগুলো নতুন সংকটের সূত্রপাত করলো। ঐক্য কেরল কমিটিকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ক'রে কাজ করতে হলো।

1953 সালের 22শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহেরু পার্লামেণ্টকে জানান যে প্রদেশ গুলির পুনর্সংগঠন ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য একটা কমিশন বসানো হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনজন সভ্য—ফজল আলি, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু আর সর্দার পাণিক্করকে নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হ'ল।

এই কমিশনকে ঐক্য কেরল গঠন করার ব্যাপারে একটা মেমোরাণ্ডাম দেবার জন্য কমিটি তাদের অনেক সময় ব্যয় করলো। অনেক সভাসমিতিও করলো।

1954 সালের জুন মাসে কমিশন কালিকটে এলে পর ঐক্য কেরল কমিটির মেমোরাণ্ডাম তাদের দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন ষ্টেট, মালাবার আর দক্ষিণ কর্ণাটকের কিছু জায়গা, নীলগিরি জেলার গুডালুর, উটি, কুটকু, লক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি নিয়ে একটা প্রদেশ তৈরীর কথা এই মেমোরাণ্ডামে ঐক্য কেরল কমিটি বলেছিল। কমিশনের রিপোর্ট বার হ'তে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। এর মধ্যে আমি কয়েকবার কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তাও বলেছিলাম। ঐক্য কেরল গঠন করার সমর্থনে এবং বিরুদ্ধে কয়েক জায়গা থেকে কমিশনকে যে মেমোরাণ্ডাম দেওয়া হয়েছিল তার খবর কাগজে বেরিয়েছিল। ভারী মজার সব খবর। যাহোক, কেরল প্রদেশ গঠন করার সমর্থনে রিপোর্ট বেরোলে পর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ গঠনের সমর্থকেরা সংগঠিত ভাবে আন্দোলন শুরু করল। তারা তাদের সমর্থনে দিল্লীতে এবং কেরলে বেশ কিছু লোক জোগাড় করতে পেরেছিল। অনেক বড় বড় ব্যক্তি যারা ঐক্য কেরলকে সমর্থন করে এসেছিল তারা এখন এর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হয়ে বলতে আরম্ভ করলো

দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো। আমার কয়েকজন খুব নিকট বন্ধুও এই দলে ছিলেন। মালাবার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করেছিল তা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটা বিখ্যাত কাগজে লেখার মত। কেরল প্রদেশের জন্য প্রথম কথা বলা রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস, আবার কেরল প্রদেশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শেষে কথা বলে এই কংগ্রেস। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এটা একটা অতি শোচনীয় ডিগবাজী। কেরলে কংগ্রেসের পুরোনো পৈতৃক বাড়ী হচ্ছে মালাবারে। আর নিষ্ঠুর বিধির এই পরিবর্তন এই মালাবারেই দেখা গেল। সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বে-সরকারী সভা ঐক্য কেরল সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য আমি ডাকি। কংগ্রেস ছাড়া আর সব দলের প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগ দিয়েছিল, সে কথা এখানে বলে রাখা ভালো।

কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হবার পর বম্বে এবং অন্যান্য জায়গায় খুব গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। জনগণ যেমন আশা করেছিল তেমনি ভাবে ষ্টেটগুলো গঠিত হয় নি বলে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'য়েছিল।

কেরল প্রদেশ গঠন করার সিদ্ধান্ত করার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ঐক্য কেরল কমিটির একটা সভা 1956 সালের 4ই মার্চ ত্রিচূরে ডাকা হয়। এই সভায় এই ভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—ঐক্য কেরল কমিটি কেরল প্রদেশ গঠন করবার দৃঢ়বিশ্বাসে বরাবর বিশ্বাসী। কেরল প্রদেশের সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি জায়গা যুক্ত করার জন্য কমিটি যে দাবী করেছে সে সব জায়গাগুলো হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাহলেও কেরল প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে এস. আর. সি. রিপোর্টের ওপর ভারত গভর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে কমিটির অনুমোদন আছে। দেশের সীমা রেখা নিয়ে যে সব আন্দোলন এখন চলছে তা দেশের পক্ষে হানিকর বলে কমিটি মনে করে। নতুন কেরল প্রদেশকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কমিটি জনগণকে আহ্বান করছে।

কেরলীয়দের চির অভিলাষের বিরুদ্ধে কেরলকে মাদ্রাজ বা মহীশূরের সঙ্গে অথবা এই দুটোর সঙ্গে যুক্ত করার যে প্রচেষ্টা কিছু কিছু নেতা করেছেন, কমিটি তা অত্যন্ত আশঙ্কা ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এইরকম সব চেষ্টা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেরলকে একটা বিশেষ প্রদেশ হিসেবে গঠন করার ব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র কাজে পরিণত করা যায় তার জন্য একটা আবহাওয়া গড়ে তোলার কাজে কমিটি দায়িত্বশীল সব লোকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে।

কেরল কমিটির এই বক্তব্য আমি কেরলের ভেতরে এবং বাইরে কতকগুলো সভায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম।

আমার আশা মত কেরল রাজ্য গঠিত হয় নি আমি জানি। ত্রিবাঙ্কুরের চারটি তালুক এবং গুডালুর কেরল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। তবে একটা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ থেকে অন্তত এমন কেরল প্রদেশ আমার অনেক পছন্দ। আমার মত এবং মাতৃভূমি যে নীতি অনুসরণ করেছিল তাকে রূঢ়ভাবে নিন্দে করে বহু চিঠি পেয়েছি। প্রদেশ পুনর্গঠন বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত কি যে হ'তে যাচ্ছে তার কিছুই ঠিক ছিল না। সেই বিল যখন পাশ হলো এবং কেরল প্রদেশ গঠিত হতে চললো তখন আমার আনন্দের সীমা রইল না।

নিখিল কেরল সাহিত্য পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব এই সময়ে পালন করা হয়। আমি এতে সভাপতিত্ব করতে বেশ গর্বের সঙ্গেই রাজী হয়েছিলাম। পরিষদ কেরলের সবচেয়ে বড় সাহিত্য সংগঠন বলে এই গর্ব নয়। ঐক্য কেরল গঠনের শেষ ধাপ পৌছোনোর সময় পরিষদের জয়ন্তী মহোৎসব এসে উপস্থিত হলো, এটা একটা শুভ লক্ষণ বলে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্র থেকে দূরে রইলেও পরিষদ কেরলীয়দের সকলকে প্রতি বছর একই মঞ্চে নিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে একতার বীজ বপন করতো। সাহিত্য পরিষদ কেরলের সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য যেমন করেছে এমন আর কোনো সংগঠন করে নি।

ভারতের প্রধান প্রধান ভাষার কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিককে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ব'লে এর সভাপতিত্ব করতে আমি খুব খুশী হ'য়েছিলাম। প্রধান প্রধান ভাষাগুলির ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হ'লে ভারতের ঐক্য শিথিল না হয়ে তা দৃঢ় হবে বলে আমার ধারণা ছিল। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রদেশগুলিকে বেশী করে কাছে এনে ভারতীয় সংস্কৃতি আর সাহিত্যে অধিষ্ঠিত ভারতের ঐক্য সুদৃঢ় করার কথা আমি ভেবেছিলাম। তাই সাহিত্যিকদের এই সম্মেলনকে আমি এর একটা মুখ্য প্রতীক রূপে স্বাগত জানিয়েছিলাম।

আমার সভাপতির বক্তৃতায় রাজনৈতিক দলগুলির মত সাহিত্যিকদের দু'ভাগে ভাগ হয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে আমি সমালোচনা করেছিলাম। জ্ঞানগর্ভ এবং প্রেরণামূলক ভালো ভালো বই বহু সংখ্যায় বার করবার জন্য সব সাহিত্য সংগঠনগুলির ও প্রকাশকদের পরস্পরের সহযোগিতা দরকার বলে আমি বলি। পরিষদের কাজে কতকগুলি যুগোপযোগী সংস্কারের কথাও আমি বলেছিলাম।

এই সম্মেলনে সর্বদলীয় বহু লোক যে উৎসাহ নিয়ে এসে যোগ দিয়েছিল তাতে আমি

বিহ্বল হয়েছিলাম। সাহিত্যের উন্নতির জন্য কেরলীয়দের এই উৎসাহ যদি কেরলের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য থাকতো, একথা আমার মনে হচ্ছিল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই সহযোগিতা যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে থাকে তাহলে কেরলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারোর কোনো আশঙ্কা নেই। কেরলের দ্রুত উন্নতিতে সব মালয়ালীদেরই অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ বেশী করে ফুটে উঠছে বলে আমার মনে হলো। সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে যে উৎসাহ, ঐক্যবোধ দেখেছিলাম তা কেরলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে খুবই উৎসাহিত করেছিল।

1956 সালের 1লা নভেম্বর কেরল একটি প্রদেশ হিসেবে গঠিত হলো। এই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবগুলিতে এবং এর্নাকুলমের জনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এই সভায় বিরাট জনতার উৎসাহ আর আহ্লাদ আমাকে আবেগে ভরপূর করে তুলেছিল। শুধু কেরলে নয়, মালয়ালীরা যে যেখানে বাস করতো সেখানেই কেরল প্রদেশ গঠিত হবার আনন্দে তারা নানা উৎসবও সভার অনুষ্ঠান করেছিল। এই সব অনুষ্ঠানে এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য আত্মবিশ্বাসে ভরপূর এক জনতাকে আমি দেখেছিলাম।

ছেচল্লিশ

আমার কল্পনার কেরল

অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ একটা কাজের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করলে সেই পরিশ্রমই অসীম আনন্দ দেয়। আর যখন সেই কাজের লক্ষ্যে পৌঁছোই তখন আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। সেটা কিছুদিনের জন্য, কিন্তু এর পরই বিভ্রান্তি শুরু হয়। এর পর কি করতে হবে সেই চিন্তা মানুষকে বিচলিত করে। কেরল রাজ্য গঠনের সঙ্গে এই রকম একটা অবস্থার সম্মুখীন আমাদের হ'তে হলো।

কেরল প্রদেশ গঠিত হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? কেরলকে অভিবৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তার জন্যে কোন্ পথ আমরা অবলম্বন করবো? আমি এখানে কেরলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কি প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বলছি না। আমি বলতে চাইছি, এই কাজে সাহায্য করার মানসিক অবস্থা। আমাদের লোকেদের উৎসাহ যথেষ্ট আছে। দেশের সেবা করার ইচ্ছেও তাদের আছে। কিন্তু ঠিক কি করতে হবে তা জানতে না পেরে বেশীর ভাগ লোকই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাই প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। কি আমাদের করতে হবে সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার মনোভাব থাকা চাই। শুধু আগ্রহ থাকলেই হবে না। যতই আকর্ষণীয় হোক্ না কেন, প্রযত্নের দ্বারা পাওয়া সম্ভব না হলে সেরকম আগ্রহ না থাকাই ভালো। লক্ষ্যে নজর রেখে আমাদের এখন কাজ করা উচিত।

আজ যা দেখছি তার চেয়ে কত পৃথক আমার কল্পনার নতুন কেরল। আমার স্বপ্নের কেরলে দারিদ্র্য বেকারী, কিছুই থাকবে না। জীর্ণ বাড়ীঘর, ক্ষুধার্ত্ত মানুষ সেখানে থাকবে না। নতুন নতুন শিল্প, বড় বড় ব্যবসা, উন্নত মানের চাষের প্রথা কেরলের মুখ সম্পূর্ণ বদলে দেবে। এমন একটা গ্রাম থাকবে না যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সুন্দর সুন্দর বাগানে খেলায় মত্ত শিশুরা তাদের সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আমাদের মনে আনন্দ জোগাবে। শহরে, গ্রামে সব জায়গায়, পরিষ্কার ঝকঝকে বাড়ীঘর তাদের সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যে লোকের মন আকর্ষণ করবে। লোকেদের শিষ্ট ব্যবহার সকলকে আনন্দ দেবে। হাসপাতালের সংখ্যা এবং সেখানকার সুখসুবিধাগুলো বাড়বে, রোগীর সংখ্যা কমে যাবে। শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ

থাকবে না। কাজের শেষে অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ বদলে আমোদপ্রমোদে তারা যোগদান করবে। বিরাট বিরাট রাস্তায় এখানে ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বাসগুলো দৌড়োবে, তাদের মধ্যে ইউনিফর্ম পরিহিত প্রসন্নবদন কর্মীদের দেখতে কি সুন্দরই না লাগবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য এখানে ওখানে খাবার হোটেলগুলো একটা নতুনত্ব আনবে। অল্প দামে ভালো খাবার এখানে পাওয়া যাবে। সরকারী অফিসের নিয়মশৃঙ্খলা দেখে সকলে অবাক্ হ'য়ে যাবে। অফিসারদের মধ্যে জনসাধারণকে সাহায্য করার মনোবৃত্তি দেখে আশ্চর্য লাগবে। ভ্রমণকারীদের স্বর্গ বলে কথিত কেরলে অনেক কিছু দেখবার আছে। ভ্রমণকারীদের থাকার সুন্দর সুন্দর ট্যুরিস্ট লজগুলি অসংখ্য ভ্রমণকারীকে কেরলে আকৃষ্ট করবে। এই নতুন রাজ্যের আয়ের একটা বিরাট পথ খুলে যাবে। ভিক্ষুক অথবা ক্ষুধার্ত মানুষদের এখানে দেখা যাবে না। আমোদপ্রমোদ করার জায়গাগুলির সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। কত রকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এখানে থাকবে। এই সম্বন্ধে তিরুনাবাতে প্রতি বৎসর বিখ্যাত 'কেরল কলা উৎসবে'র কথা বলা যায়।

জনগণের প্রতিনিধি সভাটিও দেখার মত হবে। এই সভা-বাড়ীটির সৌন্দর্য শুধু যে দর্শকদের আকর্ষণ করবে তাই নয়, তার ভেতরে যে সভ্যরা বসবে তাদের পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ, জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, শিষ্ট ব্যবহার কেরল ষ্টেট অ্যাসেম্বলীর প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

এমনি ভাবে কল্পনায় দেখা সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতিপূর্ণ কেরল আমাদের লক্ষ্য। এর ভিত্তি একতা, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ একতা। এমনি ভাবে একটি কেরল আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

লক্ষ্য স্থির করে পথের আলোচনা করা যাবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছোবার পথে যে বাধা এসে উপস্থিত হবে তার কথাও চিন্তা করা উচিত। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জনকল্যাণের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। যারা অনেক কিছু ত্যাগ করে সমাজের উন্নতির জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে চায় তারাও অনেক সময় অন্যদের মতকে জানতে চায় না, তাদের উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা স্বীকার করতে চায় না। 'আমার', 'আমার বন্ধুদের', 'আমার জাতের' এই চিন্তা মন থেকে বিসর্জন দিয়ে আগে আমার 'দেশের' তারপর 'আমার' এই চিন্তা মনে স্থান দিতে হবে। ঐক্য কেরল হ'লে আমার কি লাভ হবে এই প্রশ্ন না তুলে ঐক্য কেরলের জন্য আমি কি করেছি এইটাই আমাদের প্রত্যেকের প্রশ্ন হওয়া উচিত। যে ধর্মের লোকই আমরা হই না কেন, যে রকম মতামত আমাদের থাকুক না কেন, দেশের লোকের স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে।

লক্ষ্যতে পৌঁছোতে হলে দরকার হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। শুধুমাত্র সামর্থ্য বা উৎসাহ থাকলেই হবে না। উদ্দিষ্ট কার্য সাধন করতে হ'লে চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। যে মানুষের আত্মবিশ্বাস আছে সে জয়লাভ করবেই। এক সময় ছিল যখন আমরা ভাবতাম যে আমরা চিরদিন বৃটিশের অধীনে থাকবো, সুখ আর স্বাধীনতা সাদা চামড়ার লোকেদের জন্য, আমাদের জন্য শুধু কষ্ট আর পরাধীনতা। এই কথাগুলো কিছুদিন আগেও আমরা ভাবতাম। কিন্তু এখন তা শুধু স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কি করে এটা সম্ভব হলো ? আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি বলেই কি নয় ?

আর একটা জিনিষেরও খুব দরকার। সেটা হচ্ছে এক হয়ে কাজ করবার মনোভাব। এক হ'য়ে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহ'লে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবো। দেশের ভালো করতে পারবো। যতই সামর্থ্য আর উৎসাহ থাকুক না কেন, অন্যদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতে না পারলে এই সব গুণ কোন কাজে দেবে না।

এর জন্যে চাই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা, সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো, একসঙ্গে কাজ করার মনোভাব এই চারটি গুণ নতুন কেরল প্রদেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দরকার।

ঠিক মতো নাগরিকত্ব বোধ এখনো জনসাধারণের মধ্যে জেগে ওঠে নি। একটা উচ্চ মর্যাদা দাঁড়িয়ে আছে তার সুযোগ্য নাগরিকদের ওপর। সংগঠিত পরিশীলন দ্বারা এই রকম নাগরিকদের তৈরী করা সম্ভব। নাগরিকদের কর্তব্য একটা মহান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করার শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া উচিত যা জীবনের সব দিককে স্পর্শ করতে পারে। এর জন্য নাগরিক পরিশীলন সঙ্ঘ দেশের সব জায়গায় যদি স্থাপন করা যায় তাহ'লে খুবই ভালো হয়। নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আবশ্যকমত চরিত্র গঠন করার দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

1. পড়াশুনো—গণতন্ত্রে ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণ প্রথমতঃ নিজে নিজে চিন্তা করতে শিখবে। নিজস্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হ'লে নিজস্ব জ্ঞান থাকা দরকার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এখানে শুধু বড় বড় নাগরিকদের কথা বলা হচ্ছে না। সাধারণ নাগরিক যাদের ভোট দেবার অধিকার আছে এবং যাদের নেই তাদের কথাই বলা হচ্ছে। নিয়মসভার সদস্যেরা, তার বাইরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্মীরা, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলের কাজের ব্যাপারেই এ কথা বলা হচ্ছে। আজকের জগৎ সম্বন্ধে তাদের সাধারণ একটা ধারণা থাকা উচিত। সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যা সম্বন্ধে তাদের অবহিত

থাকা উচিত। পড়াশুনা এ কথা বলতে বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে নাগরিকদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন, আইনসভার সভ্যদের নিজের নিজের কর্ত্তব্য কাজ করার জন্য এক বিশেষ ধরনের পড়াশুনো দরকার। সমস্ত কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারলেই তবে না অন্যদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। এমনি ভাবে জনগণের সাধারণ জ্ঞান, আর বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকা কর্মীদের তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা উচিত।

2. সাধারণ ব্যবহার—সাধারণ ব্যবহার বলতে কতকগুলো ভালো ভালো গুণের কথা বলা হয়েছে। এই ভালো গুণের একটা হচ্ছে অন্যের মনে সন্তোষ আর বিশ্বাস উৎপাদন করার মত ব্যবহার করা। কথা দিয়ে কথা রাখা, যে কাজের ভার নেওয়া হ'য়েছে সেগুলো করা, অন্যদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করা, অন্যায় না করা, মিছিমিছি গণ্ডগোল না করা, এই সব গুণগুলি একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিকের থাকা উচিত। চরিত্র গঠনের জন্য দরকার মতো নির্দেশ জনগণকে দেওয়া এবং এই ব্যাপারে তাদের ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার। পড়াশুনোর চেয়ে এই গুণগুলোর বেশী দরকার।

3. পরিচ্ছন্নতা—পরিচ্ছন্নতা বলতে শুধু দেহ শুদ্ধির কথা এখানে বলা হচ্ছে না। দেহশুদ্ধি অবশ্য খুবই দরকার। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়, বাস করার গৃহ এবং তার চারপাশ পরিষ্কার ও সুন্দর করে রাখতে হবে। গ্রাম ও শহরগুলোও পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্রামের লোকেরা যদি গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংগঠিত হয়ে কাজ করে তাহ'লে আমাদের দেশ কত সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে।

4. পোষাক পরিচ্ছদ—পোষাক পরিচ্ছদ শুধু মানুষের নগ্নতা ঢাকার জন্যেই নয়, তার সম্ভ্রম আর মর্যাদা বাড়াবার জন্যেও দরকার। এখনকার পোষাক পরিচ্ছদ দেখলে অসহ্য লাগে। ভালো পোষাক পরিচ্ছদ বলতে পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদের কথাই লোকে ভাবে। পোষাক পরার একটা রীতি আমাদের দেশে বহু পুরাতন কাল থেকে চলে আসছে। সম্প্রতি এটার চলন উঠে গেছে। কি অবস্থায় কোন পোষাক পরা উচিত এ কথা লোকে যেন ভুলেই গেছে। আজকাল যা খুশী পোষাক পরে যেখানে খুশী যাওয়া একটা ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যুবকেরা, বয়স্কেরা সকলেই এই ব্যাপারে একই ভাবে দোষী। আমাদের আইনসভাগুলোয়, সরকারী অফিসগুলোয় অনেকে এমন পোষাক পরে আসে তাতে আমাদের জাতীয় মর্যাদা বাড়ে তো না-ই, উপরন্তু নেমে যায়। অফিসের পোষাক জমকালো হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রুচির পরিচয় দেয়। এটাও আমাদের সংস্কৃতির একটা দিক।

5. স্বাস্থ্য—শরীরের সৌন্দর্য ও শক্তি বাড়াবার জন্য দরকার মতো ট্রেনিং যুবকদের

দেওয়া উচিত। যুবকেরা সাধারণতঃ ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় অতিমাত্র উৎসাহশীল। কিন্তু শুধু খেলায় শরীরের সৌন্দর্য বাড়ে না। এর জন্য বিশেষ পরিশীলনের দরকার। মনের নির্মলতা যেমন দরকার তেমনি দরকার দেহের সৌন্দর্য আর শক্তি। পুরানো দিনে মালাবারের কালারিপায়ট্ মালাবারের প্রাচীন সামরিক ব্যায়াম চর্চা আগে এতে অনেক সাহায্য করতো। যদি এই ব্যায়াম চর্চাকে আবার দেশের সর্বত্র বিপুলাকারে প্রবর্ত্তন করা যায় তাহ'লে দেশের যুবকদের খুবই উপকার হয়। পনের বছর পূর্ণ হবার আগেই ছেলেমেয়েদের দেহের সৌন্দর্য ও শক্তি বাড়াবার জন্য এই ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন সংগঠিত করা উচিত।

6. আমোদ প্রমোদ—আজকাল গ্রাম্য জীবন অত্যন্ত নীরস, প্রাণহীন। আমোদ প্রমোদের সুযোগসুবিধা গ্রামের লোকেদের মেলে না বল্লেই হয়। আগেকার দিনে গ্রামের নানা ধরনের খেলার চল ছিল। উৎসব অথবা বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে আমোদ প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা ছিল। আজকাল সে সব উঠে গেছে। তার জায়গায় অন্য রকম আমোদ প্রমোদেরও প্রচলন হয় নি। পুরানো আমোদ প্রমোদ-গুলিকে আবার ফিরিয়ে এনে তার সঙ্গে নতুন আমোদ প্রমোদের প্রচলন করে আমাদের যুবক যুবতীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়ে তোলা উচিত।

7. সেবা পরিচর্যা—মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের কাছ থেকে যে সুখ-সুবিধা সে পায় তার জন্য সমাজের ওপর কতকগুলো কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্যগুলি তার করা উচিত। এক ভাবে না হলেও বিভিন্ন ভাবে সমাজের উপকার করার ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। এমনি ভাবে আমরা যদি সমাজের উপকার করতে পারি তাহ'লে আমরা সত্যি করে সুখী হ'তে পারি। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা বলে গেছেন আমরা যেন পরের উপকারের জন্য আমাদের জীবন অর্পণ করি। যে কোনও লোকের পক্ষেই সমাজের কিছু উপকার করা সম্ভব।

রাজা আলফ্রেডের কথা এখানে মনে পড়ছে। তিনি তাঁর প্রচুর ঐশ্বর্য জনগণের সেবায় ব্যয় করেছিলেন। লোকেদের শিক্ষার মান উঁচু করার জন্য অন্য ভাষা থেকে বই তিনি অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর প্রজাদের সেবাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গান্ধীজীর জীবনে সেই একই জিনিষ দেখতে পাই। যেমন তেমন করে বেঁচে থাকাটা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। জীবন সুখের হবে, আবার তা অন্যের কাজেও লাগবে, এর জন্য প্রয়োজন পরের উপকার করা। আমাদের জীবনের কিছু সময় জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করা উচিত। তাতে আমাদের ক্ষতি না হ'য়ে উপকার হবে।

ওপরে আমি যা বল্লাম তা ট্রেনিং দেবার জন্য সারা রাজ্য জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলা

দরকার। প্রত্যেক লোকের বয়সানুযায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। মেয়েদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া দরকার। যদি এগুলো করা যায় তাহলে দেশের এক অদ্ভুত পরিবর্তন হবে। অবশ্য এই সব ব্যবস্থা চিরদিনের জন্য নয়, অথবা প্রত্যেকের জন্য এক ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এগুলো সময় ও সুযোগ মত বদলানো দরকার। নিকট ভবিষ্যতে কোনো কোনো ব্যাপারে কি কি করা দরকার সেই বিষয়েই এখানে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তাই সমস্ত কাজের পেছনে কাজ করছে। অন্যদের চিন্তার ফলে আমরা আজকের সুখ-সুবিধাগুলো অনুভব করছি। সৃষ্টিধর্মী চিন্তা মানুষকে কর্মোন্মুখ ক'রে তোলে। এই চিন্তাই আমাদের বাঁচার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। আমি এখানে দিবাস্বপ্ন দেখার কথা বলছি না। আমি বলছি সৃষ্টিধর্মী চিন্তার কথা যা আমাদের প্রেরণা জোগায়। আগে যেমন বলেছি তেমনি ভাবে যদি নাগরিক পরিশীলন সঙ্ঘ কেরলে গড়ে তোলা যায় তাহ'লে তাতে দেশের অদ্ভুত পরিবর্তন হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এটা কি পরীক্ষা করে দেখা যায় না?

পঁচিশ শ' বছর আগে গ্রীসের দার্শনিক ও নীতি প্রচারক পিথাগোরাস একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সঙ্গে তার দেশের কি রকম সম্পর্ক হওয়া উচিত তা বলেছেন। দেশ, মাতা-পিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ; স্বামী, স্ত্রীর চেয়েও প্রিয়তর। সন্তান, আত্মীয়-স্বজন থেকেও নিকটতর। দেশ সকলের মাতা-পিতা। দেশ স্বামীর কাছে স্ত্রী, স্ত্রীর কাছে স্বামী। দেশ একটি পরিবার। স্ত্রী এবং সন্তানের কাছ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা কত পবিত্র। কিন্তু তার চেয়েও মহত্তর, পবিত্রতর দেশ, কারণ দেশ সকলকে রক্ষা করে। দেশই আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে একটি পরিবারকে রক্ষা করে। সন্তানের কাছে নিজের মায়ের সম্মান কত মূল্যবান। তেমনি ভাবে একজনের শিশু সন্তানের মা, তার পত্নীর মানও সেই মানুষটির কাছে অমূল্য। কিন্তু এই স্ত্রী আর বাচ্চাদের রক্ষা করে যে দেশ সে দেশের সম্মান স্ত্রী-পুত্রের চেয়েও আরো কত মূল্যবান। আমাদের জীবনকে ধনেধান্যে ভরিয়ে তোলে আমাদের দেশ। দেশই আমাকে রক্ষা করে, আমাকে শান্তির ছায়া দিয়ে ঘিরে থাকে। দেশই মানুষকে বর্বর থেকে সভ্য করে তোলে। দেশই মানুষকে মানুষ হিসেবে তৈরী করে। সংস্কৃতিবান মানুষ দেশ থেকেই জন্ম নেয়। যদি অসম সাহসী ব্যক্তিরা নিজের গৃহ নিজের পরিবারের জন্য হাসিমুখে মরণ বরণ করতে পারে, তাহ'লে তারা দেশের জন্য তার চেয়েও বেশী করে তাদের জীবন বলি দিতে এগিয়ে আসতে পারবে।

সাতচল্লিশ

একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত

কেরল প্রদেশ গঠিত হবার পর আমার মনে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিরাট আশা জেগেছিল। কেরলীয়দের বিদ্যা, বুদ্ধি, কাজ করার তৎপরতা সব কিছুই আছে। যদি উৎসাহের সঙ্গে তারা কাজ করে তাহলে ভারতে অন্যান্য রাজ্যগুলোর সামনে কেরল আদর্শ ষ্টেট হিসেবে গড়ে উঠতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমি যা আশা করেছিলাম তেমনি ভাবে কেরলের উন্নতি হয় নি, উপরন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে অনেক খারাপ ঘটনা, অনেক অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা দেখার দুর্ভাগ্য আমার হ'য়েছে। তবু কেরল প্রদেশের সংগঠন যে কেরলীয়দের কিছু ভালো করে নি সে কথা আমি বলি না। আমরা যদি কিছু ভুল করে থাকি তাহ'লে সেগুলো শুধরে দেশের উন্নতির পথ সুগম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

কেরল ষ্টেট্ গঠিত হবার কিছু পরেই ত্রিবান্দ্রামে বিরাট একটা আন্দোলন শুরু হলো। এটা শুরু হলো ওখানকার হাইকোর্টের বেঞ্চ নিয়ে। ত্রিবাঙ্কুর আর কোচীন একসঙ্গে যুক্ত হবার পর নতুন ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন ষ্টেটের রাজধানী হ'য়েছিল ত্রিবান্দ্রাম, আর হাইকোর্ট এর্নাকুলমে রাখা হবে বলে ঠিক হয়। কেস ফাইল করার ক্ষমতা দিয়ে হাইকোর্টের একটা বেঞ্চ ত্রিবান্দ্রামে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেরল ষ্টেট গঠিত হবার পর ত্রিবান্দ্রামের এই বেঞ্চের ফাইলিং অধিকার তুলে নেবার সিদ্ধান্ত হলো। আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টেরও বেঞ্চ বিভিন্ন জায়গায় রাখাটা ঠিক নয় বলে এই আন্দোলন সমর্থন করা যায় না বলে মাতৃভূমি মত প্রকাশ করে। মাতৃভূমির এই অভিমত ঠিক না ভুল সে প্রশ্ন এখানে উঠছে না। আন্দোলনের নেতারা যে পথ অবলম্বন করেছেন তা একেবারে ভুল মাতৃভূমি এই মত খোলাখুলি প্রকাশ করেছিল। এতে আন্দোলনকারীদের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তারা মাতৃভূমির ত্রিবান্দ্রাম অফিস আক্রমণ করলো।

এই আন্দোলন প্রায় দু'মাস ধরে চলেছিল। ইতিমধ্যে কতকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ঘটে গেল। কেরল নিয়মসভার প্রথম অধিবেশন না বসা অবধি আন্দোলন বন্ধ রাখা হবার খবর শুনে আমরা সকলেই খুব আশ্বস্ত হ'লাম।

হাইকোর্টের বেঞ্চের জন্য আন্দোলন শেষ হবার পরই নির্বাচনের হট্টগোল শুরু

হলো। ষ্টেট্‌গুলির পুনর্গঠনের পর এই প্রথম নির্বাচন হচ্ছে। বিভিন্ন দলগুলি এই নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা করেছিল। 'মাতৃভূমি' কংগ্রেসের আদর্শকে সব সময় সমর্থন করতো বলে কংগ্রেস যাতে ক্ষমতায় আসে সেইটাই মাতৃভূমি চেয়েছিল। কিন্তু জাতীয় পত্রিকা হিসাবে মাতৃভূমি অন্যান্য দলগুলির বক্তব্যও ছেপে বার করেছিল। এমন করাটা ঠিক নয় বলে কিছু কংগ্রেস নেতা কাগজে তাদের মতামত প্রকাশ করলে অন্য দলের নেতারা আবার তার প্রতিবাদ করেছিল। মাতৃভূমি কংগ্রেস দলকে খুব সাহায্য করেছে বলে কংগ্রেস সভাপতি দেবর আমাকে একবার বলেছিলেন। নির্বাচনের ফল বার হ'লে পর কেউ কেউ খুব আশ্চর্য হলো। কেউ কেউ আবার খুব হতাশও হলো। কম্যুনিস্টরা এই নির্বাচনে 60টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কংগ্রেস পায় 43টি, পি. এস. পি 9টি, মুসলিম লীগ 8 আর স্বতন্ত্র পায় 6টি আসন। স্বতন্ত্রদের মধ্যে পাঁচজন কম্যুনিস্টদের সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করলো। একজন মনোনীত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যকে নিয়ে কেরল বিধানসভায় 127 জন সদস্য ছিল। এই অবস্থায় আমাদের এখন কি কর্তব্য সেই সম্বন্ধে মাতৃভূমি একটা সম্পাদকীয়তে তার বক্তব্য বলেছিল। তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

…কেরলে কেমন সরকার গঠন করা হবে সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই। ভারতের সংবিধানের ভিত্তিতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ভারতবর্ষ স্বীকার করে নিয়েছে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মানে যারা বোঝে এবং তার ওপর বিশ্বাস রাখে, কেরলের নির্বাচনের ফলাফল তাদের সকলের আশা মত না হ'লেও তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা করার নেই। নির্বাচনের ফলে কম্যুনিস্টরা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তাই এই দল কেরলের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করবে সেটা গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার। কম্যুনিস্টরা তাদের সমর্থনকারী অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে মিলে কেরলে একটি সরকার গঠন করবে, এটা আজকের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সহজ।

এই মতের সঙ্গে মিলিয়েই মাতৃভূমি এর পরে তার পথ অবলম্বন করে। এতে কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন বড় বড় নেতা নিন্দে করেন।

কম্যুনিস্ট সরকারের কাজকর্ম নিন্দাজনক হ'লে মাতৃভূমি তাদের কঠিন ভাবে সমালোচনা করতে পিছু পা হয় নি। এরকম সমালোচনা তারা বহুবার করেছে। এতে কম্যুনিস্ট পার্টিরও মাতৃভূমির ওপর রাগ বেড়ে গেল।

কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একদলের চিমটিকাটা কথাবার্তা আর কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা সহ্য করে মাতৃভূমি তার আদর্শ উঁচু করে ধরে রাখতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কাজটা অত সহজ হয় নি! কিন্তু তাহলেও আমি ঠিক করেছিলাম, মাতৃভূমির আদর্শ থেকে বিচ্যুত

হবো না। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই সময় বলেছিলেন যে আমার সমর্থন নাকি কম্যুনিস্টদের দিকে। কম্যুনিস্ট আদর্শের সঙ্গে আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই। কিন্তু পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র স্বীকার করে নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে সেই দল কম্যুনিস্ট বা যে কোন দল হোক, তাদের শাসনব্যবস্থা অনায়াসে চালিয়ে নেবার সবরকম সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া উচিত। এইটুকু রাজনৈতিক শিষ্টতা বিরোধী দলদের দেখানো উচিত। মাতৃভূমি তখন অনেক দায়িত্বশীল নেতাদের কাছে এই আবেদনই জানিয়েছিল। তবে আমার মতের সঙ্গে মাতৃভূমি কাগজের মালিকদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ছিল সেকথা আমি বলতে পারি না। আমি শুধু আমার চোখের সামনে যে আলো দেখেছি তাতেই চলেছি।

শুধু কাগজের ব্যাপারেই এই সব গোলমাল এসময় আমাকে বিচলিত করে নি। কেরলে যে নতুন গণতন্ত্রের চলন হচ্ছিল তা আমাকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। এসময় এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার আমাদের দেশের ভালোর জন্যে কিনা, আমার সন্দেহ হয়। প্রকৃত শিক্ষা আর শৃঙ্খলা ছাড়া গণতন্ত্রের প্রচলন দেশে বিপদ আর অরাজকতা টেনে আনে ব'লে আমার ভয় হ'য়েছিল। খুব সামান্য সামান্য কারণে রাজনৈতিক দলগুলির সত্যাগ্রহ আর অনশন ব্রত, ছাত্রদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাওয়া, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা না মানার একটা প্রবণতা দেখে আমার এই মত আরো সুদৃঢ় হলো। স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের স্বভাবচরিত্রের আরো উন্নতি হওয়া উচিত। এর জন্য সংগঠিত ভাবে কি আমরা কোনো কাজ করেছি, না করছি? এমনি ভাবে অনেক কিছু সন্দেহ, অনেক কিছু দ্বিধা আমার মনে দেখা দিয়েছিল। আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। সব কিছুরই একটা পথ বার হবে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মনোভাব আমার ছিল না। আজ দেশের এই যে অবস্থা হ'য়েছে তার জন্যে কাকে দোষ দেব? কাউকে দোষ দেবার প্রয়োজনই বা কি? এই সব দোষ দূর করার দায়িত্ব আমারও কি নেই? এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য আমার কি করা কর্ত্তব্য এই প্রশ্ন যখন আমি নিজেকে করলাম তখন তার সন্তোষজনক কোনো উত্তর পেলাম না। আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি নি এই অপরাধ বোধ মনে নিয়ে আমার এখন কর্ত্তব্য কি বুঝতে না পেরে আমি দিনের পর দিন অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটাচ্ছিলাম।

আটচল্লিশ

কিছু প্রচেষ্টা

এই সময় কতকগুলি কারণে আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলাম। শুধু রাজনীতির কাজ নয়, রাজনৈতিক সভাগুলোতে যোগ দেবার উৎসাহ পর্যন্ত কমে যাচ্ছিল, দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল সেইটেই হয়তো এর কারণ। অন্যদের মতের সঙ্গে আমার মত না মিললেও সে মতামতকে শ্রদ্ধা করার মনোভাব ছোটবেলা থেকেই আমার মনে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্প্রতি কাগজে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের রীতি এবং তার ভাষা আমার অত্যন্ত অরুচিকর বলে মনে হ'য়েছিল, দেশের অবস্থা বদলেছে, কিন্তু মানুষের রুচি বদলায় নি। তা সে যাহোক, এই সময় রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার আগ্রহ আমার মধ্যে বেড়ে উঠছিল। রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য আরো কয়েকটি ক্ষেত্রেও কাজ করবার সুযোগ আমি পাই।

দক্ষিণ ভারত ভাষা বুক ট্রাস্টের কাজে এই সময় আমি নিজেকে যুক্ত করি। এই ট্রাস্ট 1955 সালে স্থাপিত হয়। তামিল, তেলুগু, কানাড়া, আর মালয়ালম এই চারটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার ভালো ভালো বই অল্প দামে ছাপিয়ে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে এই ট্রাস্ট আরম্ভ করা হয়। ট্রাস্ট এর জন্যে আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য লাভ করে। বই প্রকাশের ব্যাপারে ট্রাস্টকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেকটি ভাষার একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করা হ'য়েছিল। মালয়ালম বোর্ডের চেয়ারম্যান আমি ছিলাম। প্রায় দুশ' বই বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় ট্রাস্ট প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে চল্লিশটি বই মালয়ালম ভাষায়।

কেরল সাহিত্য আকাদেমির কার্যকরী সভাপতি হিসেবে বেশ কিছুদিন আমি কাজ করেছিলাম। আকাদেমি 1956 সালে সর্দার কে. এম. পাণিক্করের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়েছিল। সর্দার পাণিক্কর ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত হ'য়ে যাবার পর আকাদেমির কোনো স্থায়ী সভাপতি ছিল না ব'লে কেরল সরকার আমাকে এর সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করলে পর আমি 1957 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেরল সাহিত্য আকাদেমির কার্যকরী সভাপতির পদ গ্রহণ করি। কেরলের কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক আকাদেমির সভ্য ছিলেন। আকাদেমির অফিস ত্রিবান্দ্রাম থেকে ত্রিচূরে নিয়ে আসা

হলো। আকাদেমির কাজ বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলছিল। প্রায় দু'বছর কার্যকরী সভাপতি থাকার পর আমি এই পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কেন আমি পদত্যাগ করি তার জন্য একটা বিবৃতি আমি তখন দিয়েছিলাম। তারই কিছু এখানে তুলে দিচ্ছি :

—আকাদেমির কার্যকরী সভাপতির পদ গ্রহণ করার পর আমি এর দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্যে, সেক্রেটারীকে সাহায্য করার জন্যে এবং অফিসের কাজ চালানোর জন্যে রেভিনিউ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ অফিসারকে আমার সুপারিশে সরকার নিযুক্ত করে।

কয়েকমাস পরে আগে থেকে আকাদেমিকে কিছু না জানিয়ে এই অফিসারকে আবার রেভিনিউ বিভাগে ফিরে যেতে এবং অন্য আর একজন নতুন লোককে তার জায়গায় নিযুক্ত করে সরকার থেকে একটা অর্ডার আকাদেমির সেক্রেটারীর হাতে আসে। নতুন একজন লোককে নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকারের একবার আকাদেমির মত চাওয়া উচিত ছিল। এই সামান্য ভদ্রতাটুকু না দেখিয়ে আকাদেমির কাজকর্মের ব্যাপারে আকাদেমির মতামত না নিয়ে একজন নতুন অফিসারকে নিয়োগ করা খুবই অন্যায় কাজ। সরকারের সাহায্য লাভ করলেও আকাদেমি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। এর নিজের কাজ করবার স্বাধীনতা আছে। আকাদেমির মত না নিয়ে তার কাজে নিযুক্ত একজন অফিসারকে বদলে আর একজনকে নিযুক্ত করা আকাদেমির পক্ষে খুবই অপমানজনক।

এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে তার সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। আকাদেমির মত একটা সংস্থার ওপর সরকারের কতকগুলো মৌলিক ভদ্রতা দেখানো উচিত। সেইটে দেখানো হয়নি বলে এই অভিযোগ এখানে করা হচ্ছে।

1লা মার্চ আকাদেমির কার্যকরী সমিতি এবং সাধারণ সমিতি তাদের এক মিলিত সভায় সরকারের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করে। সরকারের এই অর্ডারকে আর একবার ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না।

কেরল সাহিত্য আকাদেমিকে খুব একটা ভালো সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার আগ্রহ নিয়ে আমি এর কার্যকরী সভাপতির পদ গ্রহণ করি। তাই প্রথম থেকেই কোনো গোলমালের সৃষ্টি না করে এর কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য আমার ছিল। কিন্তু আকাদেমির ওপর সরকারের মনোভাব দেখে তার সঙ্গে আমার আদর্শের মিল রেখে আন্তরিক ভাবে কাজ করা আমার পক্ষে মুশকিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই

অবস্থায় আকাদেমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।

এমনি ভাবে আকাদেমির কার্যকরী সভাপতির পদ আমি ত্যাগ করলাম। তবে একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে আকাদেমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি।

এখানে [1]'তুঞ্চন স্মারক সমিতি' আর [2]'ভল্লতোল স্মারক সমিতি' সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। তিরূরের কাছে তুঞ্চনের বাড়ীতে উচিত মত একটা স্মারক চিহ্ন করার জন্য 1955 সালে 'তুঞ্চন স্মারক সমিতি' গঠন করা হয়।

স্মারক তৈরী করবার জন্য সমিতি টাকা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেও জায়গা কিনে বাড়ী করার মত টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সরকারের সাহায্য ছাড়া এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে কমিটি তখন কেরল সরকারের সম্মুখীন হয়। মুখ্যমন্ত্রী পট্টম থানু পিল্লা এবং অর্থমন্ত্রী আর. শঙ্কর এই ব্যাপারে সকল রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর ফলে 1964 সালের 15ই জানুয়ারী স্মারক উদ্‌ঘাটন্ করা হয়। এই স্মারকের কাজকর্মের জন্য সরকার 1965 সালে একটা কমিটি গঠন করে। সরকারের অনুরোধে আমি এই কমিটির সভাপতি হ'য়েছিলাম।

তুঞ্চনের স্মৃতিতে শুধু একটা স্মারক চিহ্ন তৈরী করে সেখানেই সব কাজ শেষ করতে আমার মন চাইল না। আমি চেয়েছিলাম একটা ভালো ক্ল্যাসিকাল লাইব্রেরী গঠন করতে। তুঞ্চনের সব বই ছাড়া, মালয়ালম ও সংস্কৃতের ভালো ভালো বই এখানে সংগ্রহ করে রাখা হবে। গবেষণার জন্য শান্ত পরিবেশে গ্রন্থ-রচনার সুযোগও এখানে থাকবে। তার জন্য যে সব পণ্ডিত এবং লেখকেরা এখানে আসবেন তাঁদের থাকবার সুবিধা করে দিতে হবে। মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সভা ডাকা হবে। অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক এখান থেকে ছেপে বার করা হবে। এখানে একটি সুন্দর বাগান করতে হবে, যাতে এই স্মারক চিহ্নের সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। শুধু কেরল নয়, ভারতবর্ষের নানা দিক থেকে ভ্রমণকারী, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকেরা এখানে আসবেন এবং এই তুঞ্চন স্মারক তখন ভারতের একটি তীর্থক্ষেত্রের মত হ'য়ে দাঁড়াবে।

ভল্লতোল স্মারক কমিটির কাজকর্মও বেশ ভালো চলছিল। 1958 সালের 13ই মার্চ মহাকবি ভল্লতোল মারা যান। এর এক মাসের মধ্যে একটি সভা ডেকে ভল্লতোল স্মারক কমিটি গঠন করা হয় এবং আমাকে তার সভাপতি করা হয়। আমরা প্রায় 12500 টাকা তুলেছিলাম। এই টাকাটা কেরল বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে কলা বা

---

(১) মালয়ালম ভাষার পিতা। (২) কেরলের মহাকবি।

সাহিত্যের ওপর এক বছর অন্তর ভল্লতোল মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় এতে রাজী হয়। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও'র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর ভি. কে. মেনন 1966 সালে ত্রিবান্দ্রামে প্রথম ভল্লতোল মেমোরিয়াল বক্তৃতা দেন।

আর একটা মেমোরিয়ালের কথাও এখানে বলা উচিত। তা হচ্ছে মান্নারকাট্ কৃষ্ণন্ পরিবার সাহায্য ফাণ্ড। মাতৃভূমি এই ফাণ্ড আরম্ভ করেছিল।

1957 সালের 28শে নভেম্বর মান্নারকাটে কৃষ্ণন্ নামে একজন লোক তার প্রতিবেশী একজন মুসলমানের জ্বলন্ত বাড়ী থেকে তার দুটো বাচ্চার প্রাণ রক্ষা করে। এই কাজে কৃষ্ণন্ তার জীবন হারায়। কৃষ্ণনের মা, স্ত্রী এবং দু'টি বাচ্চা ছিল। কৃষ্ণনের দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করার জন্য মাতৃভূমি দেশের লোকের কাছে আবেদন জানালো এবং "মান্নারকাট্ কৃষ্ণন্ পরিবার ফাণ্ড" বলে একটা ফাণ্ড খুললো। এক মাসের মধ্যে 23,385 টাকা সংগ্রহ হলো। এই টাকাটা তখনকার কেরল গভর্নর ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও এই জনসভায় কৃষ্ণনের পরিবারের হাতে তুলে দেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা সংগ্রহ করা একটা মনে রাখার মত ঘটনা।

কালিকট্ হাসপাতালের রোগীদের সুখসুবিধার জন্য এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের সাহায্য করার জন্য "কালিকট্ হসপিটাল অ্যামিনিটিজ্ ফাণ্ড অ্যাসোসিয়েশান" নামে 1956 সালে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার ফলে কালিকট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একটা ডিপ্ এক্সরে প্ল্যাণ্ট্ ও একটা কার্ডিয়োগ্রাম দান করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এখনো চলছে।

এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান কালিকট্ মানসিক হাসপাতালের রোগীদের সাহায্যের জন্য সম্প্রতি স্থাপন করা হয়েছে। এর সভাপতি আমি। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার ফলে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটা বাড়ী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

উনপঞ্চাশ

চোখের চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে

আমার চোখের দৃষ্টি যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে আসছে সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে 1954 সালে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পড়াশুনা আমি বন্ধ করি নি। শুধু রাতে পড়তে অসুবিধা হ'লে কাউকে দিয়ে পড়াতাম। আমার বন্ধু ডক্টর পি. বি. মেনন মাঝে মাঝে আমার চোখের চিকিৎসা করতেন। এর তিনবছর পরে কালিকট্ হাসপাতালে বাঁ চোখের অপারেশন করাই। এতে কিন্তু আমি আশানুরূপ ফল পেলাম না। খুব ঝাপসা দেখতাম। এর পর ডান চোখেও যখন অন্ধকার দেখতে লাগলাম তখন আমার দরকারী কাজকর্ম করা, ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ানো, সব কিছু কষ্টসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এত সত্ত্বেও ভোরবেলা উঠে লেখার অভ্যাস ছাড়ি নি। যা লিখতাম তা ভাল করে দেখতে পেতাম না। কাগজটা শুধু স্পষ্ট দেখতে পেতাম। তারপর আমার নাতনীদের কাউকে দিয়ে লেখাটা পড়াতাম। পড়ানোর পর দরকার মত কাটাকুটি করতাম। এমনি অনেকদিন ধরেই চলছিল। একদিন সকালে নিয়মমতো বেশ কিছু লিখে তা পড়ে শোনাবার জন্যে আমার নাতনী নলিনীকে ডাকলাম। সে কাগজটা হাতে নিয়ে খুব আশ্চর্যের স্বরে বলল—"দাদামশায়, তুমি তো এতে কিছু লেখ নি?" আমার কলমে যে কালি ছিল না তা আমি জানতে পারি নি। আমি একটু হাসলাম। এর পরে ভোরে উঠে লেখার অভ্যাস আমাকে ছেড়ে দিতে হ'ল। তবে অফিসে যাওয়া তখনো আমি বন্ধ করিনি, সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। নিজে পড়ার বদলে কাউকে দিয়ে পড়াতাম, লেখার বদলে কাউকে দিয়ে লেখাতাম। এমনি ভাবে আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাচ্ছিলাম।

1956 সালে এর্নাকুলমে সাহিত্য পরিষদের জুবিলী উৎসবে অধ্যক্ষতা করার সময়ে আমার বক্তৃতা আমি নিজে পড়তে পারলাম না ব'লে আমার খুব কষ্ট হ'য়েছিল। ডান চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলে পর আমি প্রায় একরকম অন্ধের মত দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার অবস্থা অনেকে জানতো বলে সভাসমিতিতে অথবা আমার চলাফেরা করার সময় খুব শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে তারা আমার সঙ্গে ব্যবহার করতো। এর জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ডান চোখটা অপারেশন করার সময় এলে পর আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আমাকে

লণ্ডনে গিয়ে এই অপারেশন করাতে পরামর্শ দিলেন। লণ্ডনে সব খোঁজ খবর নিয়ে আমি লণ্ডনে যাওয়া ঠিক করলাম।

লণ্ডনে আমাকে চার মাস থাকতে হবে। তদনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা আমি করলাম। আমার অনুপস্থিতিতে মাতৃভূমির সম্পাদকের পদ নিতে মাতৃভূমির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ ভি. এম. নায়ার রাজী হলেন। মাতৃভূমির পরিচালনা তাঁর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। লণ্ডনে যাবার, চিকিৎসা করাবার, থাকার জন্য টাকা সংগ্রহ করার ভাবনা আমাকে এবার চিন্তিত করে তুললো। আমার নানারকম অভিজ্ঞতা থেকে এতটুকু শিক্ষা হয় নি। টাকা জমানো বা খরচ কমানো এরকম একটা চেষ্টা আমার মধ্যে ছিল না বল্লেই হয়। আমার এই স্বভাব যে খুবই খারাপ তা বুঝলেও এতদিনের স্বভাব আমি বদলাতে পারি নি।

লণ্ডনে আমার সঙ্গে আর একজন লোকের থাকার খুবই দরকার ছিল। হিসেব করে দেখা গেল যে প্রায় 20000 টাকা চাই। চার মাসের মাইনে অগ্রিম নিলেও আরো অনেক টাকা জোগাড় করতে হয়। সিঙ্গাপুর থেকে আমার ছেলে উন্নি কিছু টাকা পাঠালো। মাতৃভূমিও কিছু সাহায্য করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরো পাঁচ হাজার বাকী রইলো। এই পাঁচ হাজার টাকা কি ভাবে জোগাড় করবো ভেবে আমি যখন খুব চিন্তায় আছি তখন খবর পেলাম যে কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমি 1956, '57 আর '58 সালে লেখা সব চেয়ে ভালো মালয়ালম বই "ফেলে আসা দিনগুলি"-র জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। খবরটি শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। এমনি ভাবে চোখের চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় হলো।

1959 সালের 26শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমির বিশেষ এক সভায় আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

দিল্লী থেকে ফিরে আমি 8ই মার্চ মাদ্রাজ থেকে লণ্ডন রওনা হই। সঙ্গে আমার জামাই করুণাকর মেনন ও ডাক্তার পি. বি. মেননও ছিলেন। পরের দিন রাত দশটায় লণ্ডনে পৌঁছোলাম। 1915 সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি ব্যারিষ্টার হ'য়ে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে এসেছিলাম। 44 বছর পরে আবার লণ্ডনে এলাম।

লণ্ডন এয়ারপোর্টে অপেক্ষমান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমি আমার বাসস্থান Y. M. C. A-তে গেলাম। সেখানে দশ দিন থাকার পর আমি মুরফিল্ড্ আই হস্পিটালে ভর্তি হলাম। এটি চক্ষু রোগ চিকিৎসার একটি বিখ্যাত হাসপাতাল। ডঃ স্টেলাড এখানে আমার ডান চোখের অপারেশন করেন। ডঃ স্টেলাড বিদগ্ধ চক্ষু চিকিৎসক। তিনি আমার ডান চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে অপারেশনের পর আমি স্পষ্ট দেখতে

পাব। অপারেশনের দশদিন পরে যখন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল তখন আলো দেখতে পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম। চশমা নেবার আগে চোখ আর একবার পরীক্ষা করতে হবে বলে ডাক্তার বল্লেন।

চোখ পরীক্ষা করার দিন আমার অপারেশন করা ডান চোখটা ডাক্তার প্রায় আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাকে বল্লেন—মিঃ মেনন, আপনার আশাভঙ্গ করতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি যে রকম ভেবেছিলাম ফল ততটা আশাপ্রদ হয় নি। আর একটা বড় অপারেশন করতে হবে, আর তা এক মাসের মধ্যেই করতে হবে। তার জন্য তিনঘণ্টা আপনাকে অজ্ঞান করে রাখা হবে। অপারেশনের পর দু'সপ্তাহ একটুও নাড়াচাড়া না করে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। এখন আপনি কি করবেন ঠিক করুন।

—তাতে কি আমি সম্পূর্ণ ভাবে আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাব?

—সেটা ঠিক বলতে পারছি না। তবে আর একটু বেশী দেখতে পাবেন সেটা ঠিক। ডাক্তারের কথা শুনে আমি খুবই বিচলিত হলাম।

"একটু ভেবে দেখি" বলে আমার ঘরে ফিরে গেলাম। বিছানায় শুয়ে রাজ্যের চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরলো। জানলার বাইরে আলোর প্রকাশ দেখতে পেয়ে খুশী হলেও এত বড় একটা অপারেশনের পর এইটুকু মাত্র দেখতে পাচ্ছি এটা ভেবেও খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলছিলাম। মনকে কতরকম ভাবে প্রবোধ দিলাম। কিন্তু কোনো লাভ হ'ল না। সময় কেটে যাচ্ছে, আর আমার মনের অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম।

হতাশায় আমার সারা মন ভরে গেল। মনে হচ্ছিল আমি যেন ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঈশ্বর প্রার্থনা আর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম।

বুলবুল পাখীর কিচিমিচি, রাস্তায় যানবাহনের শব্দ, নার্সের আশ্বাসজনক কথাবার্তা কিছুই আমার কানে যাচ্ছিল না। খানিকক্ষণ পরে করুণাকর মেনন এবং ডক্টর পি. বি. মেনন হাসপাতালে এলে পর আমি তাঁদের ডঃ ষ্টেলাডের কথা বল্লাম। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করলেও ফল কিছুই হ'ল না। আমার মন তখন ভীষণ অস্বস্তিতে ভরে গেছে। সেদিন সারা দিন আমি ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে পর আমি সাধারণভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লাম। আমার মনের মধ্যে যে বেদনা ধিকিধিকি জ্বলছিল তা তারা কেউ জানতেও

পারল না। সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। পরের দিন সকালে ডাঃ স্টেলার্ড আমার চোখ পরীক্ষা করতে এসে জিজ্ঞেস করলেন—অপারেশনের ব্যাপারে কি ঠিক করেছেন ?

আমি বল্লাম—আমার আর একবার অপারেশন করাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই। ডাক্তারবাবু, রোগ দূর করবার তিনটে উপায় আছে বলে আমার মনে হয়। ওষুধ দিয়ে, নয় অপারেশন করে, এর দুটোই যখন কাজে আসে না তখন তৃতীয়টির ওপর নির্ভর করতে হয়—এ হচ্ছে প্রার্থনা আর বিশ্বাস। তাই প্রথম দুটোর দ্বারা যখন আমার চোখ ভাল হ'ল না তখন তৃতীয়টি দিয়ে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এর উত্তরে ডাক্তার বল্লেন—আপনার বিশ্বাসকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

এরপর আরো দু'দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম। অপারেশনের ফল আশাপ্রদ না হলেও আগের থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি। বাইরে এসে চারিদিক দেখে একটু ভরসা পেলাম। লণ্ডনের পরিচিত রাস্তাগুলি, পুরোনো ঘরবাড়ীগুলি, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি দেখে আমি খুব খুশী হ'লাম। তবু ব্যথার একটা ছোট্ট ছায়া আমার মনকে ঘিরে রইল।

আমি দু'সপ্তাহ এই হাসপাতালে ছিলাম। এই হাসপাতালের কাজকর্ম এত ভালো যে প্রশংসা করে তার শেষ করা যায় না। এখানকার ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের সুখসুবিধার কথা যখন মনে পড়ে তখন শ্রদ্ধায় আমার মন নুয়ে পড়ে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কিছুদিন আমি লণ্ডনে ছিলাম। এ সময় দ্বিতীয়বার অপারেশনের কথা যে আমি চিন্তা করি নি তা নয়। ডাঃ ষ্টেলার্ড অপারেশনের ব্যাপারে যা বলেছিলেন তা শুনে আমার সন্তানেরা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর একবার এ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে আমাকে অনুরোধ জানালো। ডাঃ মেনন এবং আরো কয়েকজন ডাক্তার বন্ধু এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর দ্বিতীয়বার আর অপারেশন করার দরকার নেই বলে তাঁরা ঠিক করলেন।

এরপর লণ্ডনে আর বেশীদিন থাকার দরকার রইল না। অপারেশনের পর স্কটল্যাণ্ড এবং ইউরোপের কয়েকটি জায়গা ঘুরবো বলে ঠিক করেছিলাম। এখন বাড়ী ফিরে যাব বলে ঠিক করলাম। অপারেশন করা চোখে চশমা পরার পর আরো একটু ভালো দেখতে পেলাম। আমার প্রিয় পুরোনো লণ্ডনকে ভালো করে দেখতে পেলাম। লণ্ডনে নতুন নতুন বাড়ীর সংখ্যা আর তাদের সৌন্দর্য মাত্রই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ

করে নি। বিপ্লব ছাড়াও দেশে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রে ইংরেজরা সাফল্য লাভ করেছে তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বেকারের সংখ্যা কমে গেছে। সাধারণ লোকের জীবনের মান উন্নত হয়েছে। বড় ছোটর তফাৎ ঘুচে গেছে। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সুখে বাস করা ইংরেজদের দেখলে তাদের ওপর শ্রদ্ধা না জেগে পারে না।

পঞ্চাশ

লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তন

1959 সালের 21শে এপ্রিল আমরা বিমানে লণ্ডন থেকে রওনা দিলাম। 22শে এপ্রিল বিকেল 4-30 টায় বম্বে পৌঁছোলাম। এয়ারপোর্টে অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন। বম্বেতে আমি ভি. এম. নায়ারের জামাই মাধব দাসের আতিথ্য স্বীকার করি। দাসের স্ত্রী কমলার তত্ত্বাবধানে আমি চারদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারলাম।

26শে এপ্রিল বম্বে থেকে মাদ্রাজে এলাম। মাদ্রাজে এসেই দেশের অস্বস্তিকর অবস্থার কথা শুনতে পেলাম। সরকার এই অস্বস্তিকর অবস্থার উন্নতি করার কোনো আগ্রহ না দেখানোতে শ্রীকেলপ্পন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন করবেন বলে ঠিক করেছেন জানতে পারলাম। কেলপ্পনের দেশপ্রেম, আদর্শনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল, তবে অনশন করে এই অবস্থার বোঝাপড়া করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আমি কেলপ্পনকে অনশন করতে বারণ করে একটা চিঠি লিখলাম। আমার চিঠিতে কোনো ফল হবে না জানতাম, তবু চিঠিটা লিখে আমি একটু স্বস্তি পেলাম।

আমি আর করুণাকর মেনন এক সপ্তাহ মাদ্রাজে থেকে 2রা মে সিঙ্গাপুরে রওনা হই। সিঙ্গাপুরে আমরা পরদিন পৌঁছোই। সিঙ্গাপুরে আমরা ছ'সপ্তাহ আমার মেয়ে লীলার বাড়ীতে ছিলাম। জামাই এখানে শিক্ষকের কাজ করে। আমার ছেলে উন্নিও সিঙ্গাপুরে থাকে। সে জাপান এয়ার ফোর্সের একজন অফিসার। উন্নির ছেলে হরির বয়স তিন বছর। অপারেশনের পর যখন চোখের দৃষ্টি আংশিক ভাবে ফিরে পেলাম, তখন আমার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হ'য়েছিল তা হচ্ছে হরির মুখ আমি দেখতে পাব। সিঙ্গাপুরে গিয়ে তাকে দেখে আমার মনের অবস্থার কথা আমি এখানে বর্ণনা করতে অক্ষম।

তের বছর আগে আমি সিঙ্গাপুর ছাড়ি। আজ এত বছর পরে সেখানকার মালয়ালী এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আমি যে অভ্যর্থনা পেলাম তাতে আমি সত্যিই খুব অভিভূত হ'য়ে গেলাম।

সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবার সময় আমি সেখানে যাই। সিঙ্গাপুর তখন একটা আলাদা ষ্টেট হয়েছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে যখন

সাধারণ নির্বাচন হচ্ছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। সিঙ্গাপুরে বৃটিশ প্রভুত্বের চূড়ান্ত দেখেছিলাম। নির্বাচনের পর পি. এ. পি. দল ক্ষমতায় এলে পর ইংরেজেরা একের পর এক সেখান থেকে চলে গেল। এই ছোট্ট দ্বীপটির কত পরিবর্তনই না এখন হ'য়েছে।

মালয়েও এই একই ব্যাপার হয়েছে। এ রাজ্য এখন স্বাধীন হয়েছে। বৃটিশেরা চলে গেছে। নয়টি প্রদেশ নিয়ে মালয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। একজন নির্বাচিত সুলতান এখন এই ফেডারেল ষ্টেটের মাথা। এখানে এখন পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র কাজ করছে।

এই সময় অনেক পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হবার অবকাশ মেলে। "বিলেতের খবর" নামে আমার বইটির আর একটি নতুন সংস্করণ বের করার জন্য তাতে আরো পাঁচটি নতুন অধ্যায় 'সংযোগ' করার অবসরও এখানে আমার মিলেছিল।

14ই জুন রাত দশটায় সিঙ্গাপুর থেকে বেরিয়ে সাত ঘণ্টার যাত্রা শেষে মাদ্রাজে এসে পৌঁছোলাম। একদিন সেখানে থেকে পরের দিন কলিকটে এসে উপস্থিত হলাম।

সিঙ্গাপুরে আর একবার আমি চশমা বদলিয়েছিলাম। নতুন চশমায় আরো একটু ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম। কালিকট রেলওয়ে ষ্টেশনে আমার পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের মুখ পরিষ্কার দেখতে পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম।

6ই জুলাই আমি আবার মাতৃভূমির সম্পাদনার কাজে যোগ দিই।

একান্ন

পরিবর্তিত অবস্থায়

দেশে ফিরে আসার পর যদিও আমি আগের চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম, তবু লিখতে ও পড়তে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এর জন্যে আমাকে পরের সাহায্য নিতে হলেও দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে বিশেষ কিছু অসুবিধে হয়নি। শরীরে ক্লান্তি অনুভব করিনি, কাজেও নিরুৎসাহ বোধ করিনি। লণ্ডন থেকে ফিরে দেশের পরিবর্তিত অবস্থা দেখে ভবিষ্যতে আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে কি পথ অবলম্বন করবো সে বিষয়ে আমি গভীর চিন্তা করছিলাম।

কেরলে তখন কম্যুনিস্ট দল রাজ্য শাসন করছিল। কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে অন্যান্য দলগুলির বিরোধিতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সরকারের শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়, আর সেই আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি সারা দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে একটা বিরাট আন্দোলনের রূপ নিল। কম্যুনিস্ট সরকারকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেওয়ার আওয়াজ সারা দেশে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। কম্যুনিস্ট বিরোধী দলগুলি সব একজোট হ'ল। কিন্তু কম্যুনিস্টরা এত সহজে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। তারা সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসেছে। বিধানসভায় যতদিন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে ততদিন দেশের ক্ষমতা চালানোর অধিকার তাদের একথা তারা স্পষ্ট বলল। সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দলকে আন্দোলন করে ক্ষমতাচ্যুত করা গণতান্ত্রিক ভদ্রতা নয় এটা তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কংগ্রেস আর অন্যান্য দলগুলি বলতে লাগলো দু'বছর ধরে কম্যুনিস্ট পার্টির কুশাসন যে রকম করেই হোক শেষ করতে হবে, নইলে কেরলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশের লোকের মতও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—কম্যুনিস্ট সমর্থনকারী আর কম্যুনিস্ট বিরোধী।

জনগণের আন্দোলনকে পিষে ফেলার জন্য কম্যুনিস্ট সরকার যে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করলো তাতে এই আন্দোলন আরো জোরালো হ'য়ে উঠল। কেরলের বাইরেও আন্দোলনের বিপক্ষে এবং স্বপক্ষে জনমত গড়ে উঠছিল। কেরলে যা ঘটছিল তা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি এমন কি বিদেশের লোকেরাও খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করছিল।

কেরলের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘৃণা আর বিদ্বেষে কলুষিত হ'য়ে উঠলো। রাজনৈতিক দলগুলো মাত্র নয়, খবরের কাগজগুলোও এই আন্দোলনের ঘূর্ণিতে পড়ে গেল। অকম্যুনিস্ট দলগুলি কম্যুনিস্ট শাসন শেষ করার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ করলো তাকে তারা "মুক্তি সংগ্রাম" বলে ঘোষণা করে। দেশে কম্যুনিস্টদের অধীনে শাসনের নামে যে কুশাসন চলছিল তার বিরুদ্ধে আমারও অনেক অভিযোগ ছিল এবং ক্ষমতা থেকে তারা যেন বিচ্যুত হয় তাও আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলি যে পথ অবলম্বন করেছিল তা আমি সমর্থন করতে পারিনি। এগুলো আমার কাছে অগণতান্ত্রিক বলে মনে হ'য়েছিল। কম্যুনিস্টদের কুশাসনের মত অকম্যুনিস্টদের এই মুক্তি সংগ্রাম গণতন্ত্রের অধঃপতনের পথ খুঁড়ছে বলে আমার ভয় হয়। কম্যুনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং কাগজগুলি আন্দোলনের উত্তেজনায় এই বিপদের কথা চিন্তা করেনি। আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। আমি যদি আমার মত প্রকাশ না করি তাহলে আমার দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো। তাই 1959 সালের 29শে জুলাই এ বিষয়ে আমি মাতৃভূমিতে একটা বিবৃতি দিই। এই বিবৃতি অন্যান্য কাগজেও বেরিয়েছিল। শ্রীকেলপ্পনও এই বিবৃতিতে সই করেছিলেন। এর থেকে খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

—আজকে কেরলে একটা অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে আজ নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ছাত্রেরা পড়াশুনোয় মন দিচ্ছে না, সরকারী অফিসের কর্মচারীরা তাদের কাজ করছে না, যে যা খুশী বলছে, যা খুশী কাজ করছে। এ সবের দায়িত্ব কোন দলের, কে ঠিক কাজ করছে, এসব তর্ক বিতর্কের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। আমাদের দেশে যে কতকগুলি খারাপ ঘটনা ঘটছে সেগুলো যদি ঘটতে থাকে তাহলে তা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। তাই আমরা আমাদের মৌনতা ভঙ্গ করে এই বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা অন্য এক ঐতিহ্যে বেড়ে উঠেছি, তাই আমাদের পক্ষে দেশের এই অবস্থা দেখে অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে, মন ভারী হয়ে উঠছে। দেশে এমন একটা অবস্থা যারা সৃষ্টি করেছে তাদের কি সরকারের ওপর একটা কর্তব্য নেই? জনসাধারণের নৈতিক বোধকে উঁচু করে তুলে ধরে সরকারের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কি আমাদের উচিত নয়?

এই আন্দোলন যে বেশিদিন চলবে না এ আমি জানতাম। সমস্ত কেরলে যে ভাবে দিনের পর দিন শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল তাতে কেরলে কম্যুনিস্ট সরকারের শাসন আর চলতে পারে না বলে কেন্দ্র মনে করলো। তদনুযায়ী ভারতের প্রেসিডেন্ট 1959

সালের 1লা সেপ্টেম্বর রাজ্যের শাসন নিজের হাতে নিয়ে বিধানসভা ভেঙে দিলেন। আন্দোলন শেষ হ'ল, দেশে পূর্বেকার অবস্থা ফিরে এল। রাজনৈতিক দলগুলি আবার একটা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। 1960 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে আবার সাধারণ নির্বাচন হয়। এর ফলে কংগ্রেস ও পি. এস. পি. একসঙ্গে যোগ দিয়ে একটা যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করে। মুসলিম লীগের সমর্থনও এই মন্ত্রীসভা পেল। লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের এই আঁতাত অবশ্য আমার দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হ'য়েছিল।

লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পরও শ্রী ভি. এম. নায়ার বেশ কিছুদিন আমাকে সাহায্য করার জন্য মাতৃভূমির কাজকর্ম দেখছিলেন। সম্পাদকের দায়িত্বের বেশীর ভাগ তিনিই বহন করছিলেন। এমনিভাবে তিনি ম্যানেজিং এডিটর আর আমি চীফ এডিটর হ'য়ে কাজ করছিলাম।

ভি. এম. নায়ারের সাহায্য পাওয়ার ফলে আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কেরল সাহিত্য আকাদেমির সহ-সভাপতি মহাকবি ভল্লতোলের মৃত্যুর পর সেই পদ গ্রহণ করতে কেরলের নতুন সরকার আমাকে অনুরোধ করলো। আকাদেমি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন হবে, তার দৈনন্দিন কাজে সরকার মাথা গলাতে পারবে না, এই কারণ দেখিয়ে আমি কার্যকরী সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছিলাম। আমার এই মত নতুন সরকার মেনে নেবে এই বিশ্বাসে আমি আকাদেমির সহ-সভাপতির পদ নিতে স্বীকার করলাম। তবে আমার আশানুরূপ ফল পেলাম না।

1961 সালের 7ই অক্টোবর সাহিত্য আকাদেমির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে আমার বক্তৃতায় এই ব্যাপারে আমি বিশদভাবে বলেছিলাম। তার কিছু এখানে তুলে দিচ্ছি —'আকাদেমির নিজের দায়িত্ব যদি ঠিকমতো পালন করতে হয় তাহ'লে এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বয়ংশাসিত হওয়া উচিত। এর রূপ দেওয়া এবং কাজের পথ দেখানো মাত্র সরকারের দায়িত্ব।'—একথা 1956 সালে আকাদেমির প্রতিষ্ঠার সময় তখনকার ত্রিবাঙ্কুর কোচীন ষ্টেটের উপদেষ্টা পি. এস. রাও বলেছিলেন। এ কথা 1954 সালে কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদেমি উদ্‌ঘাটনের সময় মৌলানা আজাদও বলেছিলেন। আকাদেমিগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলে তাদের কাজকর্ম চালানোর জন্য দরকার মত অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে। আকাদেমির একবার প্রতিষ্ঠা হলে তার ওপর গভর্ণমেণ্টের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। আকাদেমিকে একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা যেন কখনোই সরকারের উদ্দেশ্য না হয়। আকাদেমির সংগঠকেরা চেয়েছিলেন, এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হবে। তাই এর সংবিধানে কোনো পরিবর্তন আনতে হ'লে তা আনার দায়িত্ব তারা আকাদেমির

হাতেই দিয়েছেন। আকাদেমি তাই গভীর আলোচনার পর সংবিধানের পরিবর্তন করে কতকগুলি প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য আজ আট মাস হ'ল দিয়েছে। সরকার যে শুধু এটা অঙ্গীকার করে নি তা নয়, এ ব্যাপারে আকাদেমির সঙ্গে কোন আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত হয় নি। অনেকবার, অনেক ভাবে, আকাদেমি এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি।

এই বছরই আকাদেমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়। এখনো কেরল সাহিত্য আকাদেমি তার নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করেনি।

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে আমি কয়েকটি বই লিখেছিলাম। 'জয়ের পথে', 'প্রভাত দীপ', 'আব্রাহাম লিঙ্কন', 'আমরা এগিয়ে যাচ্ছি', 'নতুন ভারতের স্রষ্টা' (দুই ভাগ) 'জওহরলাল নেহেরু', 'মহাত্মা গান্ধী' (দুই ভাগ), 'দেশের জন্য' এবং 'মহাত্মা' নামে দু'টি নাটক সবশুদ্ধ বারো খানা বই লিখি।

চোখে ভালো করে দেখতে না পেয়ে কেমন ভাবে আমি এতগুলো বই লেখা শেষ করলাম সেটা জানার ঔৎসুক্য নিশ্চয় পাঠকদের হচ্ছে। সকালে তিন ঘণ্টা সাধারণতঃ আমি লিখি। একটা লেখা শেষ হ'লে পর অন্যটা আরম্ভ করি। কখনো বা দু'টো তিনটে বই একসঙ্গে লিখতে আরম্ভ করি। এমনি ভাবে আট বছরে বারোটা বই লিখে শেষ করেছিলাম।

এই লেখাতে আমাকে কৃষ্ণ কুরুপ্প, বেণুগোপাল, কৃষ্ণন্ নায়ার সাহায্য করেছিলেন। বই লেখার সময় অন্যান্য বইও আমাকে পড়তে হ'য়েছিল। সবসময় স্মৃতি শক্তি থেকে লেখা সম্ভব নয়। তাই বই লেখার এক একটা স্টেজে দরকারী জায়গাগুলো পড়ে দেবার জন্য আমার বন্ধুদের বলতাম। পড়া শেষ হ'লে বন্ধুদের লিখতে বলতাম। আমি যা বলতাম, তারা তাই লিখতো। আমার মেয়ে লীলা, নাতনী নলিনী এবং মাতৃভূমির সম্পাদকীয় বোর্ডের তাক্ষম বই লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমায় সাহায্য করেছে। এই কষ্টসাধ্য কাজে যারা আমাকে সাহায্য করেছে তাদের আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাকে অনেক জনসভায় ভাগ নিয়ে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সভায় যেতে আমি ভালোবাসি। যত ছোট সভাই হোক না কেন, সেখানে যাবার আগে আমার বক্তব্য ভালো করে মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে তারপর আমি যাই। রেডিওতে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণও পেয়েছি।

কাগজের ব্যাপারে বেশীর ভাগ ভার শ্রীনায়ার নিলেও অফিসে আসার পর আমার অনেক কিছু করতে হয়। প্রতিদিনকার কাগজ, মাসিকপত্র, অন্যান্য কাগজ পত্র সব

আমার সেক্রেটারী শ্রীকুমার আমায় পড়ে শোনাতো। চিঠি-পত্রের উত্তর তৈরী করতে হয়। নানারকম প্রশ্ন করে অনেকে অনেক চিঠিপত্র দেয়। এ ছাড়া রোজ বহুলোক আমার সঙ্গে দেখা করতেও আসে।

দুপুরে খাবার পর আমি এক ঘণ্টা ঘুমোতাম। সবকিছু ফেলে রেখে আমি এক ঘণ্টা ঘুমোনোর সময় ক'রে নিতাম। তারপর অফিসে গিয়ে দেড় ঘণ্টা কাজ করতাম। কোনো কোনো দিন সভাসমিতিতে যোগ দিতাম। অন্যান্য দিন বাড়ী পৌঁছোনোর পর লীলা বা নলিনী আমার পছন্দমত বই থেকে পড়ে শোনাতো। রাতে খাওয়া সেরে আবার কিছুক্ষণ পড়তে আর গান শুনতে আমার ভাল লাগতো। রাত সাড়ে ন'টার সময় আমি ঘুমোতে যেতাম।

বয়স হ'লেও আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি এরকম আমার কখনও মনে হয় না। ক্ষিধে না থাকা, ঘুম কমে যাওয়া, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হ'য়ে যাওয়া, বার্ধক্যের লক্ষণগুলি আমাকে তখনো পেয়ে বসেনি।

সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্য বা অন্যান্য কাজে আমাকে মাঝে মাঝে ভ্রমণ করতে হতো। পছন্দমত খাওয়া সময় মত পেলে আর ভ্রমণ করবার সুখসুবিধাগুলো থাকলে ভ্রমণের ক্লান্তি আমার লাগতো না। বরঞ্চ মাঝে মাঝে ভ্রমণ করতে আমার ভালই লাগতো।

দৃষ্টিহীনতা যেন আমার কাজকর্ম আর মনকে স্পর্শ না করে এ দিকটায় আমি সব-সময় লক্ষ্য রাখি। অপারেশনের পর বেশ কয়েক দিন একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আমি সে খারাপ ভাবটা দূর করতে চেষ্টা করেছিলাম। পরে এই খারাপ ভাবটা একেবারেই ছিল না। সাধারণ লোকের মতো উৎসাহের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম আমি ক'রে যেতাম। একেবারে অন্ধ লোকেরা এই পৃথিবীতে কত বড় বড় কাজ করে গেছে। "দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেলেও জীবনকে অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী করে তোলা যায় এটা বিশ্বাস করাটাই সবচেয়ে বড় কাজ"—একথাটা লর্ড ফ্রেজার একবার বলেছিলেন। লর্ড ফ্রেজার নিজে অন্ধ ছিলেন এবং অন্ধদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। এই ধরনের মহাত্মাদের জীবনী আমি অনেক পড়েছি। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে বইটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হচ্ছে অন্ধ ও বধির হেলেন কেলারের জীবনী।

নানারকম কাজে লিপ্ত থাকায় আমার অক্ষমতায় হা-হুতাশ করার সময় আমার খুব কমই ছিল। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হ'লে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করার উপায় আমি এখনো অন্বেষণ করে চলেছি। এই চেষ্টায় বিফল হয়েছি একথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। আমার এই অক্ষমতা আমার কর্তব্য কর্মে যেন বিঘ্ন না ঘটায়, এইই আমার প্রার্থনা।

বাহান্ন

জনজীবনের দুই দিক

অর্ধশতাব্দীরও বেশী আমি কেরলে এবং তার বাইরে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করেছি। এই জীবনের দুই দিক।—তার তিক্ততা ও মিষ্টতা আস্বাদ করার অনেক সুযোগ আমার ঘটেছে।

কিসে আমাকে জনহিতৈষী কাজে নামতে প্রেরণা দিয়েছে একথা জিজ্ঞেস করলে পর তার ঠিক মতো উত্তর দেওয়া মুশকিল। সরকারী কাজ করবার আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল না। জনসাধারণের জীবনে ভাগ নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছাই আমার ছিল। দেশপ্রেমিকদের জীবনী পড়ার খুব আগ্রহ আমার ছেলেবেলা থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন কাহিনী, তা সে যে দেশেরই হোক্ না কেন, আমাকে খুব প্রেরণা দিত। ইটালীকে একটি রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন যে ম্যাট্‌সিনি, আমেরিকার স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন যে জর্জ ওয়াশিংটন, মাঞ্চু রাজবংশের কুশাসন থেকে চীনকে মুক্ত করেছিলেন যে সান-ইয়াৎ-সেন, আয়র্ল্যাণ্ড থেকে বৃটিশ ক্ষমতা হঠিয়ে দিয়েছিলেন যে ডি. ভ্যালেরা, নিগ্রো ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে আব্রাহাম লিঙ্কন, তাঁদের জীবনী আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম। এই বইগুলি পড়ে জনগণের কাজ করার জন্য আমি খুব প্রেরণা অনুভব করেছিলাম।

আমি কালিকটে প্র্যাকটিশ করার সময় হোমরুল লীগের সেক্রেটারী ছিলাম। জনগণের কাজে আমার জীবন সুদীর্ঘকাল কেটেছে, এক এক সময় এক এক রকম কাজে। কাজের ক্ষেত্র বদলালে তার ধরনটাও বদলাতো। আমার আশানুযায়ী আমি জনগণের সেবা করে গেছি। কিন্তু ক্ষেত্র যেরকমই হোক্ না কেন, বিরোধিতা ছাড়া আমাদের দেশে কোনো কাজ করা মুশ্‌কিল। যখন হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম তখন নীচু জাতির লোকেদের আক্রোশ সহ্য করতে হয়েছিল। ভৈকম সত্যাগ্রহের সময় উঁচু জাতির বিরোধিতা সহ্য করতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রবল প্রতাপশালী সরকারের, শ্রমিকদের কাজের সময় মালিকদের বিরোধিতা সহ্য করতে হ'য়েছিল। এমন অবস্থায় লক্ষ্যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের সততা থাকলে জনহিতৈষী কর্মী তার কাজে এগিয়ে যেতে পারে।

হোমরুল আন্দোলনের সময় কংগ্রেস দল সম্বন্ধে লোকে বলত—"বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্যকে উলটে দেবার চেষ্টা করছে হোমরুল আন্দোলন। এই সব পাগলদের আর কি বলার আছে।" এদের সঙ্গে তখন আমরা তর্ক করিনি, কারণ অপর পক্ষের মতামত শোনার মত মন বা ধৈর্য তাদের ছিল না।

আমি যখন জনগণের কাজে নামলাম তখন চার রকম বিপদের সম্মুখীন আমাকে হ'তে হ'য়েছিল। আমার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের আমার ওপর অনেক আশা ছিল। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এলে তারা আমার কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু আমি তাদের সে আশা পূর্ণ করতে পারি নি। আমার অনেক নিকটতম বন্ধু যখন আমাকে প্র্যাকটিশ বন্ধ রেখে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে দেখলো তখন তারা তাদের রাগ এবং ঘৃণা আমার ওপর খোলাখুলিই দেখিয়েছিল। আমার এই সাহসিক কাজকে যে তারা শুধু অপছন্দ করতো তা নয়, আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে তারাও সরকারের কোপ নজরে পড়বে এই ভয় তাদের ছিল। আমিও তাই তাদের সঙ্গে খুব কমই দেখা করতাম। টাকাপয়সা হাতে না থাকলে মানুষের আত্মমর্যাদা যে কতখানি নীচে নেমে পড়ে তা আমার তখনকার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। হাতে পয়সা না থাকায় দৈনন্দিন খরচ পর্যন্ত চালাতে পারিনি। এর জন্যে যে হীনতা স্বীকার করতে হয়েছে, সে তিক্ত স্মৃতির কথা কখনই ভোলা যায় না। ছাত্রজীবন থেকেই আমি দেনার উৎপাতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। এই দেনার যন্ত্রণা আমাকে কখনই ছাড়েনি। মাঝে মাঝে একটু কম হয়েছে এই মাত্র। আজো যে এর থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত তা আমি বলতে পারি না। সে সময় আমার একটা নির্দিষ্ট আয় ছিল না, হাতে সঞ্চয়ও কিছু ছিল না। এদিকে সংসারও চালাতে হবে। এমন অবস্থা হ'লে পর লোকে যে হতাশার গভীর সাগরে ডুবে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে, দার্শনিক কথাবার্তা, ভালো ভালো উপদেশ, কিছুই তখন আমাদের সাহায্য করতে পারে না। তখন মনে হয়, এমনভাবে বেঁচে লাভ কি! এ জীবনের এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া ভাল। কেমন ভাবে এই সব অবস্থা আমি কাটিয়ে এসেছি সে কথা ভাবলে আমার খুব আশ্চর্য লাগে।

সরকারের কিছু কিছু অফিসারের নানা রকমের ভীতি প্রদর্শনে আমি সব সময় খুব অস্বস্তি বোধ করেছি। আমি এ্যারেস্ট হ'তে পারি। পুলিশ বাড়ী সার্চ করতে আসতে পারে, কোন অপরাধ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আদালত থেকে শাস্তি দেওয়ালে তা উশুল করার জন্য আমার জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হ'তে পারে, এইসব ভয়

আমাকে তখন সবসময় ঘিরে থাকত। সে সময় একটা ভয়ার্তকুল পারিপার্শ্বিকে আমি বহুদিন কাটিয়েছি। এর চেয়েও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছিল জাপানীদের অধীনে যখন সিঙ্গাপুরে আমাকে থাকতে হয়।

একজন সমাজসেবকের সবচেয়ে দুঃসহ অভিজ্ঞতা হচ্ছে ক্রুদ্ধ জনতার নিন্দা আর হিংসার বলি হওয়া। এই রকম অভিজ্ঞতাও আমার কয়েকবার হয়েছে। আমাদের সুখ-শান্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে কোনো লাভ নেই। ফুলের মালা আর প্রশংসা পাওয়ার মত ঢিল খাওয়া আর নিন্দার পাত্র হওয়া একজন জনসেবকের কপালে আছে একথা সবসময় মনে রাখতে হবে, তাই মানসিক সাম্য বজায় রাখতে না পারলে জনগণের কাজ থেকে বিরত হওয়াই ভাল। এমনভাবে উপদেশ দেওয়া অবশ্য সোজা, কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করা খুবই কঠিন। এখানে একটা ঘটনার কথা বলছি—বিধানসভা বহিষ্কার করা হবে কি হবে না এই নিয়ে খোঁজখবর করার জন্য কংগ্রেস একটা বিশেষ কমিটি গঠন করে। এটা এরনাডের গণ্ডগোল হবার পরেই। ডক্টর আনসারি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ, রাজাগোপালাচারী, বিঠলভাই প্যাটেল, কস্তুরী রঙ্গ আয়ঙ্গার, এঁরা ছিলেন এই কমিটির সভ্য। এই কমিটিকে সরকার মালাবারে ঢুকতে দেয়নি। তাই মালাবারের কংগ্রেস কর্মীদের সাক্ষ্য এই কমিটি তামিলনাড়ুর ইরোডে নিয়েছিলেন। এর জন্যে আমি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইরোড যাই। আমি তখন কেরল রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। অনেক ব্যাপারে আমার মতের সঙ্গে আমার বন্ধুদের মত মেলেনি। অন্বেষণ কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় তারা শুধু আমার মতকেই খণ্ডন করেনি, ব্যক্তিগতভাবে আমার নামে অভিযোগও করে। ভিত্তিহীন এইসব অভিযোগ চুপ করে শুনে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি এত প্রাণমন দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করেও আমাকে এমনভাবে বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হ'তে হলো, একথা ভেবে আমার মন অসহ্য দুঃখে ভরে গেল। আমার তখন মনে হয়েছিল এইসব সহ্য করে জনগণের কাজ করার কি দরকার!

"মিঃ মেনন, আপনাকে দেখছি সকলেই ভুল বুঝেছে"—একথা বিঠলভাই প্যাটেল আমাকে তখন বলেছিলেন। তাঁর সেই কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে। ইরোড থেকে ফেরার সময় একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় শুয়ে আমার দুর্দশার কথা ভেবে আমি চোখের জল ফেলেছি। আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছিল তা সহানুভূতির সঙ্গে শোনার একটা লোক পর্যন্ত আমার কাছে ছিল না।

একজন সমাজসেবীর ভাবনাচিন্তা ঠিকমতো না বুঝে তার উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝে

লোকে অনেক সময় তার বিরোধিতা করে। ক্ষুব্ধ জনরোষের সম্মুখীন হতে হ'লে অনমনীয় মনোভাব ও অসীম সাহসের দরকার। এসব জায়গায় বিচক্ষণতার কাজ হচ্ছে যতটা সম্ভব জনরোষের সম্মুখীন না হয়ে তাদের এড়িয়ে যাওয়া।

অত্যন্ত নিঃস্বার্থভাবেও যদি কেউ জনহিতকর কাজে লিপ্ত থাকে, তাহ'লে সে যে সব সময় লোকের ভালোবাসা ও বিশ্বাস লাভ করবে এমন নয়। অবশ্য কখনো কখনো এই ভালোবাসা ও বিশ্বাস অনেক দেরীতে পাওয়া যায়। এখানে আমার মাদাম কামার জীবনের কথা মনে পড়ছে। তাঁর মৃত্যুর পর দেশের লোক তাঁর দেশসেবার কথা জানতে পারে। এমন অনেক সমাজসেবী আছে যারা তাদের বেঁচে থাকার সময় অথবা মৃত্যুর পরও লোকের স্বীকৃতি পায়নি। অবশ্য এই স্বীকৃতি পাবার কথা ভেবে সত্যিকার জনসেবক জনগণের কাজে নামে না।

অবশ্য জনগণের কাছ থেকে প্রশংসা পেলে একজন জনসেবকের আনন্দ না হ'য়ে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। একবার কলকাতায় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার পর এক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন—"আপনার বক্তৃতা অপূর্ব হয়েছে। এমন একটি বক্তৃতা শুনতে পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।" তাতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেছিলেন—এরকম প্রশংসা আমি কত শুনেছি, তবু বন্ধুদের আন্তরিক অভিনন্দনে আমি খুশীই হই। প্রশংসা শুনলে, যে কোনো মানুষের অন্তরে স্বাভাবিকভাবে যে আবেগের সঞ্চার হয় সেই কথাই শাস্ত্রী এখানে বলেছেন।

জনগণের কাজ করতে গিয়ে অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা হলেও জনসাধারণের ভালোবাসার স্পর্শও আমি অনুভব করেছি। জনসাধারণের কাজে যারা নামে, তাদের সব কিছুর জন্য তৈরী থাকা উচিত। তাদের অবস্থা সম্মুখ সমরে নামা যোদ্ধার মত। তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যুদ্ধে তারা মরতেও পারে, জয়লাভও করতে পারে। তবে যোদ্ধার এই আত্মত্যাগ দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, এই আত্মবিশ্বাস তাদের প্রেরণা জোগায়। জনগণের কাজে নিজেকে ঢেলে দেওয়া একজন জনসেবকেরও মনোভাব এমনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, দুঃখকষ্ট থেকে গরীবদের আশার আলো দেখানো, তাদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দেওয়া, এইসব মহৎ ভাবনা জনসেবককে তার কাজে প্রেরণা দেয়। সকল রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বাধাবিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সামনে এগিয়ে যাবার অসাধারণ ক্ষমতা কোনো কোনো লোকের মধ্যে দেখা যায়। তারা যত বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তাদের কাজকর্মের উৎসাহ তত বেড়ে যায়। এই ধরনের নেতারা তাঁদের

লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারুন বা না পারুন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি যে জনসাধারণের কাজে ঢেলে দিয়েছেন এই বোধই তাঁদের মনকে সাফল্যের আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

আমার অভিজ্ঞতাগুলি আমার জীবনে এখন অস্পষ্ট স্মৃতি হ'য়ে বেঁচে আছে। সেই স্মৃতির মাধুর্য আমি এখনো রোমন্থন করি। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু যদি জনসেবার কাজে নিজেকে না ঢেলে দিতাম, তাহ'লে আজকের মনের তৃপ্তি আমি কোনদিনই পেতাম না। জীবনের সায়াহ্নে মনের তৃপ্তিই তো আমাদের একান্ত দরকার।

তিপান্ন

অস্থিরতার তরঙ্গ

ভারতের রাষ্ট্রপতি 1966 সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকে পদ্মভূষণ খেতাব দিলেন। এই খবর কাগজে বেরোলে পর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে যে অভিনন্দন পাই, তাতে আমি খুবই অভিভূত হ'য়ে যাই। দু'মাস পরে রাষ্ট্রপতির নিজের হাত থেকে এই সম্মান নেবার জন্য আমি দিল্লী গেলাম। আমার সঙ্গে আমার মেয়ে লীলা এবং নাতনী নলিনীও ছিল।

আমরা দিল্লীতে এক সপ্তাহ ছিলাম। এর মধ্যে আমার পুরোনো বন্ধু জেনারেল মোহন সিং-এর নিমন্ত্রণে চণ্ডীগড় গেলাম। এখানে আর একজন পুরোনো বন্ধু রতন সিং-এর সঙ্গেও দেখা হলো। আই. এন্. এর সময় তিনি মোহন সিং-এর সেক্রেটারী ছিলেন। পরে পাঞ্জাবের মন্ত্রী হন।

দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর আমি কয়েকটি অভ্যর্থনা সভায় যোগ দিলাম। এর পরেই আমার অশীতিতম জন্মবার্ষিকী এলো। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বন্ধুবান্ধব এবং নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে উপহার পেলাম তা এক অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে আজো আমি যত্ন করে রেখেছি। জীবন সত্যিই একটা অদ্ভুত নাটক। কিছুদিন আগে কত রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, আর আজ পেলাম এই হৃদয়ভরা স্বীকৃতি।

এই বছর কালিকট্ শহরের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। এই অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিলাম। এর জন্যে ছ'মাস আগে থেকে যে প্রস্তুতি চলছিল তাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। এই উপলক্ষে কালিকটের কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীরা অসম্ভব খেটেছিল।

এই সময় কাসারকোট্ নিয়ে একটা আন্দোলন চলছিল। কাসারকোর্টের কতকগুলি ভাগ তাদের বলে মহীশূর সরকার দাবী করে। মহীশূর আর মহারাষ্ট্রের মধ্যে তখন দেশের সীমারেখা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ চলছিল। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার একটা একাঙ্গ কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিশনকে কাসারকোটের ব্যাপারেও অনুসন্ধান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এটা যে খুবই অন্যায় করা হয়েছে সেটা আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছিল। এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমি 1966 সালের নভেম্বর মাসে এর্নাকুলমে একটি নিখিল কেরল সম্মেলন ডাকি।

এগারো বছর আগে ঠিক করা দেশের সীমারেখা নিয়ে আবার গণ্ডগোল করাটা ঠিক নয় বলে এই সম্মেলন মত প্রকাশ করে। কাসারকোটের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত না হওয়া অবধি সময়োপযোগী দরকার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভা একটা বিশেষ কমিটি গঠন করে। আমি এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলাম। বেশ কিছুদিন এই কমিটি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছিল।

এমনিভাবে উৎসব আর আন্দোলন যখন চলছিল তখন আবার দেশের এদিকে ওদিকে বিশৃঙ্খলার লক্ষণ দেখা দিল। দেখতে দেখতে সারা দেশে এই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতার পর দেশকে সবচেয়ে বড় এক সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হ'ল।

1947 সালের পর নতুন গণতন্ত্রের প্রবর্তনে দেশের নানা ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা দিলে পর নিকট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ জাতিপুঞ্জের অন্যান্য দেশগুলির শীর্ষে উঠে যাবে এরকম একটা ধারণা অনেকের হয়। আমারও সেই আশা ছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশে বড় বড় বাঁধ, বিরাট বিরাট শিল্প, নতুন গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। জাতিপুঞ্জে ভারত তার স্থান করে নিয়েছিল। জাতিপুঞ্জের সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া বিভিন্ন দেশগুলি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে ভারতের মতামত জানতে চাইছিল। অন্তর্দেশীয় সম্মেলনগুলিতে ভারত কি পথ অবলম্বন করে তা দেখার জন্য অনেক দেশ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও 1962 সালের পর দেশে একটা পরিবর্তন এল। সে বছর চীনেদের হঠাৎ আক্রমণে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। দেশকে রক্ষা করার দিক্ দিয়ে যে আমরা কতটা দুর্বল তা ধরা পড়লো। চীনারা যদি আরো কিছুদিন তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখতো তাহ'লে যে কি হ'তো তা বলা যায় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের সামনে রাখা লক্ষ্য এবং জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যে ধারণা একদিন গড়ে উঠেছিল তা এখন সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য বোধ, কঠিন পরিশ্রম করবার মনোভাব, নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা, এসব তখন কিছুই ছিল না বল্লেই হয়। ধর্মঘট, যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া, জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করা, মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, রোজকার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে বেশী করে যে বিপদের সম্মুখীন হয়, তা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা এবং তাদের একের অপরকে আক্রমণ করার প্রবৃত্তি। সারা দেশে এই অরাজকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল দেশের রাজনৈতিক দলগুলি।

ভাষার ব্যাপারে, দেশের সীমারেখার ব্যাপারে, দেশের নানা জায়গায় ফেটে পড়া

অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে শিথিল করে তুলবে, এরকম একটা আশঙ্কা অনেকেরই হয়েছিল। কোন কোন স্থানে সেখানকার অধিবাসীরা ভারতের অন্য রাজ্য থেকে এসে বসবাস করা লোকেদের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। এই দূষিত প্রবণতা আরো বাড়তে দেওয়া হলে তা যে আমাদের দেশের নিরাপত্তা আর অখণ্ডতাকে বিপদে ফেলবে সে ভয় আমাদের বেড়ে উঠলো। দেশে যে বিশৃঙ্খলা বেড়ে উঠছিল তার ফল পার্লামেণ্ট এবং বিধানসভায়ও দেখা যাচ্ছিল। আমরা কয়েকজন তখন গভীরভাবে ভাবছিলাম, কি করে এই অরাজকতা থেকে দেশকে উদ্ধার করা যায়, কেমন ভাবে একটা গঠনমূলক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী জনসাধারণের মধ্যে গড়ে তোলা যায়।

একটি দেশের খ্যাতি সুখ্যাতি সে দেশের লোকের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। এই চরিত্র গঠন করার জন্য রীতিমত ট্রেনিং-এর দরকার। কিন্তু এই রকম শিক্ষা দেবার কোনো চেষ্টা স্বাধীনতা পাবার পর দেশে করা হয় নি। এই রকম ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আমরা 'পৌর সঙ্ঘ' নামে একটা সংগঠন গড়েছিলাম। ব্যক্তি এবং জনগণের জীবনে একটা উন্নত মান রাখার জন্য সঙ্ঘের সদস্যদের উদ্বোধিত করা, জনসাধারণের জ্ঞান বাড়ানো, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, একত্র কাজ করার একটা আগ্রহ তাদের মধ্যে বাড়িয়ে তোলা, অন্যদের সাহায্য করার উৎসাহ জাগিয়ে তোলা, জাতি, ধর্ম, সামাজিক পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে সকলের সঙ্গে একভাবে ব্যবহার করা, দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভালো ভাবে অবহিত হওয়া, তা সমাধান করার উপায় খুঁজে বার করা, শ্রেষ্ঠ নাগরিক হ'য়ে বেড়ে ওঠার জন্য আমাদের যুবকদের উৎসাহ দেওয়া, শান্তির পথে দেশের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করা—এইগুলো ছিল সংক্ষেপে এই পৌর সঙ্ঘের কার্যাবলী।

নাগরিক সঙ্ঘের কাজের ফল পেতে বেশ কিছু সময় নেবে। তবে দেশের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এই সঙ্ঘের কাজ যে সাহায্য করবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহই নেই।

প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনগুলি এক একটি ব্যক্তির মতো—তারা চিরকালের জন্য নয়। সময়োপযোগী দরকারের জন্য এই সংগঠনগুলো গড়া হয়। তারা বেড়ে ওঠে, আবার কিছুদিন পরে বিলীন হ'য়ে যায়। তাদের জায়গায় আবার অন্য সংগঠন গড়ে ওঠে। নাগরিক সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় যে আদর্শ কেরলে গড়ে উঠবে সেই কেরলকে আমার কল্পনার চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি। এই কল্পনাকে বাস্তব করে তোলার জন্য আমি এখন চেষ্টা করছি।

চুয়ান্ন

বার্ধক্যের অভিশাপ আর আশীর্বাদ

এই অধ্যায় যখন লিখছি তখন আমারও বয়স হয়েছে ৪৩ বছর। লোকে আমাকে থুত্থুড়ে বুড়ো বলেই ভাববে। এরকম ভাবাটা অবশ্য অসঙ্গত নয়। জীবনের প্রত্যেক ষ্টেজের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শৈশবের নিষ্কলঙ্কতা, বাল্যের চাপল্য, যৌবনের উত্তেজনা, মধ্য বয়সে কিছু লাভের তৃষ্ণা, বার্ধক্যের অক্ষমতা, সব একে অন্যের থেকে আলাদা। বার্ধক্যের অক্ষমতা আমাকে পেয়ে বসেছে এমন একটা অনুভূতি আমার এখনো হয়নি। দৃষ্টিশক্তি অবশ্য খুবই ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, এছাড়া বার্ধক্যের আর কোনো শাস্তি আমাকে পেতে হয়নি। দারিদ্র্য আর বার্ধক্য এই দুইটি জিনিষ সহ্য করা মানুষের পক্ষে কষ্টকর। এর যে কোনো একটা মানুষকে হতাশ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। আর দুটো যদি একসঙ্গে যুক্ত হয় তাহ'লে জীবন নরক হয়ে ওঠে। এমনিভাবে নরকের জীবনযাপন করা কয়েকজনকে আমি জানি। আমার এই দীর্ঘ জীবনে যেসব কষ্টের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা এই ব্যাপারে আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়েছে।

কাজ করবার অক্ষমতা অথবা বিমুখতা এই দুটোই সাধারণতঃ বুড়ো বয়সে দেখা যায়। এই দুটোই এখনো আমার কাছে ঘেঁসতে পারেনি। কাজ করবার এখনো আমার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। শুধু কাজের বৈচিত্র্য আমি চাই। এখনো রোজ তিন চার ঘণ্টা আমি লেখার জন্য ব্যয় করি। অনেক দিনই জনসভায় যোগ দিই। অনেক সংগঠনের সঙ্গে এখনো আমি সক্রিয় ভাবে যুক্ত আছি। এক একটা সংগঠনের কাজ এক এক রকম। কাজ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে যে সব লোকের সম্পর্কে আমাকে আসতে হয় তারাও বদলে যায়। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উঁচু-নীচু, দলীয় নির্দলীয়, কলা, সাহিত্য, সমাজসেবায় যুক্ত বহু লোকের সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক রেখে আসছি। যাদের কাছেই আমি আসি না কেন তাদের সঙ্গে একটা মানসিক সাযুজ্য তৈরী করার অসুবিধা আমার হয়নি। আমি সকলের সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করি। তারি ফলে হয়তো তাদের কাছ থেকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাই।

বার্ধক্যের একটা প্রধান দোষ কর্মবিমুখতা, এটা আগেই বলেছি। আমার বয়সী এক বন্ধু একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। একটা ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান ভাবে তিনি ফেলে আসা দিনগুলির কথা একটার পর একটা বলে যেতে লাগলেন।

একটু পরে পা দু'টো ইজিচেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে তিনি আমাকে বল্লেন—"আমার এখন কি ইচ্ছে করে জানেন মিঃ মেনন? কোনো কাজকর্ম না ক'রে মুখে একটা পাইপ দিয়ে এমনিভাবে শুয়ে মনকে যেখানে খুশী ঘুরতে দেওয়া, আর মাঝে মাঝে এই আপনার সঙ্গে যেমন কথা বলছি তেমনি কতকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পসল্প করা।"

এমনি অলসভাবে সময় কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই। বিশ্রাম আমিও ভালোবাসি, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেও আমার খুব উৎসাহ। কিন্তু কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। এক কাজ থেকে অন্য কাজে লিপ্ত থাকাটাই আমার কাছে বিশ্রাম।

বার্ধক্যের আর একটা দোষ হচ্ছে দেহের ক্লান্তি। আশী বছর পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে থাকা লোকের সংখ্যা খুবই কম। ক্ষীণ দৃষ্টির কথা বাদ দিলে আমার স্বাস্থ্য শুধু যে ভালো তা নয়, আমার স্বাস্থ্যের আরো উন্নতি হ'য়েছে একথা আমি বলতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে আমি যে নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এসেছি তাই হয়তো আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়েছে। তুচ্ছ ব্যাপারে মনে মনে চঞ্চল আমি হই না। ঘৃণা বিদ্বেষ মনের মধ্যে আমি বেশীক্ষণ পুষে রাখি না। এসবই হয়তো আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক উপকারী হয়েছে। এছাড়াও হয়তো আরো কোনো অজানা ব্যাপার আছে। সে যাই হোক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাকে ভুগতে হয়নি।

বার্ধক্যে মানুষকে যা সবচেয়ে কষ্ট দেয় তা হচ্ছে এক রকমের দুঃখবাদ। মৃত্যু এগিয়ে আসছে, এই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হ'য়ে এসেছে—এমনি ভাবে চিন্তা ক'রে একটি লোককে চোখের জল ফেলতেও আমি দেখেছি। আমি এই ধরনের অহেতুক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই না। আমার শান্ত সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্য আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। এমনি স্বচ্ছন্দ শান্ত জীবন এখনো আরো কিছুকাল যাতে কাটিয়ে দিতে পারি তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

অনেকদিন হ'ল প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে আমি অবসর গ্রহণ করেছি। তার মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে আমার আর আগ্রহ নেই। বয়স অনুযায়ী এক এক রকম কাজে আমাদের উৎসাহ কমে বাড়ে। রাজনৈতিক কাজের জন্য ছুটোছুটি করা, বিরুদ্ধ পক্ষের বাদ প্রতিবাদকে খণ্ডন করে তাদের পরাজয়ে আনন্দ লাভ করার মন আমার এখন নেই, একথা সত্যি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আজ দেশের চারিদিকে যা ঘটছে তা আমার মনে কোন ছায়া ফেলছে না। বার্ধক্যে সমস্ত কিছু যথার্থ বাস্তববাদী হিসেবে বিচার করা সম্ভব হয়। ক্ষমতা বা জনগণের প্রশংসার মোহ

এড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার কি ভাবে আমাদের প্রভাবিত করবে তা জানার সুযোগ বার্ধক্য আমাদের দেয়। যুবকদের বা প্রৌঢ়দের যেসব অনুভূতি অধৈর্য করে তোলে, বৃদ্ধ বয়সে সেগুলো আর বিচলিত করে না। বিচক্ষণ উপদেশ দিয়ে যুবকদের কর্মমুখী করে তোলার ভালো একটা সুযোগ বৃদ্ধ বয়সের থাকে।

দূরদর্শিতা, স্থির চিন্তা, মত প্রকাশের সাহস, প্রতিদানের আশা না রাখা, প্রভৃতি গুণগুলি আমাদের পরিশ্রমকে সফল করে তোলার চেষ্টা করে। আর বার্ধক্যেই এই গুণগুলির প্রকাশ বেশী করে দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সে শান্ত মনে এক জায়গায় বসে পড়তে বা লিখতে অত্যন্ত ভালো লাগে। জরুরী কোনো কাজ না থাকলে আমি এই ভাবেই সময় কাটাতে ভালোবাসি। আর এই দুটোতেই অন্যদের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় বলে আমি তাদের কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় এক ভদ্রলোক একবার আমাকে বলেছিলেন—এতদিন পর্যন্ত কাজের ফাইল আর সে সম্বন্ধীয় বই পড়ার সময় ছিল। আমার পছন্দমত বই পড়ে তার রস গ্রহণ করার সুযোগ আমার ঘটে নি। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এই সুযোগ আমার প্রচুর মিলবে বলে আশা করি।

বার্ধক্যও জীবনের একটা অংশ। জীবনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য—বিশিষ্ট কোন অন্বেষণ করা। যতদিন না জীবনের অবসান হয় ততদিন এই অন্বেষণ চলতে থাকে। শুধু বই পড়ে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাটাও এই জ্ঞানার্জনের মধ্যে পড়ে। এমনি ভাবে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখতে পেরেছি, তাতে আমার শারীরিক দুর্বলতা বা মানসিক উৎসাহহীনতা বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় নি। ছাত্র অথবা নবীন যুবকেরা কোনো কিছুর জন্যে আমার কাছে এলে পর তাদের উৎসাহে ভাগ নিতে আমি এখনো পারি। সমস্ত ব্যাপারটা আমি তাদের দৃষ্টিতে দেখতে পারি। বয়সের পার্থক্য এর প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায় না।

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ যখন বৃদ্ধ বয়সে পেয়ে বসে তখন চেষ্টা করে এই অবসাদ দূর করা সম্ভব। পরিমিত আহার, নিয়মিত ব্যায়াম ও বিশ্রাম, পড়াশুনায় উৎসাহ, ভালো ব্যাপারে চিন্তা করার অভ্যাস আমাদের বুদ্ধির বিকাশ করতে সাহায্য করে। জীবনকে অনেক সময় জ্বলন্ত প্রদীপের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। প্রদীপে যেমন মাঝে মাঝে তেল ঢেলে শিখাকে অনির্বাণ রাখা দরকার, তেমনি ভাবে ক্ষীণ হয়ে আসা দেহকে ঠিকমত খাদ্য দেওয়া, এবং ক্লান্ত মনকে উৎসাহে ভরিয়ে দেবার মত চিন্তা করাও দরকার।

আমার ইচ্ছে, কাজের মধ্যে লিপ্ত থেকে সময় কাটানো। তবে আমাদের ইচ্ছে মতো

কাজ তো আর সব সময় পাওয়া যায় না। একবার আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন —আমি কি ভাবে মরতে চাই। অন্য সব কিছুর মতো মৃত্যুর ব্যাপারেও মানুষের রুচি আলাদা আলাদা।

অনেকদিন আগে লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন মধ্যবয়সী এক ইংরেজ মহিলা সে সময়কার কাগজে একটা অত্যন্ত নিদারুণ মৃত্যুর খবর পড়ে আমাকে এমনি ভাবে বলেছিলেন—'মিঃ মেনন, সমুদ্রে বা নদীতে ডুবে মরতে আমার খুব ইচ্ছে করে। প্রথমবারকার শ্বাসরোধের কষ্টটা কেটে গেলে পর এই মৃত্যু থেকে এক ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। তাই আমি এমনি ভাবে মরতে চাই।'

আর একজন আমাকে বলেছিলেন—নিদ্রার মধ্যে যদি মৃত্যু আসে, তার মতো আনন্দকর আর কিছু নেই।

মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ইচ্ছার কথা বলি—।

দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শুয়ে অপরকে আমি যেন না ভোগাই। হঠাৎ মরে যাবার ইচ্ছেও আমার নেই। এই ধরনের মৃত্যু কাম্য হ'লেও বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তার সম্মুখীন হওয়ার নানা অসুবিধা আছে। আমার প্রিয়জনদের এমন অসুবিধায় আমি ফেলতে চাই না বলেই এমন মৃত্যু আমার কাম্য নয়। মরণ আসন্ন, এটা যেন সকলে জানতে পারে, তখন দু'তিন দিন রোগশয্যায় শুয়ে আমি মরতে চাই। তাহ'লে মৃত্যুকে শান্ত মনে বরণ করে নেবার সুযোগ ঘটে। কে জানে, এটা সম্ভব হবে কিনা। এটা আমার মরণের পর অন্যেরা ঠিক করুক।

পঞ্চান্ন

সায়াহ্ন চিন্তা

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ বের হবার পর তা' পড়ে আমার একটি নিকট বন্ধু আমাকে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলো এই অধ্যায়টি লেখার সময় মনে পড়ছে। আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে জীবনে যে সব তত্ত্ব লাভ করেছি সেগুলি নতুন যুগের ছেলেদের জানানোর জন্যে যদি আমি কিছু লিখে রেখে যাই তাহ'লে ভালো হয় ব'লে তিনি বলেছিলেন। এই বন্ধুর কথামতো আমি নতুন যুগের ছেলেদের কতকগুলো কথা বলতে চাই। এগুলো অবশ্য উপদেশ নয়। জীবনে কতকগুলো পথ আমার ভালো বলে মনে হয়েছে। সেগুলোর কথা আমি বলতে চাই।

আমি যাদের সঙ্গে জীবন আরম্ভ করেছিলাম তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এখন বেঁচে আছে। যারা বেঁচে আছে, তারা জীবনের রস আস্বাদন করার ক্ষমতা হারিয়ে কোনো রকমে দিন কাটাচ্ছে। এই দলের একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে পর তাঁর অবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, কষ্টও পেলাম। এক সময় অত্যন্ত ভালো ফুটবল খেলতেন, হাইজাম্প দিলেন, বহুদূর পর্যন্ত অনায়াসে সাঁতার কাটতেন, এমন একটি লোক আজ দু'জন লোকের সাহায্যে চলাফেরা করছেন।

কিছুক্ষণ একসঙ্গে বসে আমরা আমাদের যৌবনের দিনগুলি স্মরণ করলাম। ফেলে আসা সেই দিনগুলির স্মৃতি জীবনের সন্ধ্যায় বসে আমরা রোমন্থন করছিলাম। এই রো স্থন মনে যেমন বেদনা জাগায়, তেমনি খুশী ও আনন্দও জাগায়। জীবন সুখদুঃখের ঢেউয়ে আলোড়িত। ভুল না করে, কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয়ে, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। আমার অভিজ্ঞতাও তাই। তবু যৌবনে পড়া কতকগুলি বই ও কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, একথা আমি এখানে বলে রাখি। অনেকদিন কেটে গেলেও এই ব্যক্তিদের কাজ এবং কথাগুলি এখনো আমার মন থেকে মুছে যায় নি। আমার পঠিত বইগুলির বিষয়বস্তু এবং তাদের লেখার ষ্টাইল যেখানে আমাকে বেশী আকৃষ্ট করেছে সেই অংশগুলো মুখস্থ করে রাখার একটা আগ্রহ আমার ছোটবেলার থেকেই ছিল। তেমনি ভাবে কারোর ধৈর্যশীলতা, কারোর মধুর ব্যবহার, কারোর কঠিন পরিশ্রম করবার ক্ষমতা, সব আমার নিজের জীবনে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলাম। এই

চেষ্টায় আমি যে সব সময় সফল হয়েছি তা বলতে পারি না। তবে জীবনের যাত্রাপথে এই প্রচেষ্টা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী পড়ায় আমার বরাবরই আগ্রহ। নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে জীবনকে যাঁরা সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছেন এবং পরের জন্য সমর্পণ করেছেন সেই মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী কাকেই বা প্রেরণা না দিয়ে থাকতে পারে?

ফেলে আসা দিনগুলির দিকে একবার পিছন ফিরে দেখলে পর জীবনের নানা দিকে আমার নানা রকমের কাজগুলির কথা মনে পড়ে। নানা ধরনের লোকের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে। আমার ব্যবহার তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে আমি তা জানি না। মানুষের ভালোবাসার প্রকাশ দেখে ধন্যবাদ দেবার কত সুযোগই না আমার মিলেছে। তবু আমি অজাতশত্রু, আমার কাজকর্মের কঠিন সমালোচনা করার কেউ নেই, এরকম ভুল ধারণা আমার নেই। সমালোচনা শুনলে আমি খুব কমই অস্বস্তি বোধ করি। বিপক্ষের মতামত অবহেলা করাটা ঠিক নয়। বিপক্ষের মতামত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে সকলের পক্ষেই উপকারী হবে। এতে আমাদের নিজেদের অহঙ্কার কমবে, আমাদের দোষগুলো এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে ব'লে আমি মনে করি।

আমরা এক এক জন এক এক রকম কাজে নিযুক্ত। আমাদের কর্তব্য কর্ম পরিপূর্ণ ভাবে করে তাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকাটাই শেষ কথা নয়। আরো একটা বড় কর্তব্য আমাদের আছে—সময় ও সুযোগ অনুসারে অপরের সাহায্য করা, তাদের সান্ত্বনা দেওয়া, এগুলোও অনেক বড় কাজ। এর জন্য আমাদের বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। চারপাশে তাকালেই হ'ল। বুভুক্ষু, নগ্ন, আশ্রয়হীন কত অসহায় মানুষ আমাদের চারপাশে রয়েছে। রোগাক্রান্ত হ'য়ে ঠিক মত চিকিৎসার অভাবে কত লোক কষ্ট পাচ্ছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় কত ছেলেমেয়ে পড়াশুনো করতে পারছে না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটির মৃত্যুতে অথবা হঠাৎ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে অগাধ দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাওয়া আমাদের কত প্রতিবেশী রয়েছে। এই সব লোকের দুঃখভার লাঘব করার জন্য আমাদের কি কিছু করা সম্ভব নয়? সকলের পক্ষে হয়তো সমাজকে বিরাট ভাবে সাহায্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই ধরনের সেবাশুশ্রূষা করা যে কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব। একটু সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি, একটু সান্ত্বনা, একটু মিষ্টি কথা, এইটুকুই তাদের মনে কত সাহস, কত বল জোগায়, কত তৃপ্তি আর শান্তির কারণ হয়।

একটি ব্যক্তি সম্বন্ধে অথবা তার কাজ সম্বন্ধে কোনো মতামত না ভেবে চিন্তে

ব্যক্ত করা উচিত নয়। একটি মানুষের স্বভাব, চরিত্র হয়তো ভালো করে জানার সুযোগ আমাদের নাও হতে পারে। তার শত্রুরা হয়তো তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অনেক কিছু বলে থাকবে। লোকটিকে ভালো করে জানার আগেই অন্য লোকের কথা শুনে আমাদের হয়তো তার সম্বন্ধে ধারণা বদলে যেতে পারে। তাই সব কিছু না জেনে লোকটির সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা গড়ে তোলা মোটেই ঠিক নয়। কোনো কাজের ভালোমন্দের ব্যাপারেও একটা মত প্রকাশ করাও ঠিক এই মতো। প্রতিটি সমস্যার সমস্ত দিকগুলি আমাদের ভালোভাবে জানা উচিত। এমন ভাবে জানার আগ্রহ বেশীর ভাগ লোকেরই থাকে না। তাই বিস্তারিত সব কিছু না জেনে মতামত প্রকাশ করা কখনই ঠিক নয়।

অনেক সময় মনের মধ্যে যা আছে তা স্পষ্ট খুলে বললে হয়তো মনের তৃপ্তি হয়, কিন্তু তাতে অনেক' সময় মুশকিলও হয়। এরকম কত ঘটনা আমার মনে পড়ছে, যখন আমার মতামত আমি স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। অন্যে হয়তো আঘাত পাবে এই ভেবে আমি চুপ করে থেকেছি। কিন্তু এমনি ভাবে মনের মধ্যে সব কিছু চেপে রেখে আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতাম।

একবার একজন সন্ন্যাসীর সব অদ্ভুত কাজকর্মের কথা তার একজন ভক্ত বলে। তা শুনে একটি লোক "যতসব বাজে কথা" ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয়। কারোর মধ্যে এমন অসাধারণ শক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কিছু না জেনে এ রকম শক্তি থাকাটা 'অসম্ভব' বা 'বাজে কথা' এমনি বলা এক ধরনের অহঙ্কার। আমাদের জানার একটা সীমা আছে। এই সীমার বাইরেও কতকগুলি বিষয় এই পৃথিবীতে আছে, এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। এটা মনে রাখলে জীবনের যাত্রাপথ সুগম হ'য়ে ওঠে।

এখন আর একটা ব্যাপারের কথা বলা যাক। এক পরিবারে নানা বয়সের, নানা রুচির, নানা স্বভাবের লোক থাকে। আগের তুলনায় এখনকার জীবন অনেক জটিল হ'য়ে এসেছে। পারিবারিক জীবনে সুখশান্তি রাখতে হ'লে এর প্রত্যেকটি লোককে, বিশেষ ক'রে বয়স্কদের, সবসময় মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। বয়স্করা জীবনের সব রকম সুখভোগ করেছে। শিশুরা এবং যুবকেরা এই রসের আস্বাদন করতে যাচ্ছে। অনেক সময় যুবকেরা যে খরচগুলিকে অত্যন্ত দরকারী বলে মনে করে, বৃদ্ধেরা হয়তো সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয়, বাড়াবাড়ি বলে মনে করে। এ রকম মনে হলেও অল্প বয়সীদের ভালো লাগার পথে বাধা না দেওয়াই উচিত।

আমাদের অপছন্দ কোন মতামত অন্যেরা প্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে কিছু না

বলাই ভাল। শুধু একটু মৃদু হেসে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, ঐ মতের সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু এও না করলে ভাল হয়। মতামত প্রকাশ করার আরো অনেক সুযোগ হয়তো আসবে। তখন নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বল্লেই হবে।

এবার ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গে আসা যাক। নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস স্থানে অস্থানে খুলে বলে অন্য লোকের বিরক্তি উৎপাদন করতে কিছু লোককে দেখতে পাওয়া যায়। এই বিরক্তিকর স্বভাব যতটা সম্ভব পরিহার করা উচিত। অন্যদের ধর্মবিশ্বাসকে নিন্দা করা বা গালাগালি দেওয়া উচিত নয়। যে কোন বিশ্বাস বা মতকে খণ্ডন করার জন্য তর্ক করাটা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু এ রকম করাটা নিতান্তই মূর্খতা। আমরা আমাদের ধর্ম বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন করি। অন্যরাও তাদের বিশ্বাস মত জীবন কাটাক, একজন মার্জিত লোকের এই রকম আচরণই হওয়া উচিত। আমাদের মতে লোককে টেনে আনতে না পারলে দুঃখ করে কিছু লাভ নেই। সমর্থন পেলেই যে সকলকে আমার মতে বিশ্বাস করে তা নয়। বাইরের কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, মাঝে মাঝে গির্জা বা মন্দিরে যাওয়া, এই হচ্ছে বেশীর ভাগ লোকের ধর্মবিশ্বাস। ধর্মে সত্যি ক'রে যে বিশ্বাস করে, তার সকল কাজে—তার নিজের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে, ব্যবসায়িক জীবনে, সামাজিক জীবনে এই বিশ্বাস ফুটে ওঠে।

আমাদের মনে যেন কখনোই প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা না জাগে। যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীবনকে বেছে নিতে চায়, তার পক্ষে এটা শোভা পায় না। একজন লোক জেনে বা না জেনে হয়তো আমাদের পক্ষে ক্ষতি করেছে। একদিন তার প্রতিশোধ নিতে হবে, এই কথা মনে করে রাখাটা কি নীচতার লক্ষণ নয়? তবু এই রকম স্বভাবের লোকই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

একটা অফিসে কতকগুলো বিষয় আলোচনা করার জন্য হয়তো বিশেষ কয়েক ব্যক্তিকে একটি সভায় ডাকা হয়েছে। এই সভায় একজন অনিমন্ত্রিত অফিসার প্রথম সারিতে বসে আছেন। এই সভা শুধু নিমন্ত্রিত লোকদের জন্য, একথা হয়তো সভার সেক্রেটারী খুব বিনয়ের সঙ্গেই বল্লেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি সে কথা গায়েই লাগালেন না। সেক্রেটারী তখন ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টকে জানালেন। প্রেসিডেন্টের নির্দেশানুসারে এই অফিসারটিকে সে জায়গাটি ছেড়ে দিতে হ'ল। সেক্রেটারীর ওপর এই অফিসারের তীব্র বিদ্বেষ জন্মাল। তিন বছর পরে সেক্রেটারীর কাজের মেয়াদ শেষ হ'লে পর তাঁকে আবার দ্বিতীয়বার নিযুক্ত করার আলোচনা চলল। তখন এই অফিসারটি তাঁর সমস্ত প্রভাব বিস্তার ক'রে এই নিয়োগ বন্ধ করলেন। এই যে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব, একি একজন ভদ্রলোকের শোভা পায়?

আরো একটা কথা বলি। অনেক সময় আমাদের মত বয়োবৃদ্ধদের একটা চিন্তা খুব বিচলিত করে, তা হচ্ছে—আমি এই কাজটা শেষ করতে পারলাম না, আমি যে প্রতিষ্ঠানটা আরম্ভ করলাম তাকে জোরদার করে গড়ে তুলতে পারলাম না, এই ধরনের চিন্তা। কিন্তু এটা একেবারেই অনর্থক। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, কোনো কাজই শেষ হ'য়েছে একথা বলা যায় না। একটা কাজ যত ভালো করেই করা হোক না কেন, চেষ্টা করলে আরো ভালো করে করা যায়। আজকে রেল, বিমান যে অবস্থায় এসেছে, তা কি শুধু এক জনের চেষ্টায়, না অনেকের সম্মিলিত চেষ্টায়? প্রতিষ্ঠানগুলির বেলায়ও সেই একই কথা বলা যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, স্কাউট আন্দোলন, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি সংগঠনগুলি কারো একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। এই ধরনের চিন্তা আমাকেও বিচলিত করে। আমার আরম্ভ করা বইগুলি কি আমি লিখে শেষ করতে পারব, এই ভয় আমার মনে লেগে আছে। আমি যে প্রতিষ্ঠানগুলি আরম্ভ করলাম সেগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এ দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে, এই সন্দেহ মনকে দোলা দিয়েছে। আমার আশানুরূপ কতকগুলো কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে কিনা এই উৎকণ্ঠা অকারণে আমাকে বিচলিত করেছে। কিন্তু তবু এই অকারণ উৎকণ্ঠাকে নিবৃত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

আজ বেশ কিছুদিন হলো মাঝে মাঝে আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখছি। পরীক্ষা এসে গেছে, এখনো পড়াগুলো ঠিকমতো তৈরী হয় নি ; মামলা বিচারের জন্য আদালতে উঠেছে, কিন্তু আমি তার জন্যে তৈরী হয় নি ; কোথাও বেরিয়ে পড়বার দিন এসে গেছে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি শেষ হয় নি ; এমনি নানা স্বপ্ন। এর কারণ কি জানার জন্য একজন মনঃসমীক্ষককে লিখবো বলে ঠিক করলাম। তখনি আমার এক বন্ধু আমাকে বল্লেন—কাজটা শেষ হয়নি এই চিন্তা তোমার মনে ভারী হয়ে আছে বলে এরকম স্বপ্ন দেখছ। হয়তো তিনি যা বলেছেন তা ঠিক। তা সে যাই হোক্ না কেন, আরম্ভ করা কাজ শেষ হয়নি বলে দুঃখ করা উচিত নয় বলে আমি মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলাম। আরম্ভ করেছ যে কাজ, সেটা শেষ করার চেষ্টা করে যাও, তার বেশী আর কিছু আশা করো না। জীবন শুধু একটা অবিরাম প্রচেষ্টা—ফল পাও আর নাই পাও।

এই প্রসঙ্গে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের এক ঝাড়ুদারের কথা আমার মনে পড়ছে। প্ল্যাটফর্মের নোংরা পরিষ্কার ক'রে আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে যুবকটি একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকছিল। একটুখানি পরেই দেখতে পেল, প্ল্যাটফর্ম আবার নানা আবর্জনায় ভরে

গেছে। কোনো রকম আলস্য না করে যুবকটি আবার ঝাঁটা হাতে তার কাজ আরম্ভ করলো। যুবকটি অত্যন্ত একটি ছোট কাজ করছে, কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? অন্যেরা পরিবেশ নোংরা করলেও আমাদের কাজ হবে তা পরিষ্কার করা। কেউ কেউ অন্যদের কষ্ট দিলেও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এইসব কষ্ট পাওয়া লোকদের সাহায্য করা। কেউ যদি অসহায় কোন লোককে মেরে নীচে ফেলে দেয়, তাহলে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে টেনে তোলা। এমনটি যদি করতে পারি, তাহ'লে জীবনে আমরা তৃপ্তি লাভ করতে পারবো।

ছাপান্ন

চিন্তা বেদীতে

বার্ধক্যাবস্থায় মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা আসা-যাওয়া করে। নিজের পরিবার, কাজকর্ম এবং মৃত্যুর পর কি অবস্থা হবে তাই নিয়ে চিন্তা করাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে এ সব চিন্তা বিব্রত করছে না। আমি আমার দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত। চারপাশের একটা বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, নষ্ট করবার প্রবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, সব কিছু আজ দেশের উন্নতির পথে একটি বিরাট অন্তরায় হ'য়ে রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাস আর হতাশা বেড়ে উঠছে তা' দূর করবার জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব আজ দেশে নেই। গত বিশ বছরের মধ্যে দেশে এই রকম একটা অবস্থা বোধহয় এই প্রথম সৃষ্টি হ'ল।

এখন সময়টা অন্ধকারে ভরা, কোথাও আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। শস্যশ্যামলা এই ভারতে হঠাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হ'য়ে গেল কি? এই ভয় আমাকে কখনো কখনো পেয়ে বসে।

কতদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে সেইটাই বড় কথা নয়। কেমন করে বেঁচে থেকেছি সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। আমার মধ্যে কোন দিনই প্রচুর অর্থ উপার্জন করার লোভ, ক্ষমতা পাবার মোহ ছিল না। টাকা পয়সার প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্য আমি তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিচ্ছি না। অর্থের পূজারীও আমি নই। নিজের প্রয়োজনগুলো মেটানো, নিজের মান মর্যাদা রক্ষা করা, অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা অর্থ ছাড়া সম্ভব নয় একথা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করার আগ্রহ আমার কোনদিনই হয়নি। অর্থ সঞ্চয় করিনি বলে আমার অনুশোচনাও নেই।

আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নাস্তিকও আছেন। এই দুই ধরনের লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। আমার কতকগুলো নিজস্ব বিশ্বাস আছে, অন্য ব্যাপারের মত ধর্মবিশ্বাসেও। সে বিশ্বাসের পরিবর্তন আজো হয়নি। আমার এই বিশ্বাসের কাছ থেকেই এখন আমি সান্ত্বনা আর শান্তি পাই। যে তিনটি জিনিষ আমাকে আনন্দ দেয়, তাদের কথা আমি এখন বলব।

অনেক লোক তাদের মনের শান্তি হারিয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে, আসন্ন

বিপদ থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার কাছে কখনো সোজাসুজি এসেছে, কখনো বা চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে জানিয়েছে। তাদের যখন আমি সাহায্য করেছি তখন তাদের মুখে চোখে খুশীর যে ঝলক দেখেছি তা আমার মনকে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে।

আমার পছন্দ মত বই পড়ে বা গান শুনে আমি খুব আনন্দ পাই। খুব কম দিনই গেছে যখন এই আনন্দের রস আমি আস্বাদন করতে পারি নি। আমার পছন্দ মত লোকদের সঙ্গে খুশী মনে কথাবার্তা বলে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। আমরা হয়তো অনেক লোককে পছন্দ করি, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আমাদের জীবনের গভীরে ঘা দিতে পারে। এই রকম লোকদের সান্নিধ্যে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে আমার সারা মন আনন্দে ভরে যায়। ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব না করলে মানুষ জীবনে আনন্দ অনুভব করতে পারে না।

আমি এখন এই বইটির শেষ ধাপে এসেছি। আমার 83 বছর বয়স। যে কেউ আমাকে দীর্ঘায়ু বলবে। আজো যদি আমার পূর্ণ স্বাস্থ্য থাকে, জীবনের সুখ আস্বাদন করার আগ্রহ থাকে, নতুন কাজ করার উৎসাহ থাকে, তা'হলে তার জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। যত তিক্ত অভিজ্ঞতাই আমার হোক্ না কেন, জীবনের ওপর বিরক্তি বা মানুষের ওপর ঘৃণা করবার মনোভাব আমার মধ্যে জাগেনি। আমি এখনো এই পৃথিবীকে বন্ধুবান্ধবে ভরা একটি মনোরম স্থান বলেই ভাবি। তার সঙ্গে এই সব চিন্তাও আমার মনে জাগে—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব। জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে কত পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক কাঠামো বদলে গেছে, মানুষের মতামত বদলে গেছে, তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাও বদলে গেছে, তাদের প্রয়োজনগুলোও বদলে গেছে। আমি যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি, সে সব অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, আমার শরীরের অবস্থাও বদলে গেছে। এসব সত্ত্বেও আমি বেঁচে আছি।

এই আমি কে ? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। এ প্রশ্ন সেই প্রথম দিনের মতো আজো আমাকে বিচলিত করে। অস্তিমকালের পরিপূর্ণ শান্তি আমি এখন খুঁজছি। জীবনের অগাধ রহস্য ও তার জটিলতা আমাকে এখনো বিহ্বল করে তোলে। যা জানা সম্ভব নয়, তাকে জানতে চেষ্টা করার মূর্খতা আমাকে পেয়ে বসেছে। আকাশে তাকালে যতদূর দৃষ্টি যায়, অগণিত নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে। চোখের দৃষ্টির বাইরেও অসংখ্য অগণিত নক্ষত্র আছে। আমরা দেখতে পাই না বলে তাদের অস্তিত্ব নেই

এ কথা কি আমরা বলতে পারি? মহাসমুদ্রের মাঝে জাহাজ চালিয়ে যাওরা ক্যাপ্টেনের মত আমরাও এক একজন এই জীবনযাত্রার জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ক্যাপ্টেন জানে যে প্রস্তর খণ্ড, বালির বাঁধ প্রভৃতি সযত্নে পরিহার করে জাহাজ এগিয়ে না নিয়ে গেলে এদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজ বিপদের সম্মুখীন হবে। জীবনের যাত্রাপথে আমাদের অবস্থাও এই একই রকম। দূরদর্শিতার সঙ্গে ভালো মন্দের বিচার করে, প্রলোভনের ফাঁদে পা না দিয়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে আমরাও বিপদের সম্মুখীন হবো। অবশ্য এমন ভাবে সাবধান হ'য়েও আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। তাই সাবধান না হ'লে যে আমাদের অবস্থা কি হবে তা ভালো করেই বোঝা যায়।

আমি খুব ভোরে বসে এই লেখাটা লিখছি। এখনো আকাশে অনেক নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। একটা ঢেউ শেষ হয়ে যাবার পর আর একটা আসছে, এমনি ভাবে একটার পর একটা। কাক, মুরগী আর নানা রকম পাখী খুব আনন্দের সঙ্গে প্রভাতের আগমন ঘোষণা করছে। লোকেদের কথাবার্তা, রাস্তায় যানবাহন চলাচলের আওয়াজ আর একটা নতুন দিনের সূচনা করছে। এমনিভাবে দিনরাত, কর্ম ও সুপ্তি, উদয় আর অস্ত নিয়ে সময় এগিয়ে চলেছে। তেমনি ভাবে জীবনও। আমি কত দেখলাম, কত জানলাম, কত অভিজ্ঞতা আমার হলো একথা যখন ভাবি তখন আমি নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যাই। এত কিছুর পরও জীবন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এখনো শেষ হয়নি। এই কৌতূহল, এই ঔৎসুক্য আমায় কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ভবিষ্যতের জন্য কি অভিজ্ঞতা আমার কপালে লেখা আছে, আমি তা জানি না। তা যাই হোক না কেন—

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দ বং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥*

গীতার এই শ্লোকগুলি আমাকে যেন সর্ব অবস্থায় আলো দেখায়।

---

* ভয়হীনতা, হৃদয়নির্মলতা, সমদর্শননিষ্ঠা, দানশীলতা, আত্মসংযম, পরোপকার, বিজ্ঞান সম্পাদন-শীলতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা অর্জন করা ; অহিংসা, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ, শম, পরনিন্দা বিমুখতা ; দয়া, লোভহীনতা, সৌম্যতা, লজ্জাশীলতা, স্থৈর্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈয, শুচিতা, নিরুপদ্রবতা, নিরহঙ্কার—এসব যারা ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মায় তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়।